সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

জৈন-দর্শনে স্যাদ্‌বাদ

(২)

এক্ষণে এই সপ্তভঙ্গী নয় কিরূপ, তাহা আরও একটু বিশদভাবে বুঝিবার চেষ্টা করা যাউক। সপ্ত-ভঙ্গের প্রথম ভঙ্গটী এইরূপ,—"স্যাৎ কথঞ্চিৎ স্বদ্রব্য-ক্ষেত্র-কাল-ভাব-রূপেণ অস্ত্যেব সর্ব্বং কুম্ভাদি।" আমরা কেবলমাত্র "কুম্ভঃ অস্তি"—এইভাবে বাক্য প্রয়োগ করিতে পারি না। কারণ, তাহা হইলে 'কুম্ভঃ অস্তি'—এই বাক্যে যে অস্তিত্বের আভাস আছে, সে অস্তিত্বকে একান্তভাবে ধরিতে হয়, সুতরাং অস্তিত্ব শব্দের সর্ব্বাপেক্ষা ব্যাপক অর্থ গৃহীত হয় বলিয়া, 'অস্তি' এই শব্দের দ্বারা 'মৃত্তিকা অস্তি', 'বৃক্ষঃ অস্তি', 'বস্ত্রম্ অস্তি'—এইরূপ বাক্যও সত্য বলিয়া গৃহীত হওয়া উচিত হইয়া পড়ে। আরও এক কথা, উহা দ্বারা যে কোন উপাদানে প্রস্তুত কুম্ভ, যে কোন কালে, যে কোন দেশে বিদ্যমান কুম্ভ, এবং যে কোন রূপ বা বর্ণবিশিষ্ট কুম্ভের অস্তিত্বের কল্পনা সম্ভব হইয়া পড়ে।

কিন্তু বাস্তবিক-পক্ষে কুম্ভটী স্বীয় উপাদান-দ্রব্য মৃত্তিকা অবচ্ছেদে বিদ্যমান আছে, জল প্রভৃতি রূপে নহে, এইরূপে স্বীয় ক্ষেত্রে অর্থাৎ দেশ অবচ্ছেদে বিদ্যমান পরক্ষেত্রে নহে, কুম্ভটী পাটলিপুত্র নামক দেশবিশেষে আছে, কান্যকুব্জে নহে। এইরূপে স্বীয় কাল অপেক্ষায় বিদ্যমান, কিন্তু পরকীয় কাল অপেক্ষায় নহে, কুম্ভটী শীতকালে বিদ্যমান, কিন্তু বসন্তে নহে। এবং উহা রক্তবর্ণের, কিন্তু পীতবর্ণের নহে। কিন্তু যদি কেবলমাত্র ঐকান্তিক অস্তিত্বের কথা বলা হয়, তাহা হইলে এ সকল ব্যাবর্ত্তকের অভাবে বস্তুর প্রতিনিয়ত স্বার্থ-স্বরূপের (Identity) অভাব হইয়া পড়ে। তাহা হইলেই দেখা যাইতেছে, প্রথম প্রকার বচন-ভঙ্গের দ্বারা কুম্ভটী কোন বিশেষ দেশ, কাল, উপাদান এবং রূপের অপেক্ষায় অস্তিত্ববান্ এবং আমরা বলিয়া থাকি—'স্যাৎ কুম্ভঃ অস্তি', বা আরও সংক্ষেপে 'স্যাদস্তি'। আবার যেহেতু এই কুম্ভের অস্তিত্বের অঙ্গীকার কেবল অন্যান্য যাবতীয় বস্তু ও তাহাদের ধর্ম্মের নাস্তিত্বের (Non-being) অঙ্গীকারের উপর নির্ভর করিতেছে, সুতরাং কেবল 'স্যাদস্তি' ইহাই বলা চলে না, 'স্যান্নাস্তি', ইহাও বলিতে হয়। তবে এই 'স্যাদস্তি' ও 'স্যান্নাস্তি' এই দুয়ের মধ্যে জ্ঞাতা বা বক্তার উদ্দেশ্য অনুসারে প্রাধান্য দিতে হয়। কখন বা তিনি অস্তিত্বের দিক্‌টাই বলিতে চান, তখন ঐ দিক্‌টাই প্রাধান্য লাভ করে; আর নাস্তিত্বদিক্‌টা গৌণ বা অপ্রধান হইয়া থাকে। কিন্তু অস্তিত্বের সঙ্গে নাস্তিত্ব ওতপ্রোতভাবে সংশ্লিষ্ট; একটী অন্যটী

ব্যতিরেকে থাকে না।[১] অতএব সপ্তভঙ্গী-নয়ের প্রথমটী হইল, 'স্যাদস্তি'; দ্বিতীয়টী 'স্যান্নাস্তি'। প্রথমটী বিধি-কল্পনা-প্রসূত; দ্বিতীয়টী নিষেধ-কল্পনা-প্রসূত।

সপ্তভঙ্গী-নয়ের তৃতীয় ভঙ্গ অতি সুগম। কেবলমাত্র বিধি ও নিষেধের ক্রমিক কল্পনা হইতে উৎপন্ন[২]। উহা এই প্রকার 'স্যাদস্তি স্যান্নাস্তি চ'। চতুর্থ ভঙ্গটী এইরূপে উদ্ভূত হয়। অস্তিত্ব ও নাস্তিত্ব ধর্ম্ম যদি যুগপৎ প্রাধান্য-সহকারে একই বস্তুতে আরোপিত হয়, তাহা হইলে বস্তুর স্বরূপ অনির্ব্বাচ্য হইয়া উঠে। ইহারই নাম অবক্তব্য নয়। প্রথম তিনটী নয় হইতে ইহার পার্থক্য এই যে, প্রথম দুইটীতে একবার বিধির প্রাধান্য ও আর একবার নিষেধের প্রাধান্য। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, কোন বস্তুর অস্তিত্ব অঙ্গীকারের সঙ্গে সঙ্গেই তদিতর সমুদায় বস্তু এবং তদীয় অন্য যাবতীয় ধর্ম্মের নাস্তিত্বের অঙ্গীকার অনুস্যূত রহিয়াছে। তবে যখন আমরা কোন বস্তুতে অস্তিত্বের আরোপ করি, তখন উহাতে বিধির প্রাধান্য; আবার যখন নাস্তিত্বের আরোপ করি, তখন উহাতে নিষেধের প্রাধান্য। এই দুই স্থলেই বিধি ও নিষেধের প্রাধান্য ও অপ্রাধান্য অনুসারে বাক্য-বিন্যাস করা হইয়া থাকে মাত্র; ক্রম বা যৌগপদ্যের প্রসর নাই। কিন্তু তৃতীয় নয়ে বিধি-নিষেধ, উভয়েরই প্রধান্য থাকিলেও, ক্রমিক আরোপবশতঃ উহা চতুর্থ ভঙ্গ হইতে বিভিন্ন। চতুর্থ নয়ে বিধি এবং নিষেধ, উভয়ই প্রধান এবং উভয়ই সমকালে একই বস্তুতে আরোপিত হয়। একই কালে একই বস্তু 'অস্তি'ও বটে 'নাস্তি'ও বটে, সুতরাং মানব ধীর অগম্য এবং এজন্য অবক্তব্য, কিন্তু গত্যন্তর নাই। কারণ, বস্তুর স্বরূপই হইল—ঐরূপ বিরুদ্ধ ধর্ম্মকে আশ্রয় দেওয়া। মানব-চিন্তাশক্তি এইখানে স্বীয় অক্ষমতা স্বীকার করিতে বাধ্য।

উপরি-উক্ত ভঙ্গ চারিটী পরস্পর মিলিত করিলে আরও তিনটী ভঙ্গের সৃষ্টি হয়। সুতরাং পঞ্চম ভঙ্গটীর প্রকার হইবে এইরূপ—'স্যাদস্তি চ অবক্তব্যঞ্চ'! বস্তুর অস্তিত্ব আছে, আবার অবক্তব্যও বটে। ষষ্ঠ ভঙ্গটী হইবে,—'স্যান্নাস্তি অবক্তব্যঞ্চ'। অর্থাৎ বস্তুর অস্তিত্ব নাইও বটে, আবার অবক্তব্যও বটে। এবং সর্ব্বশেষে সপ্তম ভঙ্গে আমরা পাই,—'স্যাদস্তি চ স্যান্নাস্তি চ স্যাদবক্তব্যঞ্চ'। বস্তুর অস্তিত্ব আছে—নাইও বটে; আবার অবক্তব্যও বটে। উপরি-উক্ত সপ্ত প্রকার বচন-বিন্যাসের সমুদায়ের নাম সপ্তভঙ্গী নয়।

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে যে, বস্তুর ধর্ম্ম যখন অনন্ত, তখন বিধানপুরঃসর হউক বা নিষেধ-পুরঃসরই হউক, বচনভঙ্গও কেন অনন্ত হউক না, কেবল সপ্তপ্রকারই বা কেন হইবে? এ প্রশ্ন জৈনাচার্য্যগণ নিজেই উত্থাপিত করিয়া, নিজেই সমাধান করিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন,

---

১। "তস্মাদ্বস্তুনোঽস্তিত্বং নাস্তিত্বেনাবিনাভূতং নাস্তিত্বং চ তেন ইতি। বিবক্ষাবশাচ্চ অনয়োঃ প্রধানোপসর্জনভাবঃ।"

—স্যাদ্বাদমঞ্জরী, পৃঃ ১৭৮

"The affirmation of any assertion and the denial of its contradictory are logical equivalents, which it is allowable and indispensable to make use of as mutually convertible"—Mill's *Examination of Hamilton's Philosophy*—pp. 471—472.

২। ক্রমতো বিধিনিষেধকল্পনয়া তৃতীয়ঃ।

যে, বস্তুর ধর্ম্ম অনন্ত, ইহা সত্য। কিন্তু যে কোন এক ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া বিধি-নিষেধপূর্ব্বক বচনবিন্যাস করিতে গেলে দেখা যাইবে যে, ঐরূপ সপ্তপ্রকার বচন-ভঙ্গেরই সম্ভাবনা; কারণ, উক্ত অবলম্বিত বস্তু-ধর্ম্ম-বিষয়ক জিজ্ঞাসার প্রবৃত্তি সপ্ত প্রকারের অধিক হইবার উপায় নাই। উহা সপ্তপ্রকারেই নিয়ন্ত্রিত। তাঁহারা বলেন যে, যেমন অস্তিত্ব এবং নাস্তিত্বের সাহায্যে সপ্তধা বচন-বিন্যাস সম্ভব দেখান গেল, ঐরূপ সামান্য ও বিশেষ, নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব প্রভৃতির সাহায্যেও সপ্তপ্রকারই বচন নির্দ্দেশ হইবে। যথা স্যাৎ সামান্যং, স্যাদ্বিশেষঃ, স্যাদুভয়ং, স্যাদবক্তব্যং, স্যাৎ সামান্যাবক্তব্যং, স্যাদ্বিশেষাবক্তব্যং, স্যাৎ সামান্যবিশেষাবক্তব্যম্। এস্থলেও বিধি নিষেধের প্রয়োগ অব্যাহত আছে। 'বস্তু স্যাৎ সামান্যং'—এই বাক্যে সামান্যের বিধান করা হইতেছে এবং স্যাদ্বিশেষঃ—এই বাক্যেও নিষেধ নিহিত আছে। কারণ, বিশেষ ব্যাবৃত্তিপরায়ণ, এবং ব্যাবৃত্তি অর্থে পার্থক্য বা পৃথক্‌করণ বুঝায়। যখন কোন বস্তু অন্য বস্তু হইতে ব্যাবৃত্ত, একথা বলা হয়, তখন আমরা বুঝি যে, প্রথম বস্তুটী দ্বিতীয় বস্তুটীর সহিত সমান নহে। সুতরাং বিশেষেও নিষেধ অন্তর্নিহিত রহিয়াছে। এইরূপে নিত্যত্বানিত্যত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মসম্বন্ধেও বিধি-নিষেধ-সহকারে সপ্তভঙ্গের উদ্ভব হইয়া থাকে। সুতরাং আমরা দেখিলাম যে, জৈনাচার্য্যগণের মতে বস্তুর ধর্ম্ম অনন্ত হইলেও, বচনভঙ্গ সপ্তধা নিয়মিত। সাতের বেশী হয় না। কিন্তু সাতের কমে নামিতে পারা যায় কিনা, সে কথা জৈনাচার্য্যগণ উত্থাপন করিবার আবশ্যকতা মনে করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। সে কথা আমরা পরে আলোচনা করিব। যাহা হউক, জৈনগণ বিবেচনা করেন যে, এই সপ্তপ্রকার বচনভঙ্গই বস্তু-সম্বন্ধে খাটে। কেন না, ইহাদের যে কোন একটী বচনভঙ্গ মাত্র পাক্ষিক, অথবা আপেক্ষিক সত্যের প্রকাশক, সুতরাং উহা প্রমাণ বলিয়া গৃহীত হয় না। তাঁহারা বিবেচনা করেন যে, ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য, বেদান্ত, মীমাংসা ও বৌদ্ধ আচার্য্যগণ প্রত্যেকেই এইরূপ এক একটী নয়ের আশ্রয় গ্রহণ করতঃ মাত্র খণ্ডসত্যে উপনীত হইয়াছেন। বস্তুস্বরূপ-পরিচায়ক অখণ্ড সত্যের সন্ধান করিয়া উঠিতে পারেন নাই। সেই কারণ ঐরূপ পাক্ষিক বা খণ্ডসত্যের পরিচায়ক বচন-বিন্যাসের তাঁহারা নাম দিয়াছেন "বিকলাদেশ", "নয় সপ্তভঙ্গী" অথবা নয়াভাস্। পক্ষান্তরে সমুদিত ভঙ্গসপ্তক বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ-প্রকাশে সমর্থ, সুতরাং অখণ্ড সত্যের পরিচায়ক। এজন্য উহার নাম "সকলাদেশ" অথবা "প্রমাণ-সপ্তভঙ্গী"[১]।

উপরে স্যাদ্‌বাদের এক প্রকার পরিচয় দেওয়া গেল। এক্ষণে আমরা উহা হইতে স্যাদ্‌বাদ-সম্বন্ধে কয়েকটী তথ্য সংগ্রহ করিতে পারি। সে কয়েকটী তথ্য এই,—প্রথমতঃ যদি প্রতীতিলব্ধ জ্ঞানে অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ না থাকে, তবে বাস্তবিক বস্তু অনন্ত এবং পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম্মের আধার। এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। দ্বিতীয়তঃ সত্তা (বিধি), অসত্তা (নিষেধ) এবং অবক্তব্য অথবা অনির্ব্বাচ্য এই কোটিত্রয়ে বস্তু-সম্বন্ধে সর্ব্বপ্রকার বাক্য-বিন্যাসই

১। বিকলাদেশস্বভাবা হি নয়সপ্তভঙ্গী বস্ত্বংশমাত্রপ্ররূপকত্বাৎ।

সকলাদেশস্বভাবা হি প্রমাণসপ্তভঙ্গী যথাবৎ বস্তুপ্ররূপকত্বাৎ।"

—প্রমেয়কমলমার্ত্তণ্ড, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ,—পৃ ২০৬ খ।

(judgment) সীমাবদ্ধ। তৃতীয়তঃ কোন এক প্রকার বাক্য-বিন্যাসই একান্ত সত্য হয় না, আপেক্ষিক সত্যের সূচনা করে মাত্র। তাহা হইলে স্যাদ্‌বাদে বাহ্যবস্তুর স্বরূপ হইতেছে এইরূপ। বস্তুর জ্ঞাতৃনিরপেক্ষ স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে (Realism), কিন্তু বস্তু-সম্বন্ধে সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানই বস্তুর এক একটা দিক্ (aspects) অথবা এক এক রকম ধর্ম্মের বা বিকাশের (manifestations) গ্রহণ করিতে সমর্থ, সুতরাং পাক্ষিক সত্যের আভাস দেয় মাত্র, এবং এই অফুরন্ত বিকাশের পশ্চাতে যে স্বরূপ-শক্তি আছে, তাহার অস্তিত্ব উক্ত অনন্ত বিকাশের নিদান-স্বরূপ অবশ্য স্বীকার্য্য। তবে কি ইহা Herbert Spencerএর Transfigured Realismএর সহিত সমপর্য্যায়-ভুক্ত। একটু চিন্তা করিলে দেখা যায় যে, Spencerএর চিন্তাপ্রণালী ও স্যাদ্‌বাদ ঠিক একই নহে। স্পেন্সরের মতেও বস্তুজগৎ জ্ঞান-জগৎ হইতে স্বতন্ত্র এবং আমাদের জ্ঞান কেবল উহার ভিন্ন ভিন্ন বিকাশেই সীমাবদ্ধ, সুতরাং উহা আপেক্ষিক সত্য প্রদান করে বটে। কিন্তু ঐ সকল ভিন্ন ভিন্ন বিকাশের অন্তর্নিহিত যে শক্তি আছে, তাহা এক ও অনন্ত (Absolute and Infinite) —যাহার বলে আপেক্ষিক (relative) সত্যগুলির উদ্ভব বা অস্তিত্ব সম্ভাবিত হয়। পক্ষান্তরে স্যাদ্‌বাদে বস্তুর বহুত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। সুতরাং স্যাদ্‌বাদ ও স্পেন্সরের Transfigured Realism উভয়ই বস্তুতন্ত্রবাদী হইলেও স্পেন্সর একত্বের পক্ষপাতী (Monistic), পক্ষান্তরে স্যাদ্‌বাদ বহুত্বের পক্ষপাতী (Pluralistic Realism). এতদ্ভিন্ন স্পেন্সর আমাদের জ্ঞেয় জগতের (world of experience) ভিত্তিস্বরূপ যে এক স্বরূপশক্তির (Power) স্বীকার করিয়াছেন, তাহা কিন্তু তাঁহার মতে অজ্ঞেয় (unknown and unknowable); পক্ষান্তরে স্যাদ্‌বাদে বস্তুস্বরূপ-সম্বন্ধে জ্ঞান অস্বীকৃত হয় নাই।

আর এক কথা, স্যাদ্‌বাদে আমরা পাইলাম যে, সকল প্রকার জ্ঞানই আপেক্ষিক (relative truths). কিন্তু এই আপেক্ষিক ভাবটাই আবার নিজেই আপেক্ষিক। কোন প্রকার জ্ঞান আপেক্ষিক সত্য বলিলে ইহাই বুঝায় যে, উহার আপেক্ষিকতা অন্য কোন জ্ঞানের উপর নির্ভর করে বা উহাকে অপেক্ষা করে। সুতরাং এই প্রকার চিন্তাপ্রণালীর বশবর্ত্তী হইয়া আমরা অবশেষে এক অনপেক্ষ অখণ্ড সত্যের কল্পনা করিতে বাধ্য হই, যাহাতে এই অসংখ্য আপেক্ষিক সত্যের সমাধান হয়[১]। কিন্তু জৈনগণ তাঁহাদের অনেকান্তবাদ বা স্যাদ্‌বাদে এরূপ অবশ্য-উত্থাপনীয় অনপেক্ষ বা একান্ত সত্যের (Absolute truth) স্বরূপ-নির্ণায়ক কোন প্রশ্ন স্পষ্টভাবে উত্থাপিত করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। তাঁহারা কেবল এইটুকু মাত্র আভাস দিয়াছেন যে, সপ্তভঙ্গী নয়ের সমুদিত প্রয়োগেই প্রামাণ্য; আর তদ্ভিন্ন যাবতীয় বাক্য-বিন্যাস প্রমাণাভাস—অর্থাৎ পাক্ষিক সত্য। অবশ্য জৈনগণ এক প্রকার জ্ঞানের উল্লেখ করিয়াছেন। তাহা তাঁহাদের '**কেবল জ্ঞান**'। এই জ্ঞানে সাধারণের অধিকার নাই। যাঁহার সমস্ত কর্ম্মের মল ধৌত হইয়া গিয়াছে—এক কথায় যিনি 'জিন' হইয়াছেন, তাঁহারই এই **বিশুদ্ধ জ্ঞান** (Pure Intelligence) যাহা আত্মার

১। Cf. Bradley's "Coherence view of Truth". "But though transcending these modes of experience, it includes them all fully".—*Essays on Truth and Reality*, pp. 343-44.

স্বাভাবিক সম্পত্তি, ফিরিয়া আসিয়াছে। এই 'কেবল জ্ঞান' বা বিশুদ্ধ জ্ঞানের স্বভাব এই যে, ইহার নিকটে দেশ বা কালকৃত ব্যবধান দূর হইয়া গিয়া বস্তুর স্বরূপজ্ঞান উদ্ভাসিত হয় ও একান্ত এবং অখণ্ড সত্য স্বয়ং প্রকাশ লাভ করে। (Intellectual Intuition ইহা অনেকটা Schelling এর মত) কিন্তু এই 'কেবল জ্ঞান' এক মুখ্যজ্ঞান ধরিয়া লইয়া বস্তুস্বরূপ-নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইলে, জৈনগণের অনেকান্ত-বাদরূপ সিদ্ধান্তের হানি হয়।

এক্ষণে আমরা দেখিতে চেষ্টা করিব, (১) জৈনদিগের চিন্তাধারার সহিত ভারতীয় অন্যান্য দর্শনের কিরূপ সম্বন্ধ; (২) সত্তা, অসত্তা এবং অবক্তব্য বা অনির্ব্বাচ্য, এই কোটিত্রয় অবলম্বনে সপ্ত প্রকার বচনভঙ্গের বাস্তবিক অবকাশ আছে কিনা; এবং (৩) সর্ব্বশেষে স্যাদ্‌বাদের সহিত আধুনিক পাশ্চাত্য তর্ক-শাস্ত্রের কোন সাদৃশ্য আছে কিনা।

আমরা ইতিপূর্ব্বেই বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছি যে, দর্শনশাস্ত্রের মতবাদগুলি প্রায়শঃ পূর্ব্ববর্ত্তী এবং সমকালীন অন্যান্য মতবাদের সংঘর্ষেই সমুৎপন্ন হয়। এক্ষণে দেখিতে চেষ্টা করা যাউক যে, জৈনদিগের স্যাদ্‌বাদ যখন প্রথমে জগতে ঘোষিত হয়, তখন ঐ প্রকার চিন্তার ধারা ভারতীয় অন্যান্য দর্শনে স্থান পাইয়াছিল কিনা। যে সময় ভারতে স্যাদ্‌বাদের ঘোষণা আরম্ভ হয়, সেই সময়ে ভারতে আরও দুইটী প্রধান চিন্তার ধারা প্রবাহিত ছিল। একটী বৌদ্ধ ও অপরটী ঔপনিষদিক জৈনদিগের ধর্ম্ম ও দার্শনিক গ্রন্থ আলোচনায় দেখা যায়, ভদ্রবাহু-রচিত "সূত্রকৃতাঙ্গ-নির্য্যুক্তি" নামক গ্রন্থে স্যাদ্‌বাদের সর্ব্বপ্রথম উল্লেখ আছে। এই ভদ্রবাহুর জীবনকাল-সম্বন্ধে যে মতভেদ আছে, তাহার আলোচনায় আমাদের কোন প্রয়োজন নাই[১]। তবে মোটামুটি এই পর্য্যন্ত বলিতে পারা যায়, তিনি যে সময়ে তাঁহার মতবাদ প্রচার করেন, সে সময় বৌদ্ধগণের ধর্ম্ম ও দার্শনিক মত অনেক-পরিমাণে সংগঠিত হইয়াছিল[২], এবং বৃহদারণ্যক ও ছান্দোগ্য প্রভৃতি প্রাচীনতম উপনিষদ্‌গুলি রচিত হইয়াছিল[৩] এবং উহাদের চিন্তার ধারা এবং মতবাদগুলি সমসাময়িক দার্শনিক-জগতের উপর কতক-পরিমাণে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। আমাদের ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ভদ্রবাহু সর্ব্বপ্রথম স্যাদ্‌বাদের প্রচার করিলেও পরবর্ত্তী জৈনাচার্য্যগণ উহার পরিপুষ্টি সাধন করিয়া গিয়াছেন। জৈনাচার্য্য উমাস্বাতি বাচকমুখ্য "তত্ত্বার্থাধিগমসূত্র" নামক জৈন-দর্শনের একখানি অমূল্য গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁহার প্রায় পাঁচশত বর্ষ পরে সমন্তভদ্র ঐ গ্রন্থের যে টীকা প্রণয়ন করেন, তাহার মুখবন্ধের নাম "আপ্ত-মীমাংসা"। এই আপ্ত-মীমাংসায় স্যাদ্‌বাদের পূর্ণ বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে, এবং সমন্তভদ্রের জীবনকাল আনুমানিক খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভ।

১। পরলোকগত মহাত্মা মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত ৺সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণের মতে ভদ্রবাহুর কাল খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দী। শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকরের মতে খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দী।

২। প্রায় সমুদায় ত্রিপিটক বৌদ্ধ-গ্রন্থ খৃষ্টপূর্ব্ব ২৪১ বৎসরের পূর্ব্বেই সঙ্কলিত হইয়া গিয়াছিল।—দাশগুপ্তের ভারতীয় দর্শনের ইতিহাস দ্রষ্টব্য।

৩। প্রাচীন উপনিষদ্‌গুলির সময় ৭০০—৬০০ খৃঃ পূঃ (ঐ)।

অতএব পরবর্ত্তী কালে মাণিক্য নন্দী-রচিত "পরীক্ষামুখসূত্র" (আনুমানিক ৮০০ খৃষ্টাব্দ), প্রভাচন্দ্র কবি-রচিত পরীক্ষামুখসূত্রের টীকা "প্রমেয়কমল-মার্ত্তণ্ড" নামক গ্রন্থ (আনুমানিক ৮২৫ খৃষ্টাব্দ) হরিভদ্র-রচিত "ষড়্‌দর্শনসমুচ্চয়" (১১৬৮ খৃষ্টাব্দ), মল্লিষেণ কৃত "স্যাদ্‌বাদমঞ্জরী" (১২১৪ শকাব্দ ১২৯২ খৃষ্টাব্দ[1]) প্রভৃতি গ্রন্থে স্যাদ্‌বাদের পরিপোষণের কথা ছাড়িয়া দিলেও, খৃষ্টীয় প্রথম হইতে ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যে স্যাদ্‌বাদের চিন্তা-প্রণালীর উপর বৌদ্ধ ও ঔপনিষদিক প্রভাব স্পষ্ট পরিলক্ষিত হয়।

এক্ষণে দেখা যাউক, স্যাদ্‌বাদের উপর বৌদ্ধ অনির্ব্বাচ্যবাদের প্রভাব কিরূপে সম্ভাবিত হইয়াছিল। আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি, স্যাদ্‌বাদের হস্তে ক্রীড়নক হইল তিনটী,—সত্তা, অসত্তা ও অবক্তব্য, অথবা সামান্য, বিশেষ ও অবক্তব্য; অথবা নিত্য, অনিত্য ও অবক্তব্য, অর্থাৎ দুইটী পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম্মের ক্রমিক উল্লেখ ও তাহাদের যুগপৎ প্রাধান্যবশতঃ বস্তুর অনির্ব্বাচ্যতা। বৌদ্ধ ত্রিপিটকের মধ্যে অভিধম্ম-পিটকের সুত্ত ও বিনয়-পিটকের সহিত প্রতিপাদ্য-বিষয়ে সাম্য থাকিলেও উহাদের অপেক্ষায় অভিধম্ম-পিটক অধিক-পরিমাণে যুক্তি-তর্কের সাহায্য গ্রহণ করে। আবার সেই অভিধম্ম-পিটকের মধ্যে "কথাবত্থু" নামক গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তথায় বিরুদ্ধ-মতাবাদিগণের[2] খণ্ডনপ্রসঙ্গে দ্বিকোটিক তর্কের উত্থাপন করিয়া দেখান হইয়াছে যে, তাঁহাদের মতবাদগুলি পরস্পর বিরুদ্ধ ভাবের আধার, সুতরাং অশ্রদ্ধেয়। ইহার কিছু পরে বৌদ্ধাচার্য্য নাগার্জ্জুনই (৪০১ খৃষ্টাব্দ) প্রকৃত-প্রস্তাবে তাঁহার শূন্যবাদ স্থাপন প্রসঙ্গে অস্তি, নাস্তি এবং অবক্তব্যরূপ ত্রিকোটিক যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন। তিনি প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, কোন বস্তুরই কোন নিজস্ব 'স্বভাব' বা সত্তা নাই। তাপকে অগ্নির স্বভাব বলা যায় না। কারণ, তাপ এবং অগ্নি উভয়েই অন্য অনেক কারণের উপর নির্ভর করে। যাহা অন্যের উপর নির্ভর করে না, কেবল তাহাই কোন বস্তুর স্বভাব হইবার যোগ্য। তাপ অন্যের উপর নির্ভর করে, সুতরাং তাপ অগ্নির স্বভাব হইতে পারে না; এবং জগতে এমন কোন বস্তু নাই, যাহা অন্যের উপর নির্ভর করে না, সুতরাং সর্ব্ববস্তুই নিঃস্বভাব। ইহাই প্রতীত্য-সমুৎপাদ বা শূন্যবাদের নিগূঢ় অর্থ। ফলতঃ যেমন আমরা কোন বস্তু-সম্বন্ধে "ইহার স্বভাব এই"—এরূপ বিধিপূর্ব্বক বাক্য প্রয়োগ করিতে পারি না, সেইরূপ "ইহার স্বভাব এরূপ নহে"—এরূপ নিষেধ-বাক্যও প্রয়োগ করিতে পারি না। সুতরাং বস্তু-স্বরূপ অনির্ব্বাচ্য হইয়া দাঁড়াইতেছে।

১। মল্লিষেণ তাঁহার পুস্তকের রচনা-কাল পুস্তকের শেষে স্বয়ং দিয়া গিয়াছেন,—

"শ্রীমল্লিষেণসূরিভিরকারি তৎপদগগনদিনমণিভিঃ।
বৃত্তিরিয়ং মনুরবিমিতশকাব্দে দীপমহসি শনৌ।" (মনুরবি—১২১৪)

২। কথাবত্থুর টীকাকার এই কয়েকটী বিরুদ্ধমতবাদীর উল্লেখ করেন যথা,—মহাসঙ্ঘিকাঃ, লোকোত্তরবাদিনঃ, কক্কুলিকাঃ, প্রজ্ঞপ্তিবাদিনঃ, একব্যবহারিকাঃ এবং সর্ব্বাস্তিবাদিনঃ। ইহাদের মধ্যে মহাসঙ্ঘিকবাদে জৈন-সম্মত আত্মার কৃৎস্ন-শরীর-ব্যাপিত্বের ন্যায় চিত্তের সর্ব্বশরীর ব্যাপিত্বের উল্লেখ আছে। শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের "বৌদ্ধধর্ম্ম"-শীর্ষক প্রবন্ধাবলী দ্রষ্টব্য।—(নারায়ণ, ১৩২২, শ্রাবণ)।

দৃশ্যমান জগতে বস্তুনিচয় এক ক্ষণে উৎপন্ন হইতেছে, আবার পরক্ষণেই ধ্বংসলাভ করিতেছে। এইরূপ উৎপাদ ও ধ্বংস ব্যতিরেকে তাহাদের কোন নিজস্ব স্বভাব নাই। এ জগৎটাই এরূপ নিঃস্বভাব, উৎপাদ ও বিনাশের প্রবাহ মাত্র। ইহারই অপর নাম 'প্রপঞ্চ-প্রবৃত্তি"। এই প্রপঞ্চ প্রবৃত্তির নাশেই নির্ব্বাণ; এবং নির্ব্বাণ ও শূন্য একই। নির্ব্বাণের স্বরূপ হইতেছে এই যে, উহা ভাবরূপও নহে, আবার অভাবরূপও নহে। নির্ব্বাণ ভাবরূপ হইলে, উহা কতকগুলি কারণ-সামগ্রী হইতে "সংস্কৃত" বা উৎপন্ন এবং যাহা উৎপন্ন, তাহা ধ্বংসশীল। আবার উহা অভাবস্বরূপও হইতে পারে না। কারণ, যখন শূন্যবাদে কোনরূপ ভাবপদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করা চলে না, তখন অভাব-পদার্থের অস্তিত্ব স্বতঃই নিরাকৃত হয়। সুতরাং দেখা গেল, নির্ব্বাণ ভাবস্বরূপও নহে; অভাব-স্বরূপও নহে। পরিশেষে মাধ্যমিকেরা নির্ব্বাণ বা শূন্যকে "চতুষ্কোটি বিনির্ম্মুক্ত" বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। অর্থাৎ উহা 'অস্তি'ও নহে, 'নাস্তি'ও নহে, তদুভয়ও নহে, অনুভয়ও নহে। উহা অনির্ব্বাচ্য বা জৈনের ভাষায় বলিতে গেলে, উহা অবক্তব্য। এইরূপে অস্তি, নাস্তি ও অবক্তব্য লইয়া বৌদ্ধ বিচারপ্রণালী জৈনের স্যাদ্‌বাদকে অনুপ্রাণিত করে নাই, এ কথা সাহস করিয়া বলা চলে না।

স্যাদ্‌বাদ ও বেদান্তের অনির্ব্বাচ্যবাদ। অদ্বৈতবাদে মায়া ও মায়াপ্রসূত এই জগৎ-প্রপঞ্চের স্বরূপ-নির্ণয়প্রসঙ্গেও ঠিক এই সত্তা, অসত্তা ও অবক্তব্যরূপ ত্রিকোটিক চিন্তা-প্রণালীর প্রয়োগ করা হইয়াছে। মায়া বা অবিদ্যার স্বরূপ কি না—উহা সৎ। কারণ, যাবৎ ব্রহ্মজ্ঞানের উৎপত্তি না হয়, তাবৎ উহার অস্তিত্ব আছেই ত এবং উহা জগৎ-প্রপঞ্চের প্রসবিত্রী বটেই ত। আবার ব্রহ্মজ্ঞান সমুৎপন্ন হইলেই উহার তিরোভাব, সঙ্গে সঙ্গে জগৎ-সংসারেরও তিরোভাব হয়, সুতরাং মায়া সৎও বটে, অসৎও বটে। পরন্তু উহা 'সদসত্ত্বামনির্ব্বাচ্যা'। এইরূপে এই অনির্ব্বচনীয়া মায়া হইতে প্রসূত বলিয়া জগৎ-সংসারের যাবতীয় বস্তুই বিরুদ্ধ ধর্ম্মের আধার এবং অনির্ব্বাচ্য।

এই মায়ার স্বরূপ এবং অনির্ব্বাচ্যবাদ বৃহদারণ্যক, ছান্দোগ্য প্রভৃতি অতি প্রাচীন উপনিষদে ঠিক এইরূপে প্রচারিত নাই সত্য এবং এমন কি, মায়া শব্দটী শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের পূর্ব্বে আর কোন উপনিষদে উক্ত অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই, ইহাও সত্য, তথাপি বৃহদারণ্যকের মৈত্রেয়ী-যাজ্ঞবল্ক্য-সংবাদ ও ছান্দোগ্যের ষষ্ঠ অধ্যায়ে মায়াবাদের এবং সঙ্গে সঙ্গে জগন্মিথ্যাত্বের প্রতিষ্ঠাকল্পে যে চিন্তাপ্রণালী আরব্ধ হইয়া, পরে ভগবান্ বাদরায়ণ ও শঙ্করাচার্য্য কর্ত্তৃক অনুসৃত হইয়াছিল, তাহা নিশ্চয়ই অন্ততঃ পরোক্ষভাবে জৈনাচার্য্যগণের চিন্তার ধারার উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, এ কথা বলা বোধ হয় অসঙ্গত হয় না।

পক্ষান্তরে ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য ব্রহ্মসূত্রের তর্কপাদে "নৈকস্মিন্নসম্ভবাৎ" এই সূত্রের ভাষ্যে স্যাদ্‌বাদানুসারে একই বস্তুতে যুগপৎ সত্তা ও অসত্তাদিরূপ বিরুদ্ধ ধর্ম্মের সমাবেশ অসম্ভব বলিয়া স্যাদ্‌বাদের খণ্ডনের চেষ্টা করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহার নিজের স্বীকৃত অদ্বৈতবাদ যদি বজায় রাখিতে হয়, তাহা হইলে অনির্ব্বাচ্যা মায়ার

সাহায্যে জগৎ-প্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব সপ্রমাণ করিতে হয়। জগতের বস্তুজাত মায়াপ্রসূত বলিয়া তাহারাও সৎও বটে, অসৎও বটে, এজন্য অনির্ব্বাচ্য। সুতরাং বাস্তবিকপক্ষে তিনিও ত বস্তুতে সদসত্ত্বাদিরূপ বিরুদ্ধ ধর্ম্মের অধ্যাস করিয়াছেন। শুধু ইহাই নহে, ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য সমগ্র তর্কপাদে ন্যায়, বৈশেষিক, বৌদ্ধ প্রভৃতি মতবাদ খণ্ডন-প্রসঙ্গে যে যুক্তিপ্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন, তাহাও জৈনচার্য্যগণের চিন্তার ধারার অনেকটা অনুরূপ। তাঁহার পরে শ্রীহর্ষ তাঁহার "খণ্ডনখণ্ডখাদ্যে" অনির্ব্বাচ্যবাদ-সাহায্যে প্রদর্শন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, এ জগতে কোন বস্তুই অস্তি বা নাস্তি—এইরূপ লক্ষণে লক্ষিত করা যায় না। উহা সৎও নহে, অসৎও নহে, আবার উহা সৎও বটে, অসৎও বটে ; উহা সদসত্ত্বারূপ বিরুদ্ধ ধর্ম্মের আশ্রয় ; উহা অনির্ব্বাচ্য বা অবক্তব্য। এজন্য শ্রীহর্ষের খণ্ডনের অপর নাম "অনির্ব্বচনীয়তাসর্ব্বস্ব"। নৈয়ায়িকই শ্রীহর্ষের শরব্য। কারণ, নৈয়ায়িকই লক্ষণ-সাহায্যে বস্তুর অস্তিত্ব সিদ্ধি করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। শ্রীহর্ষও নৈয়ায়িকের যত লক্ষণ উক্ত প্রকার ত্রিকোটিক যুক্তি-সাহায্যে একে একে তাহার সমস্ত খণ্ডন করিয়া দেখাইয়াছেন যে, যখন লক্ষণ টিকিল না, তখন জগৎ-প্রপঞ্চের অস্তিত্ব বা নাস্তিত্ব নির্ব্বচন করা যায় না। এক কথায় উহা অনির্ব্বাচ্য।

পূর্ব্বোক্ত আলোচনা হইতে আমরা ইহা সংগ্রহ করিতে পারি যে, খুব সম্ভব প্রাচীন বৌদ্ধ ও ঔপনিষদিক ত্রিকোটিক বিচারপদ্ধতি দ্বারা পরোক্ষভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া জৈনগণ স্যাদ্বাদের অবতারণা করিয়াছিলেন। বৌদ্ধ অনির্ব্বাচ্য বা শূন্যবাদ ও বৈদান্তিক অনির্ব্বাচ্যবাদের সহিত স্যাদ্বাদের প্রভেদ এই যে, বৌদ্ধ ও বৈদান্তিক—উভয়েই বস্তুকে এক হিসাবে বাধিত করিয়াছেন, স্যাদ্বাদ বস্তুস্বরূপ সাধিত করিয়াছে। বৌদ্ধমতে বাহ্য জগৎ শূন্য, বেদান্তমতে ব্রহ্মের পারমার্থিক সত্তার অপেক্ষায় ব্যাবহারিক জগৎ বাধিত এবং ব্যাবহারিক বাহ্যজগতের মধ্যেও এক উচ্চস্তরের সত্যের অপেক্ষায় নিম্নস্তরের সত্য বাধিত। স্যাদ্বাদ দেখাইয়াছে যে, বস্তু সত্তা ও অসত্তা, নিত্যতা ও অনিত্যতা, প্রভৃতি বিরুদ্ধ ধর্ম্মের আধার হইতে পারে। ঐরূপ বিরুদ্ধ ধর্ম্মের সমাবেশেই বস্তুর বস্তুত্ব সিদ্ধি। বিরোধি-ধর্ম্মাধ্যাস বস্তুর বাধিতত্ব বা শূন্যতা আপাদন করা দূরে থাকুক, বস্তুর বাস্তবতাই সম্পাদন করে। কারণ, প্রতীতি ও তদুপরি প্রতিষ্ঠিত অনুমান আমাদিগকে জ্ঞাপন করে যে, কেবল নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব, সামান্য ও বিশেষ, দ্রব্য ও পর্য্যায়—এই উভয়াত্মক বস্তুই আমাদের প্রয়োজন-সিদ্ধির সহায়। ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এ সমুদায় বিষয় পূর্ব্বেই আলোচিত হইয়াছে। সুতরাং বৈদান্তিক অনির্ব্বাচ্যবাদে জগৎ-প্রপঞ্চের বাধ ও বৌদ্ধ অনির্ব্বাচ্য বা শূন্যবাদে জগৎ-প্রপঞ্চের নাশ, পরন্তু জৈনের স্যাদ্বাদে জগতের প্রতিষ্ঠা।

আর এক কথা। আমরা পূর্ব্বে স্যাদ্বাদের সপ্ত প্রকার বচন-ভঙ্গের আলোচনা-কালে দেখিয়াছিলাম যে, জৈনাচার্য্যগণের মতে বস্তুর ধর্ম্ম অনন্ত হইলেও, বচনবিন্যাস সপ্ত প্রকার মাত্রই হইবে ; কারণ, তাঁহারা বলেন যে, বচনভঙ্গ জিজ্ঞাসার প্রবৃত্তির উপর নির্ভর করে এবং তাঁহাদের প্রদর্শিত সপ্ত প্রকার জিজ্ঞাসার পর আর সন্দেহের বা জিজ্ঞাসার অবসর থাকে না। সেইখানেই বচনের বিশ্রান্তি হয়। সুতরাং স্যাদস্তি, স্যান্নাস্তি, স্যাদস্তি চ স্যান্নাস্তি চ, স্যাদবক্তব্যঞ্চ, স্যাদস্তি চ

স্যাদবক্তব্যঞ্চ, স্যান্নাস্তি চ স্যাদবক্তব্যঞ্চ, স্যাদস্তি চ স্যান্নাস্তি চ, স্যাদবক্তব্যঞ্চ, এই **সপ্ত-প্রকারই** তাঁহাদের মতে আবশ্যকীয় বচনভঙ্গ। উহার কমও নহে, বেশী নহে। কিন্তু আমার মনে হয় যে, বস্তুস্বরূপ-সম্বন্ধে জৈনগণের মতবাদ সত্যের অদূরবর্ত্তী হইলেও, তাঁহাদিগের অঙ্গীকৃত বচনভঙ্গের **সপ্তপ্রকার** সম্বন্ধে সন্দেহ উত্থিত হইবার যথেষ্ট কারণ আছে। বস্তু অনন্ত ধর্ম্মের আধার, সুতরাং এক ধর্ম্ম অপেক্ষায় ইহার অস্তিত্ব স্বীকৃত হইলে, সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মান্তরের অপেক্ষায় ইহাতে নাস্তিত্ব আরোপ করিতে হয়। পরে ঐ অস্তিত্ব এবং নাস্তিত্বের ক্রমিক আরোপ করিলে 'স্যাদস্তি চ স্যান্নাস্তি চ' এইরূপ বিধি-নিষেধাত্মক বাক্যের প্রয়োগ বেশ বুঝা যায়। এবং অবশেষে সেই একই বস্তুতে যুগপৎ অস্তিত্ব এবং নাস্তিত্ব কল্পিত হইলে, বাস্তবিকই বস্তুস্বরূপ অবক্তব্য হয়, এপর্য্যন্তও বেশ বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু ইহার পর পঞ্চম হইতে সপ্তম পর্য্যন্ত অবশিষ্ট তিনটির ভঙ্গের প্রয়োগের অবকাশ আছে বলিয়া অন্ততঃ আমার মনে হয় না। কারণ, চতুর্থ ভঙ্গে যাহাকে অবক্তব্য বলিয়া আপন ধীশক্তির অক্ষমতা মানিয়া লইলাম, আবার তাহার সম্বন্ধে বচনবিন্যাস কিরূপে সম্ভব হইতে পারে, তাহা বুঝা যায় না। সুতরাং আমার এরূপ ধারণা যে, চতুর্থ ভঙ্গেই বস্তুসম্বন্ধীয় চিন্তার ও বাক্যের বিশ্রান্তি হওয়া উচিত। অথচ উহাতে জৈনগণের প্রতিষ্ঠিত বস্তুস্বরূপ-সম্বন্ধে সিদ্ধান্তের হানিও হয় না। অবশ্য ইহাই আমার ব্যক্তিগত ধারণা।

ইহার পর আরও একটী বিষয়ের আলোচনা করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিতে ইচ্ছা করি। তাহা স্যাদ্‌বাদ ও আধুনিক পাশ্চাত্য তর্কশাস্ত্রের শাসনের সম্বন্ধে। স্যাদ্‌বাদের বিস্তারিত আলোচনায় বোধ হয়, ইহাই সংগ্রহ করিতে পারা যায় যে, বাস্তব-জগতে বস্তুর-স্বরূপ এক প্রকার প্রহেলিকাময়। কারণ, কোন বস্তুকেই একান্তভাবে আছেও বলিতে পারি না, আবার নাইও বলিতে পারি না। নিত্যও বলিতে পারি না, আবার অনিত্যও বলিতে পারি না। একও বলিতে পারি না, আবার বহুও বলিতে পারি না। বস্তু তাহার নিজ স্বরূপের দ্বারা প্রতিনিয়তও বটে, আবার প্রতিনিয়ত নয়ও বটে। সেইজন্য জৈন আমাদিগকে সাবধান করিয়া দিয়া বলিয়াছেন, বস্তুকে কোন এক বিশেষণে বিশেষিত করিতে যাইও না। করিতে গেলেই ভ্রমে পতিত হইবে। আমার মনে হয়, ইহার ন্যায় ব্যাবহারিক জীবনে শ্রদ্ধের উপদেশ আর নাই। পারমার্থিক সত্য থাকিতে পারে এবং তাহার সম্বন্ধে কোন এক প্রকার একান্ত-সত্য-প্রকাশক বাক্য-প্রয়োগ করা সম্ভব হইতে পারে। কিন্তু যতক্ষণ ব্যাবহারিক জগতে আমাদের অবস্থান করিতে হইবে, যতক্ষণ প্রতীতির সাহায্যে বাহ্য বস্তু লইয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইবে, ততক্ষণ আমার বোধ হয়, স্যাদ্‌বাদ-প্রদর্শিত বস্তুস্বরূপ আমাদের ব্যাবহারিক জীবনযাত্রায় বাস্তবিক সহায়তা করে। বস্তু বিরুদ্ধ-ধর্ম্মের আধার হইতে পারে এবং অবক্তব্যও হইতে পারে। কিন্তু উহাই প্রকৃত বস্তুর স্বভাব এবং প্রকৃত বস্তু লইয়াই আমাদের কারবার করিতে হয়; কতকগুলি কল্পিত আন্তর ভাবের সহিত নহে।

এস্থলে আরও একটী কথার উত্থাপন বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না। আরিষ্টটলের তর্কশাস্ত্রে (Logic) Law of Identity, Contradiction এবং Excluded Middle নামে

তিনটী নিয়ম আছে। সেই তিনটী নিয়মের কার্য্য হইতেছে, ভাব-রাজ্যের সামঞ্জস্য নিরূপিত করা। Law of Identity অনুসারে আমরা বলিতে বাধ্য যে, যে বস্তুটীকে একবার যে প্রকার বলিয়া ধরিয়া লইব, কখনই তাহার ব্যতিক্রম হইবার উপায় নাই। যেমন A is A, ঘট ঘটই। A is B, এ কথা বলা চলে না, বা ঘটটী নূতন বা ঘটটী পুরাতন, এরূপ বাক্য প্রয়োগ করা চলে না। Law of Contradiction বলে যে, একটী মাত্র বস্তুতে দুইটী পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম্ম কল্পনা করা যায় না। .A cannot be both B and not—B. ঘটটী মৃৎ-সংস্থানবিশেষও বটে, আবার মৃৎসংস্থানবিশেষ নয়ও বটে, একথা বলা যায় না। এইরূপে Law of Excluded middleএ বলা হয় যে বস্তু কোন দ্বিকোটিবিনির্ম্মুক্ত, এ কথা বলা চলে না। হয় বল, ঘট অস্তি, না হয় বল, ঘটটী নাস্তি; উহা 'অস্তি' ও 'নাস্তি'—এই দুই ভিন্ন অপর কিছু, এ কথা বলা চলে না। আজকালকার পাশ্চাত্য প্র্যাগ্‌ম্যাটিক্ তর্ক-শাস্ত্রবিদ্‌গণ বলিতে চান যে, ঐ সমস্ত নিয়ম পরিণাম বা পরিবর্ত্তনহীন আন্তর-জগতে খাটিতে পারে, কিন্তু বাস্তব-জগতে খাটে না। সেই জন্য Dr. Schiller তাঁহার Formal Logic নামক গ্রন্থে প্রাচীন আরিষ্টটলের মতবাদ-খণ্ডন-প্রসঙ্গে প্রথমেই প্রশ্ন তুলিয়াছেন, "Are they laws of thought or of things?" বাস্তব-জগতের বস্তু লইয়াই আমাদের কারবার করিতে হয়। সুতরাং আমাদের চিন্তার নিয়মাবলী এমন হওয়া উচিত যে, উহারা সেই বাস্তব-জগতের বস্তু-সমুদায়ের প্রকৃতি-নির্ণয়ে সমর্থ হয়। আজ আমরা এতক্ষণ স্যাদ্‌-বাদ আলোচনা-প্রসঙ্গে বস্তুর প্রকৃতি-সম্বন্ধে যে তথ্য সংগ্রহ করিলাম, ঠিক এই প্রকার বস্তুর প্রকৃতি-সম্বন্ধে ধারণা লইয়াই Schiller-প্রমুখ আধুনিক পাশ্চাত্য তর্কশাস্ত্রবিদ্‌গণ চিরন্তন বস্তুনিরপেক্ষ তর্কশাস্ত্রের (Formal Logic) সংস্কারসাধনে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। তাঁহারা দেখাইতে চেষ্টা করিতেছেন যে, আরিষ্টটল-কথিত একান্ত-স্বরূপতা (rigid identity) ভাবজগতে থাকিতে পারে, প্রকৃতিসিদ্ধ বস্তুজগতে ঐরূপ একান্তস্বরূপতার অস্তিত্ব নাই। প্রতি বস্তুই নিত্যও বটে, পরিণমমানও বটে, উহার স্বরূপতা বজায় রাখিয়াও অনুক্ষণ ভেদকে আশ্রয় দিয়া থাকে। উহাতে Identityও আছে, আবার differenceও আছে। জৈনের ভাষায় বলিতে গেলে, উহা উৎপাদ, ধ্রৌব্য ও ব্যয়যুক্ত। উহা 'অস্তি'ও বটে, 'নাস্তি'ও বটে, আবার অবক্তব্যও বটে। সুতরাং উপরি-কথিত একান্তবাদী Law of Identity, Contradiction এবং Excluded Middle নিয়মত্রয়ের অবকাশ বস্তুজগতে নাই।

শ্রীহরিমোহন ভট্টাচার্য্য

—c—

আমাদিগের অয়নাংশ *

আমাদিগের অর্থাৎ হিন্দুদিগের অয়নাংশ লইয়া যে গোলযোগ ঘটিয়া আছে, তাহার মীমাংসার কিছু সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না। কয়েকবার ভারতের নানাস্থানে যে জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণের সভা আহূত হইয়াছিল, তাহাতে সমবেত সভ্যগণ কেবল বাগ্‌বিতণ্ডা করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছিলেন। পঞ্জিকাকারগণ স্বেচ্ছামত অয়নাংশ স্থির করিয়া নিজ নিজ পঞ্জিকায় লিপিবদ্ধ করিয়া আসিতেছেন। অধিকাংশ পঞ্জিকাতেই সূর্য্যসিদ্ধান্তমতানুযায়ী সিদ্ধান্ত-রহস্য-মতে অয়নাংশ গণিত হইয়া আসিতেছে। বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত-পঞ্জিকায় স্বর্গীয় মহামহোপাধ্যায় বাপুদেব শাস্ত্রীর মতানুসারে অয়নাংশ গ্রহণ করা কতদূর যুক্তিপূর্ণ, তাহার উল্লেখ করিবার আবশ্যকতা দেখি না। আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীমান্ সাতকড়ি সিদ্ধান্তভূষণ মহাশয়ের প্রণীত "বঙ্গে পঞ্জিকা-সংস্কার" নামক পুস্তকে ইহার সবিশেষ আলোচনা আছে।

দুই বৎসর পূর্ব্বে আমার পরমবন্ধু শ্রীমান্ ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত Journal of the Department of Letters নামক সাময়িক পত্রিকার পঞ্চম খণ্ডে হিন্দুগণিত ও জ্যোতিষ-বিষয়ক কয়েকটী প্রবন্ধ একত্রে প্রকাশ করেন। প্রথম প্রবন্ধটীতে তিনি হিন্দুদিগের অয়নাংশ-সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া আধুনিক পাশ্চাত্য জ্যোতিষের সাহায্যে তাহার মূলতত্ত্বের যথার্থতা প্রমাণ করিয়াছেন। তাঁহার সিদ্ধান্তটী বিশেষ যুক্তিপূর্ণ মনে হওয়ায়, তাহা সাধারণ ও পণ্ডিতমণ্ডলীর নিকট উপস্থাপিত করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। বলিয়া রাখি যে, ইহা তাঁহার প্রবন্ধের অনুবাদ নহে; অয়নাংশের মূলতত্ত্বটী হিন্দু ও পাশ্চাত্য জ্যোতিষের পক্ষ হইতে এভাবে আলোচনা করা হইয়াছে, যাহাতে সকলেই বিষয়টী হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন। আর এক কথা, জ্যোতিঃশাস্ত্রে পাণ্ডিত্য-প্রকাশের উদ্দেশ্যে এ প্রবন্ধ লিখিত হয় নাই। কারণ, সে কথা আমার পক্ষে আদৌ খাটে না। এই প্রবন্ধ-পাঠে যদি সকলে অয়নাংশের মূলতত্ত্বটী যুক্তিপূর্ণ বলিয়া মনে করেন, তাহা হইলে যাহাতে ইহা কর্ম্মক্ষেত্রে গৃহীত হয়, ইহাই আমার উদ্দেশ্য।

উল্লেখ করিয়া রাখি যে আমাদের মধ্যে অনেকেই কোন সিদ্ধান্তের পক্ষে বা বিপক্ষে যুক্তিপূর্ণ প্রমাণ উপস্থাপিত করিতে না পারিয়া বৃথা বাদ-বিসংবাদ করিয়া থাকেন; তাঁহারা কোন বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া মতান্তর হইতে মনান্তরে উপনীত হন ও বৃথা গালাগালি করিয়াই ক্ষান্ত হন—ফলে কিছুই হয় না। কিন্তু বিজ্ঞানশাস্ত্রে এরূপ হওয়া অতীব দুঃখের বিষয়। বিজ্ঞান-শাস্ত্রে কোন বিষয় এইরূপ আলোচনা ও তর্ক-বিতর্ক ভিন্ন পরিমার্জ্জিত হইতে পারে না, ইহাতে আমরা আমোদ না পাইয়া রাগান্বিত হইব কেন? এই বিষম বুদ্ধিবৃত্তির ফলে আমাদের উন্নতি হওয়া দূরে থাকুক, ক্রমশঃ অবনতি ঘটিতেছে।

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ১৩৩০ বঙ্গাব্দের তৃতীয় মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

প্রবন্ধটী পাঁচ ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। প্রথমতঃ, প্রাচীন সিদ্ধান্ত-জ্যোতিষ-গ্রন্থে অয়নাংশ-সম্বন্ধে যাহা পাওয়া যায়, সেগুলি লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। সোমসিদ্ধান্ত, ব্রহ্ম-সিদ্ধান্ত, সূর্য্য-সিদ্ধান্ত, বৃদ্ধবসিষ্ঠ-সিদ্ধান্ত, বসিষ্ঠ-সিদ্ধান্ত, মহাসিদ্ধান্ত, ও সিদ্ধান্ত-শিরোমণিতে অয়নাংশ-সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহাদের মূল, সরল অনুবাদ ও একটী করিয়া উদাহরণ প্রদত্ত হইয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ, অয়নাংশ-নিরূপণের মূলতত্ত্ব-সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে।

তৃতীয়তঃ, পাশ্চাত্ত্য জ্যোতিষের সাহায্যে অয়নাংশের মূলতত্ত্বের যথার্থতা প্রমাণ করা হইয়াছে। সাধারণের উপলব্ধির জন্য পাশ্চাত্ত্য জ্যোতিষের যে যে অংশ না জ্ঞাত থাকিলে উপস্থাপিত বিষয়টী হৃদয়ঙ্গমে অসুবিধা হইবে, তৎসম্বন্ধে প্রথমে কিছু লিখিত হইয়াছে।

চতুর্থতঃ, সিদ্ধান্ত-জ্যোতিষ-গ্রন্থে অয়নাংশ নিরূপণের যে প্রক্রিয়াগুলি বিবৃত আছে, তাহাদের মূলতত্ত্ব পাশ্চাত্ত্য জ্যোতিষের সহিত তুলনা করা হইয়াছে।

পঞ্চমতঃ, বিশুদ্ধরূপে অয়নাংশ-নিরূপণের উপায়-সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ লিখিত হইয়াছে।

১। আমরা বেদাঙ্গ জ্যোতিষ এবং পিতামহ-সিদ্ধান্তে অয়নাংশের কোন উল্লেখ পাই নাই। ব্রহ্মস্ফুট-সিদ্ধান্তেও এ সম্বন্ধে কোন কথা দেখা যায় না। গ্রহলাঘবাদি আধুনিক গ্রন্থ অনাবশ্যক-বোধে আলোচিত হইল না।

(ক) সোমসিদ্ধান্ত। আমরা সোম-সিদ্ধান্তে সংক্ষেপে অয়নাংশ-নিরূপণের প্রক্রিয়ার উল্লেখ দেখিতে পাই। স্পষ্টাধিকারে ৩১ ও ৩২ শ্লোক উদ্ধৃত হইল,—

> যুগে চ ষট্‌শতৈকত্বে ভচক্রং প্রাক্ চ লম্বতে।
> তদ্‌গুণো ভূদিনৈর্ভক্তো দ্যুগণোঽয়নখেচরঃ ॥
> তচ্ছুদ্ধচক্রদোর্লিপ্তা দ্বিশত্যাপ্তায়নাংশকাঃ।
> সংস্কার্য্যা জূকমেষাদৌ কেন্দ্রে স্বর্ণং গ্রহে কিল ॥

একযুগে (মহাযুগে) ভচক্র ছয়শত বার পূর্ব্বদিকে লম্বিত হয়। এই সংখ্যা ভূদিন (অর্থাৎ সৃষ্টির আদি হইতে গত দিন-সংখ্যা) দ্বারা গুণ করিয়া গুণফলকে দ্যুগণ (অর্থাৎ এক যুগের দিন-সংখ্যা) দ্বারা ভাগ করিলে, অয়ন-খেচর (অয়নগতি) নির্ণীত হইবে।

ভূদিনের অয়নগতির শুদ্ধচক্রকে (অর্থাৎ ভুজজ্যাকে) ৬০০ ছয় শত দ্বারা বিভক্ত করিয়া ২০০ দুইশত দ্বারা গুণ করিলে, অভীষ্ট ভূদিনের অয়নাংশ পাওয়া যাইবে।

অয়নগ্রহ তুলাদি ছয় রাশিতে হইলে অয়নাংশ গ্রহে যোগ এবং মেষাদি ছয় রাশিতে থাকিলে বিয়োগ করিয়া সংস্কার করিতে হইবে।

প্রথম প্রক্রিয়াটী একটী ত্রৈরাশিক মাত্র—দ্যুগণ : ভূদিন : : ৬০০ : অভীষ্ট ভূদিনের অয়নগতি। (ক)

দ্বিতীয় প্রক্রিয়াটী (ক) এর ভুজজ্যা নিরূপণ করা।

তৃতীয় প্রক্রিয়াটী ও একটী ত্রৈরাশিক—

৬০০ : অয়নগতির ভুজজ্যা : : ২০০ : অয়নাংশ। এই অয়নাংশ তুলাদি ছয় রাশিতে অবস্থিত হইলে, ইহা গ্রহে যুক্ত হইবে এবং মেষাদি ছয় রাশিতে থাকিলে বিযুক্ত হইবে।

উদাহরণ। ১৮৪৪ শকাব্দের ১লা বৈশাখের অয়নাংশ নিরূপণ।

সৃষ্টির আদি হইতে অভীষ্ট বর্ষ পর্য্যন্ত গতবর্ষ-সংখ্যা—

সৃষ্টির আদি হইতে কলিযুগের আদি পর্য্যন্ত		১৯৬৯৯২০০০০
শকাব্দের আদি পর্য্যন্ত গত কলিবর্ষ	....	৩১৭৯
শকবর্ষ ...	...	১৮৪৪
	মোট	১৯৬৯৯২৫০২৩

অতএব অয়নগতি

$$= \frac{৬০০ \times ১৯৬৯৯২৫০২৩ \times \text{বর্ষের দিন-সংখ্যা}}{৪৩২০০০০০ \times \text{বর্ষের দিন-সংখ্যা}}$$

$= ২৭৩৬০০।২৫১$ অংশ ৯ কলা।

ইহার চক্র (বৃত্তাংশ) $= ২৫১$ অংশ ৯ কলা।

ইহার ভুজজ্যা (বিষমপাদে অবস্থিত বলিয়া)

$= ২৫১$ অংশ ৯ কলা $-$ ১৮০ অংশ

$= ৭১$ অংশ ৯ কলা।

সুতরাং অয়নাংশ $= \frac{৭১।৯ \times ২০০}{৬০০}$

$= ৭১।৯ \times \frac{১}{৩}$ (প্রায়)

$= ২৩$ অংশ ৪৩ কলা।

(খ) **ব্রহ্মসিদ্ধান্ত**। এই গ্রন্থ ব্রহ্মস্ফুট-সিদ্ধান্ত হইতে ভিন্ন। ব্রহ্মসিদ্ধান্তে আমরা অয়নাংশের বিস্তৃত বিবরণ দেখিতে পাই, তাহাতে বুঝিতে হইবে যে, ব্রহ্মসিদ্ধান্তের গ্রন্থকার অয়নাংশ-বিষয়ে বিশেষ আকৃষ্ট ছিলেন এবং তাহা বিশেষরূপে শিক্ষা করিয়াছিলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে ১৮৪—১৯৩ শ্লোক নিম্নে উদ্ধৃত হইল,—

কর্ক্যাদিস্থা মৃগান্তস্থাঃ স্পষ্টৈরুদগবাঙ্মুখাঃ।
প্রত্যব্দং যান্তি যাম্যোদগ্গমনে বিহিতেঽপি যৎ॥
তত্তৎ পশ্চাল্লবক্রান্তিপ্রসঙ্গাদত্রিদৃগ্লবাঃ।
ততোঽন্তথাঽথ প্রত্যব্দং কিঞ্চিৎ কিঞ্চিদ্ ব্রজন্তি হি॥
তত্তৎ পশ্চান্নবক্রান্তিপ্রসঙ্গেঽপি নিজাস্পদাৎ।
পশ্চিমাংশক্রমপ্রাপ্তে প্রাক্ চক্রং চলিতং হিতং॥
যাবৎ স্পষ্ট্যাদিনির্দিষ্টস্থানং তাবৎ প্রতান্তি তে।
আদ্যোষু চরতাং তেষামন্তরং শাস্ত্রদাস্পদাৎ॥

তদ্বৎপ্রাগংশকক্রান্তিপ্রাপ্তেঃ স্যাৎ প্রাগ্লবস্য চ।
প্রাক্ চক্রং চলিতং চেতি নারদৈবোপর্য্যতে॥
প্রাগংশক্রমমপ্রাপ্তে প্রাক্ চক্রং চলিতং ভবেৎ।
প্রাক্‌পশ্চাচ্চলনাংশোনাঃ স্বর্ণং স্যাদ্ভাস্করাদিষু॥
ক্রান্তিকীলাংশলগ্নানাং লম্বনং দ্যুগতং দ্বয়োঃ।
স্ফুটার্থময়নার্থং চ প্রত্যহং হ্যুদয়াস্তয়োঃ॥
যদ্দিনে যস্য কক্ষা চ তত্র তেষাম্ প্রবৃত্তিতঃ।
ইত্যেতদেকং চলনং প্রাক্ যুগেতানি চ ষট্‌শতম্॥
যুক্ত্যাহয়নগ্রহস্তস্মিংস্তুলাদৌ প্রাক্‌চলং ভবেৎ।
তচ্ছুদ্ধচক্রে বিযুক্ত্যা মেষাদৌ প্রাক্ চলং ভবেৎ॥
অয়নাংশস্তদ্‌ভুজাংশাস্ত্রিঘ্নাঃ সন্তোদশোদ্ধৃতাঃ।
প্রাক্‌প্রত্যক্‌চলনং চক্রস্যেবেতি মনুতে তু যঃ॥

সৃষ্টির আদি হইতে পরবর্ত্তী কালে কর্কটের আদিতে এবং মকরের অন্তে স্থিত যাহা দক্ষিণ ও উত্তর দিকে প্রতি বৎসর নিয়মিতরূপে গমনাগমন করিতেছে, সেই সচলক্রান্তি পশ্চাদ্দিকে ২৭ সাতাইশ অংশ চালিত হয়, তবে তাহাতে এই অন্যথা যে, ইহা প্রতিবৎসর কিঞ্চিৎ করিয়া চালিত হয়। এইরূপে পশ্চিমদিকে চালিত ক্রান্তি নিজ স্থান হইতে ক্রমশঃ পশ্চিমাংশ প্রাপ্ত হইলে, ভচক্র পূর্ব্বদিকে চালিত হইতে থাকে এবং সৃষ্ট্যাদি স্থানে যাবৎ উপস্থিত না হয়, তাবৎ চলিতে থাকে। সচল ক্রান্তিপাতের নিজ স্থান হইতে আদিস্থানের অন্তর অয়নাংশ। নিজ পূর্ব্বগতি এবং পূর্ব্বাংশ-স্থিত ক্রান্তি পাইবার জন্য ভচক্র পূর্ব্বদিকে চালিত হয়—নারদও ইহা সমর্থন করিয়াছেন। ক্রমশঃ পূর্ব্বাংশ অপ্রাপ্তে (অর্থাৎ যতদিন পূর্ব্বাংশ প্রাপ্ত না হয়) চক্র পূর্ব্বদিকে চালিত হয়। (ভচক্রের) এই পূর্ব্ব ও পশ্চিমে চলনের জন্য অয়নাংশ সূর্য্যাদিতে যুক্ত এবং বিযুক্ত হয়। ক্রান্তিচ্ছায়া ও লগ্নের দিনগত লম্বন (পরিমাণ) এবং প্রত্যহ উদয়াস্তের স্পষ্টার্থ অয়নের জন্য (হইয়া থাকে)।

যে কক্ষায় ছিল, সেই কক্ষায় ক্রান্তিপাতের পুনরাগমনে এক অয়নচলন হয়। এক যুগে তাহা পূর্ব্বদিকে ৬০০ বার। অয়নগ্রহের তুলাদিতে পূর্ব্বদিকে গতি হইলে, অয়নাংশ যোগ করিতে হয়। মেষাদিতে শুদ্ধচক্রে পূর্ব্বদিক্‌গমনে বিয়োগ করিতে হয়।

অয়নগ্রহের ভুজাংশকে তিন গুণ করিয়া দশ ভাগ করিলে অয়নাংশ হইবে।

এইরূপে পূর্ব্ব ও পশ্চিমদিকে রাশিচক্রের গতি জানিতে হইবে।

দেখা যাইতেছে যে, ব্রহ্মসিদ্ধান্তকারের মতেও অয়নগ্রহ এক যুগে (মহাযুগে) ছয়শত বার পূর্ব্বদিকে চালিত হয়। তিনিও অয়নগ্রহের ভুজাংশ গ্রহণ করিতে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তৎপরে যে প্রক্রিয়াটী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা সোমসিদ্ধান্ত হইতে ভিন্ন, তবে ইহাও একটী ত্রৈরাশিক—

১০ (৯০) : অয়নগ্রহের ভুজজ্যা : : ৩ (২৭) : অভীষ্ট অয়নাংশ।

উদাহরণ। ১৮৪৪ শকাব্দের ১লা বৈশাখের অয়নাংশ।

সৃষ্টির আরম্ভ হইতে গতবর্ষ ১৯৬৯৯২৫০২৩। এক মহাযুগে অয়নগ্রহের ৬০০ বার চলনের হিসাবে অভীষ্ট বর্ষ-সংখ্যায় অয়নগ্রহের চলন ২৭৩৬০।২৫১ অংশ ৯ কলা।

ইহার চক্রাংশ (বৃত্তাংশ) ২৫১ অংশ ৯ কলা।

ইহার ভুজজ্যা = ২৫১ অংশ ৯ কলা — ১৮০ অংশ

= ৭১ অংশ ৯ কলা

সুতরাং অয়নাংশ

$$= ৭১।৯ \times \frac{৩}{১০} \frac{(২৭)}{(৯০)}$$

= ২১ অংশ ২০ কলা ৪২ বিকলা।

(গ) **সূর্য্যসিদ্ধান্ত**। এই গ্রন্থে অয়নাংশের মূলতত্ত্ব ব্রহ্মসিদ্ধান্তের অনুযায়ী; অয়নাংশের বিবরণ কিন্তু সংক্ষেপে লিখিত হইয়াছে। সূর্য্যসিদ্ধান্তখানি অন্যান্য সিদ্ধান্ত-জ্যোতিষ-গ্রন্থগুলি অপেক্ষা অধিকতর সম্পূর্ণ ও প্রচলিত। ইহার অনেক টীকাও লিখিত হইয়াছে। অয়নাংশবিবরণ যে স্থলে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে, তাহার পূর্ব্ব-পশ্চাৎ শ্লোকগুলি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া মহামহোপাধ্যায় বাপুদেব শাস্ত্রী অয়নাংশের শ্লোকগুলি প্রক্ষিপ্ত বলিয়া বিবেচনা করেন। প্রক্ষিপ্ত হইলেও অয়নাংশের মূলতত্ত্বের যে কোন গোলযোগ নাই, তাহা অন্যান্য সিদ্ধান্ত-গ্রন্থের আলোচনায় স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়।

ত্রিপ্রশ্নাধিকারে ৯—১২ শ্লোকে অয়নাংশের কথা উল্লিখিত আছে, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল,—

ত্রিংশৎ কৃত্যো যুগে ভানাং চক্রং প্রাক্ পরিলম্বতে।
তদ্‌গুণাদ্‌ভূদিনৈর্ভক্তাদ্ দ্যুগণাদ্যদবাপ্যতে॥
তদ্দোস্ত্রিঘ্না দশাপ্তাংশা বিজ্ঞেয়া অয়নাভিধাঃ॥
তৎসংস্কৃতাদ্ গ্রহাৎ ক্রান্তিচ্ছায়া চরদলাদিকম্॥
স্ফুটং দৃক্‌তুল্যতাং গচ্ছেদয়নে বিষুবদ্দ্বয়ে।
প্রাক্ চক্রং চলিতং হীনে ছায়ার্কাৎ করণাগতে॥
অন্তরাংশৈরথাবৃত্য পশ্চাচ্ছেষৈস্তথাধিকে॥

এক মহাযুগে ভচক্র ৩০ × ২০ বা ৬০০ বার পূর্ব্বদিকে লম্বিত হইতে থাকে (ভাস্করাচার্য্য ৩০০ বার বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু সূর্য্যসিদ্ধান্তের টীকাকারগণ ৬০০ বার বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন)।

অহর্গণকে ৬০০ দিয়া গুণ করিয়া যুগের দিন-সংখ্যা দিয়া ভাগ করিলে যাহা হইবে, তাহার ভুজাংশকে ৩ দিয়া গুণ করিয়া ১০ দিয়া ভাগ দিলে যাহা হইল, তাহাই অয়নাংশ

অয়নাংশ সংস্কৃত গ্রহ হইতে ক্রান্তিচ্ছায়া চরদলাদি সাধিত হইবে।

অয়নে (অর্থাৎ উত্তরায়ন ও দক্ষিণায়ণ সংযোগে) এবং বিষুবদ্বয়ে দৃক্‌তুল্যতা দ্বারা ইহা প্রত্যক্ষ হইবে।

ছায়া হইতে প্রাপ্ত রবি (রবিস্ফুট) হইতে গণিতাগত রবি হীন হইলে চক্র পূর্ব্বগামী হয়। ছায়া সাধিত রবি হইতে গণিতাগত রবি অধিক হইলে উভয়ের অন্তরাংশ পরিমাণে ভচক্র পশ্চিমগামী হয়।

সূর্য্যসিদ্ধান্তের অয়নাংশের মূলতত্ত্ব ব্রহ্মসিদ্ধান্তানুযায়ী। প্রথম ও তৃতীয় প্রক্রিয়াটী ত্রৈরাশিক।

উদাহরণ। ১৮৪৪ শকাব্দের ১লা বৈশাখের অয়নাংশ।

সৃষ্ট্যাদি গতবর্ষ ১৯৬৯৯২৫০২৩ অভীষ্টবর্ষের অহর্গণে ভচক্রের পরিভ্রমণ।

$$= \frac{\text{অহর্গণ} \times ৬০০}{\text{যুগের দিন-সংখ্যা}}$$

$$= ২৭৩৬০।২৫১ \text{ অংশ } ৯ \text{ কলা।}$$

ইহার ভুজজ্যা ৭১ অংশ ৯ কলা।

সুতরাং অয়নাংশ

$$= ৭১।৯ \times \frac{৩}{১০}$$

$$= ২১ \text{ অংশ } ২০ \text{ কলা } ৪২ \text{ বিকলা।}$$

(ঘ) বৃদ্ধবসিষ্ঠসিদ্ধান্ত। এই সিদ্ধান্তের গ্রন্থকার মূলতত্ত্ব বজায় রাখিয়া একটী অপেক্ষাকৃত সহজ প্রক্রিয়ায় অয়নাংশ নিরূপণের পন্থা প্রদর্শন করিয়াছেন।

মধ্যমাধিকারে ৩৬—৩৮ শ্লোকে অয়নাংশ বর্ণিত আছে।

অষ্টাদশ শত ১৮০০ শিষ্টেহব্দে
ভ২৭ বিনিঘ্নে বিভাজিতে বিষমে।
ভুক্তে যুগ্মে গম্যে খখগজচন্দ্রৈ ১৮০০
চলাংশকা স্বর্ণাঃ॥

ছায়াগণিতাগতয়োর্ভানোর্বিবরং চলাংশকাস্তে বা।
ছায়ার্কাদগণিতার্কো হীনঃ পূর্ব্বোহন্যথা পশ্চাৎ॥
খচরাশ্চলন্তি তস্মাৎ পূর্ব্বে যুক্তাশ্চ পশ্চিমে হীনাঃ।
তস্মাদপমচ্ছায়া চরদলনাড়াদিকং সাধ্যং॥

১৮০০ বৎসরের অবশিষ্ট বর্ষকে (অর্থাৎ অভীষ্ট বর্ষ-সংখ্যাকে ১৮০০ দ্বারা ভাগ দিলে, যাহা অবশিষ্ট থাকিবে তাহাকে,) ২৭ দিয়া গুণ করিয়া ১৮০০ দিয়া ভাগ করিলে অয়নাংশ হইবে।

অয়নাংশ অযুগ্মপাদে থাকিলে যুক্ত ও যুগ্মপাদস্থ হইলে বিযুক্ত হইবে।

ছায়াসূর্য্য ও গণিতসূর্য্যের প্রভেদ অয়নাংশ (নামে অভিহিত); ছায়ার্ক গণিতার্ক হইতে হীন হইলে অয়নাংশ পূর্ব্বে এবং অন্যথা হইলে পশ্চিমে অবস্থিত হয়।

সূর্য্যাদি গ্রহের পূর্ব্বে থাকিলে অয়নাংশ যুক্ত এবং পশ্চিমে থাকিলে অয়নাংশ বিযুক্ত হইবে। তাহা হইতে অপমচ্ছায়া চরদলনাড্যাদি সংস্কার করিতে হয়।

বৃদ্ধবসিষ্টসিদ্ধান্তের মূলতত্ত্ব ব্রহ্মসিদ্ধান্তমতানুযায়ী। প্রক্রিয়াটী একটী ত্রৈরাশিক।

এক যুগে অর্থাৎ ৪৩২০০০০ বৎসরে ভচক্র ৬০০ বার লম্বিত হয়, সুতরাং $\frac{৪৩২০০০০}{৬০০}$ বা ৭২০০ বৎসরে ইহা একবার লম্বিত হয়। এই সময়ে অর্থাৎ ৭২০০ বৎসরে অয়নাংশ পূর্ব্ব-পশ্চিমে ২৭ × ৪ বা ১০৮ অংশ গমনাগমন করে।

সুতরাং অয়নাংশের ২৭ অংশ গমনে $\frac{৭২০০}{৪}$ বা ১৮০০ বৎসর লাগে।

ক্রান্তি-বিন্দু নিরয়ণ-বিন্দু হইতে ২৭ অংশ পর্য্যন্ত পূর্ব্ব-পশ্চিমে পরিভ্রমণ করে বলিয়া গ্রন্থকার অভীষ্ট বর্ষ-সংখ্যাকে ১৮০০ দিয়া ভাগ দিতে বলিয়াছেন। ভাগফল যত হইবে, ততবার ক্রান্তি-পাতবিন্দু ও নিরয়ণবিন্দুর মিলন হইবে, সুতরাং ভাগশেষ যাহা থাকিবে, সেই বর্ষ-সংখ্যায় ক্রান্তি-বিন্দু নিরয়ণ-বিন্দু হইতে অপসৃত হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

এক্ষণে ত্রৈরাশিক দ্বারা ঐ বর্ষ-সংখ্যার অয়নাংশ নির্ণীত হইবে।

১৮০০ : অবশিষ্ট বর্ষসংখ্যা : : ২৭ : অভীষ্ট বর্ষের অয়নাংশ।

উদাহরণ। ১৮৪৪ শকাব্দে ১লা বৈশাখের অয়নাংশ।

সৃষ্ট্যাদি গতবর্ষ ১৯৬৯৯২৫০২৩ $= \frac{১৯৬৯৯২৫০২৩}{১৮০০} =$ ১০৯৪৪০২ ভাগশেষ ১৪২৩

সুতরাং অভীষ্ট বর্ষের অয়নাংশ $= \frac{১৪২৩ \times ২৭}{১৮০০} =$ ২১ অংশ ২০ কলা ৪২ বিকলা।

(ঙ) **বসিষ্ঠসিদ্ধান্ত**। এই গ্রন্থে কেবল অয়নাংশ-নিরূপণের সঙ্কেত দেওয়া আছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে (স্ফুটগত্যাধিকারে) ৫৫ম শ্লোকে অয়নাংশ-নিরূপণের উপায় লিখিত আছে,—

অব্দাঃ খখদ্ব্যগৈ ৭২০০ র্ভাজ্যাস্তদ্দোস্ত্রিয়া দশোদ্ধৃতাঃ।

অয়নাংশা গ্রহে যুক্তা···

সৃষ্ট্যাদি গতবর্ষ ৭২০০ দ্বারা বিভক্ত করিয়া তাহার অংশাদির ভুজজ্যা তিন গুণ করিয়া ১০ দিয়া ভাগ করিলে অয়নাংশ হইবে। ইহা গ্রহে যুক্ত হইবে।

উদাহরণ। ১৮৪৪ শকাব্দে ১লা বৈশাখের অয়নাংশ সৃষ্ট্যাদি গতবর্ষ ১৯৬৯৯২৫০২৩

$\frac{১৯৬৯৯২৫০২৩}{৭২০০} = \frac{১৯৬৯৯২৫০২৩ \times ৬০০}{৪৩২০০০০} =$ ২৫১ অংশ ৯ কলা

ইহার ভুজজ্যা = ২৫১।৯ − ১৮০ = ৭১ অংশ ৯ কলা।

সুতরাং অয়নাংশ = ৭১।৯ × $\frac{৩}{১০}\frac{(২৭)}{(৯০)}$ = ২১ অংশ ২০ কলা ৪২ বিকলা।

ইহাতে দেখা যাইতেছে যে, ইহার মূলতত্ত্ব ব্রহ্মসিদ্ধান্ত বা সূর্য্যসিদ্ধান্তমতানুযায়ী।

(চ) **মহাসিদ্ধান্ত**। আর্য্যভটের রচিত মহাসিদ্ধান্তে আমরা দুইটী পৃথক্‌গতির উল্লেখ দেখিতে পাই। প্রথমতঃ মধ্যমাধিকারের ১১ শ্লোকে সপ্তর্ষি-ভগণের উল্লেখ আছে। ইহাতে লিখিত আছে,—

সপ্তর্ষীণাং কুণিধুধিধুধিজ্ঞা

এককল্পে সপ্তর্ষিগণের ভগণ ১৫৯৯৯৯৮। দ্বিতীয়তঃ এই শ্লোকে ও তৎপরবর্ত্তী শ্লোকে অয়নগ্রহের ভগণ দেওয়া আছে,—

.........মসিহটমুধাঃ।
অয়নগ্রহস্য

অয়নগ্রহের ভগণ এক কল্পে ৫৭৮১৫৯।

আর্য্যভট দুইটী ভগণই এক কল্পের জন্য স্থির করিয়াছেন।

পুনশ্চ স্পষ্টাধিকারের ১৩ শ্লোকে অয়নাংশ বর্ণিত হইয়াছে —

অয়নগ্রহদোঃ ক্রান্তিজ্যা চাপং কেন্দ্রবদ্ধনর্ন স্যাৎ।
অয়নলবাস্তৎ সংস্কৃতখেটাদায়নচরার্দ্ধপলানি॥

অয়নগ্রহের (অর্থাৎ পূর্ব্বোল্লিখিত অয়নগ্রহ-ভগণের) ভুজজ্যা হইতে ক্রান্তিজ্যা নির্ণয় করিয়া তাহার চাপকে মেষাদি ৬ রাশিতে যুক্ত এবং তুলাদি ৬ রাশিতে বিযুক্ত হইবে। ইহাই অয়নলব অর্থাৎ অয়নাংশ। তৎসংস্কৃত খেট (গ্রহ) হইতে অয়ন (দৃক্‌কর্ম্মাদি) ও চরার্দ্ধপল নির্ণীত হয়।

উদাহরণ। ১৮৪৪ শকাব্দের ১লা বৈশাখের অয়নাংশ। সৃষ্ট্যাদি গতবর্ষ ১৯৬৯৯২৫০২৩।

এককল্পে অয়নগ্রহ-ভগণ ৫৭৮১৫৯

এক কল্পের বর্ষ-সংখ্যা ৪৩২০০০০০০০

সুতরাং ৪৩২০০০০০০০ : ১৯৬৯৯২৫০২৩ : : ৫৭৮১৫৯ : . অভীষ্ট বর্ষ-সংখ্যায় অয়নগ্রহ ভগণাদি

$$\text{অভীষ্ট বর্ষসংখ্যায় অয়নগ্রহ ভগনাদি} = \frac{১৯৬৯৯২৫০২৩ \times ৫৭৮১৫৯}{৪৩২০০০০০০০}$$

$$= \frac{১১৩৮৯২৯৮৮১৩৭২৬৫৭}{৪৩২০০০০০০০}$$

$$= ২৭৩৬৪১।৬৩ \text{ অংশ } ২৬ \text{ কলা } ৫১\text{'}৮ \text{ বিকলা}$$

বৃত্তের প্রথম পাদে থাকায় ৬৩ অংশ ২৬ কলা ৫১'৮ বিকলা ইহাই ভুজজ্যা।

৬৩ অংশ ২৬ কলা ৫১'৮ বিকলা = ৩৮০৬'৮৬ কলা

৩৮০৬'৮৬ কলার চাপ = ৩০৭৫'৪৬

পরমক্রান্তিজ্যার চাপ = ১৩৯৭

$$\text{অয়নগ্রহের ক্রান্তিজ্যার চাপ} = \frac{(৩০৭৫\text{'}৪৬) \times ১৩৯৭}{৩৪৩৮}$$

$$= ১২২০\text{'}৫৯৮ \text{ চাপ}$$

ইহার ধনু = ২২ অংশ ১ কলা ১২'৪৮ বিকলা
= অয়নাংশ (যুক্ত)।

এ স্থলে মহাসিদ্ধান্ত-সম্বন্ধে দুইটী বক্তব্য আছে। প্রথমতঃ, সপ্তর্ষি-ভগণের এক কল্পে যে সংখ্যা উল্লিখিত আছে, তাহাতে ভ্রম-প্রমাদ দৃষ্ট হয়, লিপি-প্রমাদবশতঃ ইহা ঘটিয়াছে বলিয়া মনে হয়। সংখ্যাটী ৬টী অঙ্কবিশিষ্ট হইবে এবং সম্ভবতঃ ইহা ১৫৯৯৯৮ হইবে। এ বিষয়ে আমরা পরে আলোচনা করিব।

দ্বিতীয়তঃ, মহাসিদ্ধান্তের টীকায় মহামহোপাধ্যায় সুধাকর দ্বিবেদী অয়নগ্রহ-সম্বন্ধে ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। তৎপ্রকাশিত মহাসিদ্ধান্তের বিষয় বর্ণনার ৪ পৃষ্ঠা এবং contents এর ৩ পৃষ্ঠায় তিনি অয়নগ্রহ হইতে বাৎসরিক অয়নাংশ ১৭৩·৪৪৭৭ বিকলা স্থির করিতে চাহেন। তিনি লিখিয়াছেন—

এককল্পে অয়নগ্রহের ভগণ-সংখ্যা ৫৭৮১৫৯×১২৯৬০০০ বিকলা (অর্থাৎ ৩৬০ অংশের বিকলা-সংখ্যা); এবং এক কল্পের সৌর-বর্ষসংখ্যা দিয়া ঐ রাশিকে বিভক্ত করিলে এক সৌর বর্ষে অয়নগ্রহ চলন

$$= \frac{৫৭৮১৫৯ \times ১২৯৬০০০}{৪৩২০০০০০০০} \text{ বা } ১৭৩·৪৪৭৭ \text{ বিকলা।}$$

ইহাকে তিনি এক সৌরবর্ষের অয়নাংশ বলিয়া স্বীকার করিতে চান। কিন্তু আর্য্যভটের মতে অয়ন-গ্রহের ৩৬০ অংশ-ভ্রমণে অয়নাংশের গমনাগমন ২৪×৪=৯৬ অংশ মাত্র হইবে। সুতরাং বার্ষিক অয়নাংশ=

$$\frac{১৭৩·৪৪৭৭ \times ৯৬}{৩৬০} = ৪৬·২৫২৭ \text{ বিকলা}$$

আমরা পরে ইহার যথার্থতা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিব।

(ছ) সিদ্ধান্তশিরোমণি। ভাস্করাচার্য্যের সিদ্ধান্তশিরোমণির গোলাধ্যায়ে ১৭ এবং ১৮ শ্লোকে অয়নাংশ সম্বন্ধে ইহা লিখিত আছে—

বিষুবৎক্রান্তিবলয়োঃ সম্পাতঃ ক্রান্তিপাতঃ স্যাৎ।
তদ্ভগণাঃ সৌরোক্তা ব্যস্তা অযুতত্রয়ং কল্পে॥
অয়নচলনং যদুক্তং মুঞ্জালাদৈ স এবায়ং।
তৎপক্ষে ভগণাঃ কল্পে গোহঙ্গর্ত্তুনন্দগোচন্দ্রাঃ॥

বিষুবরেখা ও ক্রান্তি-বৃত্তের সম্পাতে ক্রান্তিপাত হয়। সূর্য্যসিদ্ধান্তমতে ক্রান্তিপাতের ভগণ বিপরীত-গতিতে এক কল্পে তিন অযুত। মুঞ্জাল প্রভৃতি জ্যোতির্বিগণ তাহাকে অয়নচলন বলিয়াছেন। তাঁহাদের মতে এককল্পে ক্রান্তিপাত-ভগণ ১৯৯৬৬৯।

পণ্ডিত শ্রীরাধাবল্লভ স্মৃতি-ব্যাকরণ-জ্যোতিস্তীর্থ মহাশয়ের সঙ্কলিত সিদ্ধান্ত-শিরোমণির গোলাধ্যায়ের ১৪৭ পৃষ্ঠায় মুঞ্জালের অভিমত উদ্ধৃত হইয়াছে।

উত্তরতো যাম্যদিশং যাম্যান্তাত্তদনু সৌম্যদিগ্‌ভাগং।
পরিসরতাং গগনসদাং চলনং কিঞ্চিদ্ ভবেদপমে॥

বিষুবদপক্রম-মণ্ডল-সম্পাতে প্রাচিমেষাদিঃ।
পশ্চাত্তুলাদিরনয়োরপক্রমাসম্ভবঃ প্রোক্তঃ॥
রাশিত্রয়ান্তরেঽস্মাৎ কর্কাদিরমুক্রমান্মৃগাদিশ্চ।
তত্র চ পরমাক্রান্তি র্জিন-ভাগ-মিতার্থ তত্রৈব॥
নির্দ্দিষ্টোঽয়নসন্ধিশ্চলনং তত্রৈব সম্ভবতি।
তদ্ভগণাঃ কল্পে স্যুর্গোরস-রস-গোঽঙ্ক-চন্দ্র-মিতাঃ॥

উত্তর হইতে দক্ষিণে এবং দক্ষিণ হইতে উত্তরে গগনে বিদ্যমান ক্রান্তি চলিতে চলিতে কিঞ্চিৎ সরিয়া যাইতেছে। বিষুবদ্বৃত্ত ও ক্রান্তিবৃত্তের সম্পাতের পূর্ব্বদিকে মেষাদি এবং পশ্চিমদিকে তুলাদি রাশি ক্রান্তিবৃত্তে অবস্থিত। ক্রান্তিপাত হইতে তিন রাশি অন্তরে যথাক্রমে কর্কটাদি ও মকরাদিতে পরমক্রান্তি অবস্থিত। তাহাই অয়নসন্ধি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট এবং সেই স্থান হইতে অয়ন-চলনের আরম্ভ। এককল্পে তাহার ভগণ ১৯৯৬৬৯। এসম্বন্ধে আমরা আবার আলোচনা করিব।

২। এক্ষণে উল্লিখিত সিদ্ধান্তগ্রন্থগুলিতে অয়নাংশ-নিরূপণের মূলতত্ত্ব-সম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক।

(ক) প্রথমতঃ; সোমসিদ্ধান্ত, ব্রহ্মসিদ্ধান্ত, সূর্য্যসিদ্ধান্ত, বৃদ্ধবসিষ্ঠসিদ্ধান্ত এবং বসিষ্ঠসিদ্ধান্তের মূলতত্ত্ব একপ্রকার। আমরা দেখিতে পাই যে, (১) অয়নগ্রহ (বা ভচক্র) এক মহাযুগে ৬০০ বার পূর্ব্বদিকে চালিত (ঘূর্ণিত হয়), (২) তৎসঙ্গে ক্রান্তিপাতবিন্দু নিরয়ণবিন্দু হইতে কয়েক অংশ (৩০ বা ২৭) সরিয়া গিয়া আবার নিরয়ণবিন্দুতে আগমন করতঃ অপর দিকে ঐ কয়েক অংশ (৩০ বা ২৭) পর্য্যন্ত সরিয়া গিয়া আবার পশ্চাৎপদ হইয়া নিরয়ণ-বিন্দুর সহিত মিলিত হয়। এসম্বন্ধে আবার দুইমত দেখা যায়—(১) সোমসিদ্ধান্তের এবং (২) অন্যান্য সিদ্ধান্ত-গ্রন্থগুলির মত। (১) সোমসিদ্ধান্ত-মতে ক্রান্তিপাত-বিন্দু নিরয়ণ-বিন্দুর উভয়দিকে ৩০ অংশ পর্য্যন্ত চালিত হয় এবং অয়নগ্রহের একবার পূর্ণপরিবর্ত্তনে (৩৬০ অংশ) ক্রান্তিপাতবিন্দু মোট ৩০ × ৪ বা ১২০ অংশ গমনাগমন করে।

ধরা যাউক, নিরয়ণ-বিন্দু হইতে অয়নগ্রহ ও ক্রান্তিপাতবিন্দু চালিত হইল। অয়নগ্রহ যখন ৯০ অংশে (অর্থাৎ প্রথম পাদের শেষে) উপস্থিত হইল, তখন ক্রান্তিপাতবিন্দু নিরয়ণ-বিন্দু হইতে ৩০ অংশ সরিয়া আসিয়াছে। অয়নগ্রহ চলিতে চলিতে ১৮০ অংশে উপস্থিত হইলে, ক্রান্তিপাতবিন্দু পশ্চাৎপদ হইয়া নিরয়ণ-বিন্দুর সহিত মিলিত হইল। অয়নগ্রহ যখন ২৭০ অংশে আসিয়া পড়িল, ক্রান্তিপাতবিন্দু তখন নিরয়ণ-বিন্দুর অপরদিকে চালিত হইয়া তাহা হইতে ৩০-অংশ দূরে উপস্থিত হইল। অবশেষে যখন অয়নগ্রহ ৩৬০ অংশে অর্থাৎ আদ্য-স্থানে আসিয়া নিরয়ণ-বিন্দুর সহিত মিলিত হইল; ক্রান্তিপাতবিন্দুও পশ্চাদ্গতিতে উহাদের সহিত একত্র হইল।

সুতরাং কোন নির্দ্দিষ্ট-সংখ্যক বর্ষের অয়নাংশ নির্ণয় করিতে হইলে নিম্নলিখিত প্রণালীতে উহা সাধিত হয়। (১) অভীষ্ট-বর্ষে অয়নগ্রহের ঘূর্ণন-সংখ্যা নির্ণয় করিতে হইবে। অয়নগ্রহের পূর্ণপরিবর্ত্তনে অয়নাংশ শূন্য হয় বলিয়া পূর্ণপরিবর্ত্তনের পর যে অংশকলাদি অবশিষ্ট থাকে

তাহা হইতেই অয়নাংশ নির্ণীত হয়। এক মহাযুগে অয়নগ্রহ চলন ৬০০ বার হয়, সুতরাং ত্রৈরাশিক দ্বারা অভীষ্ট-বর্ষসংখ্যায় অয়নগ্রহ চলন নির্ণীত হয়। (২) অবশিষ্ট অংশকলাদির ভুজ-সংস্কার করিতে হইবে। এক্ষণে ইহার আবশ্যকতা দেখা যাউক। অয়নগ্রহ যখন ৯০ অংশে আসিল, ক্রান্তিপাতবিন্দু ৩০ অংশে আসিয়া পৌঁছিল। প্রথম পাদে অবস্থিতির দরুণ নিরায়ণ-বিন্দু হইতে উভয়ের দুরত্ব নির্দ্দিষ্ট হয়, সুতরাং অয়নগ্রহ যতদুর অগ্রসর হইয়াছে, তাহাই তাহার ভুজজ্যা, এস্থলে অয়নগ্রহের দুরত্ব নির্ণয় করা সহজসাধ্য। অয়নগ্রহ যখন ৯০ অংশ হইতে দ্বিতীয়পাদে গমন করিবে, তখন তাহার সঙ্গে ক্রান্তিবিন্দু পশ্চাৎপদ হইয়া নিরয়ণ-বিন্দুর দিকে অপসৃত হইতে থাকিবে, এক্ষণে নিরয়ণ-বিন্দু হইতে অয়নগ্রহের দুরত্ব (অয়নাংশসম্বন্ধে) লইতে হইলে ১৮০ অংশ হইতে তাহার স্থানের দুরত্ব পশ্চাদ্‌গণনায় তাহার ভুজজ্যা গ্রহণ করিতে হইবে, এইরূপে তৃতীয়পাদে প্রথমের মত এবং চতুর্থপাদে দ্বিতীয়ের মত ভুজজ্যা নির্ণীত হইবে। (৩) অয়নগ্রহের অবশিষ্ট অংশাদির ভুজজ্যা হইতে ত্রৈরাশিক দ্বারা অয়নাংশ নির্ণীত হইবে। কারণ, আমরা দেখিয়াছি যে, অয়নগ্রহের ৯০ অংশ গতিতে অয়নাংশের ৩০ অংশ গতি হয়।

৯০ : ৩০ : : অয়নগ্রহের অংশাদির ভুজজ্যা : অয়নাংশ।

(২) ব্রহ্মসিদ্ধান্ত, সূর্য্যসিদ্ধান্ত, বসিষ্ঠসিদ্ধান্ত ও বৃদ্ধবসিষ্ঠ-সিদ্ধান্তের মত এক প্রকার। তাহাদের মত সোমসিদ্ধান্তমতানুযায়ী, তবে এই প্রভেদ যে, তাহাদের মতে অয়নগ্রহের ৯০ অংশ চালনে ক্রান্তিপাত-বিন্দু ২৭ অংশ চালিত হয়। আধুনিক পাশ্চাত্ত্য জ্যোতিষের মতে ইহা মোটামুটি ২৬ অংশ ৩০ কলা।

(খ) দ্বিতীয়তঃ, আর্য্যভটের মত উল্লিখিত সিদ্ধান্তজ্যোতিষগ্রন্থগুলির মত হইতে কয়েক বিষয়ে ভিন্ন। (১) আমরা মহাসিদ্ধান্তে সপ্তর্ষি-ভগণের উল্লেখ দেখি। সপ্তর্ষি-নক্ষত্রপুঞ্জের ধ্রুবতারায় চতুর্দ্দিকে একবার পূর্ণ পরিবর্ত্তনকে সপ্তর্ষি-ভগণ কহে, এক কল্পে তাহা ১৫৯৯৯৯৮ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। সুতরাং আর্য্যভটের মতে ২৭০০ বৎসরে এক সপ্তর্ষি-ভগণ হয় ইহাই আধুনিক পাশ্চাত্ত্য জ্যোতিষের মতে Precessional period ; আধুনিক মতে ইহা ২৫৮৬৮ বৎসর। ইহাতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, লিপিপ্রমাদবশতঃ ২৭০০০ বৎসর ২৭০০ বৎসরে পরিণত হইয়াছে ২৭০০০ বৎসর হিসাবে ইহার বাৎসরিক গতি ৪৮ বিকলা হয়। সম্ভবতঃ ১৫৯৯৯৯৮ স্থলে ১৫৯৯৯৮ হইবে। (২) আর্য্যভটের মতে অয়নাংশ-নিরূপণ এক্ষণে আলোচনা করা যাউক। প্রথমতঃ, তাঁহার মতে অয়নগ্রহ ভগণ এককল্পে ৫৭৮১৫৯, অন্যান্য সিদ্ধান্ত-জ্যোতিষ-গ্রন্থাপেক্ষা হীনতর। দ্বিতীয়তঃ, তিনি ক্রান্তি-পাত-বিন্দুর নিরয়ণ-বিন্দুর উভয় দিকে গমনাগমন না ধরিয়া পরমক্রান্তি-বিন্দুর (Solstitial Point) নিরয়ণ-বিন্দুর উভয় পার্শ্বে গমনাগমন হইতে অয়নাংশ নিরূপণ করিয়াছেন। তৃতীয়তঃ, তাঁহার মতে অয়নগ্রহের ক্রান্তিজ্যাই অয়নাংশ বলিয়া পরিগণিত হইবে। চতুর্থতঃ, অয়নগ্রহের পূর্ণ ঘূর্ণনে পরমক্রান্তি-বিন্দু নিরয়ণ-বিন্দু হইতে ২৪ অংশ করিয়া উভয় দিকে গমনাগমন করে। যদিও তিনি তাহা স্পষ্ট করিয়া উল্লেখ করেন নাই, তথাপি তাহা সহজেই নির্ণীত হয়। অয়নগ্রহ যেমন সরিতে থাকে,

পরমক্রান্তি-বিন্দু ও নিরয়ণ-বিন্দু হইতে সরিতে থাকে। অয়নগ্রহ যখন ৯০ অংশে আসিয়া পড়ে, তখন ইহার ক্রান্তিজ্যা ২৪ অংশ, সুতরাং ইহাই অয়নাংশ। অয়নগ্রহ দ্বিতীয় পাদে উপস্থিত হইলে, অয়নগ্রহের ভুজজ্যা ক্রমশঃ কমিতে থাকিবে বলিয়া তাহার ক্রান্তিজ্যাও কমিতে থাকিবে এবং পরমক্রান্তি আবার নিরয়ণ-বিন্দুর দিকে ধাবিত হইবে। অয়নগ্রহ ১৮০ অংশে থাকিলে, পরমক্রান্তি নিরয়ণ-বিন্দুর সহিত মিলিত হইবে। অয়নগ্রহ তৃতীয় পাদে উপনীত হইলে, প্রথম পাদের ন্যায় পরমক্রান্তি নিরয়ণ-বিন্দু হইতে সরিতে থাকিবে (তবে অপর দিকে) এবং অয়নগ্রহ ২৭০ অংশে আসিলে পরমক্রান্তি নিরয়ণ-বিন্দু হইতে আবার ২৪ অংশ দূরে আসিয়া পড়িবে। অয়নগ্রহ চতুর্থ পাদে আসিলে পরমক্রান্তি-বিন্দু পশ্চাৎপদ হইয়া নিরয়ণ-বিন্দুর দিকে ধাবিত হইবে, এবং অবশেষে অয়নগ্রহ ও পরমক্রান্তি-বিন্দু নিরয়ণ-বিন্দুর সহিত মিলিত হইবে। আধুনিক পাশ্চাত্ত্য জ্যোতিষ-মতে ইহা ২৪ অংশ ৩০ কলা। পঞ্চমতঃ, অয়নগ্রহের ক্রান্তিজ্যার পরিমিত অয়নাংশ নির্দ্ধারিত হয় বলিয়া দেখা যাইতেছে যে, অয়নগ্রহের চলনের হার (rate) একরূপ হইলেও, অয়নাংশের গতির হার সমরূপ হইবে না। যেমন অয়নগ্রহ প্রতি বৎসর সমহারে চালিত হইতে থাকে, অয়নাংশের গতি কিন্তু প্রতি বৎসর বিভিন্ন হইতে থাকিবে। পর পর কয়েক বৎসরের অয়নাংশ নির্ণয় করিলেই, তাহা প্রতীয়মান হইবে।

(গ) তৃতীয়তঃ, মুঞ্জাল ও ভাস্করের অয়নাংশ একেবারে অন্যান্য গ্রন্থকারের অয়নাংশ হইতে ভিন্ন। মুঞ্জালের মতে এককল্পে ক্রান্তিপাত-ভগণ ১৯৯৬৬৯ অর্থাৎ এক ক্রান্তিপাত-ভগণে ২১৬৩৬ বৎসর লাগে এবং এক বৎসরে তাহার গতি ৫৯.৯ বিকলা। ইহা কিন্তু অয়নগ্রহ নহে—পাশ্চাত্ত্য জ্যোতিষের precessional period নহে, তাহা আর্য্যভটের মতে ২৭০০০ বৎসর। পাশ্চাত্ত্য মতে precessional period (অয়নাংশ) ২৫৮০০ বৎসর এবং বৎসরে তাহার গতি ৫০.২ বিকলা। পাশ্চাত্ত্য জ্যোতিষিগণের মতে ইহার হার ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। নিউকোম্ব সাহেবের মতে বাৎসরিক হার

= ৫০.২৫৮ বিকলা + ০.০০০ ২২২ (খ্রীষ্টাব্দ—১৯০০ খ্রীষ্টাব্দ)।

সুতরাং ভাস্করের সময় ও তাহার পূর্ব্বে ইহার বাৎসরিক গতি ৫০.২ বিকলা অপেক্ষাও কম ছিল, ২৭০০০ বৎসর হিসাবে তাহার গতি ৪৮ বিকলা হয়, সুতরাং মুঞ্জালের ক্রান্তিপাত-ভগণ precessional period বলিয়া গ্রহণ করিবার বিশেষ বাধা আছে। আমরা পরে দেখিব যে, ক্রান্তি-পাত-বিন্দু যেমন পশ্চিম দিকে চালিত হইতেছে, তৎসঙ্গে মন্দোচ্চ (aphelion) পূর্ব্বদিকে চালিত হইতেছে এবং ইহার বাৎসরিক গতি গড়ে ১১.৮ বিকলা। দুই গতি যোগ করিলে ৬২ বিকলা হয়, সুতরাং ক্রান্তিপাত-বিন্দু হইতে ধরিলে মন্দোচ্চের গতি অথবা মন্দোচ্চ হইতে ধরিলে ক্রান্তি-পাত-বিন্দুর বার্ষিক গতি মোটামুটি ১কলা হইবে এবং ইহাই মুঞ্জালের ক্রান্তিপাত-ভগণের বার্ষিক গতি বলিয়া মনে হয়। পাশ্চাত্ত্য মতে ক্রান্তিপাত-ভগণ মোটামুটি ২০৯৮৬ বৎসর। সুতরাং দেখা গেল যে, মুঞ্জালের ক্রান্তিপাত-ভগণ পাশ্চাত্ত্য জ্যোতিষের মন্দোচ্চ বিন্দু হইতে ক্রান্তিপাত-বিন্দুর রাশিচক্রে সম্পূর্ণ ভ্রমণ (অর্থাৎ মন্দোচ্চ-বিন্দু হইতে অপসৃত হইয়া তাহার সহিত পুনর্মিলন)।

৩। এক্ষণে আধুনিক পাশ্চাত্য জ্যোতিষের সাহায্যে আমাদের অয়নাংশের মূলতত্ত্ব উদ্‌ঘাটন করা যাউক। আবশ্যক বোধে অয়নাংশ-সম্বন্ধে আলোচনা করিবার পূর্ব্বে আধুনিক পাশ্চাত্য জ্যোতিষ-সম্বন্ধে কিছু সাধারণ জ্ঞাতব্য বিষয় সংক্ষেপে বর্ণিত হইল।

কৃষ্ণপক্ষে কোন মেঘশূন্য রজনীতে তারকাবলী পর্য্যবেক্ষণ করিলে, আমরা দেখিতে পাই যে, তারকাগুলি একত্রে পরস্পরের সম্বন্ধে স্থান পরিবর্ত্তন না করিয়া আকাশমার্গে পরিভ্রমণ করিতেছে তন্মধ্যে কতকগুলি পূর্ব্বদিকে উদিত হইয়া পশ্চিমে অস্ত যাইতেছে, আবার কতকগুলি ধ্রুববিন্দুর (North Pole) চারিদিকে বৃত্তাকারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে ; তাহারা প্রকৃতপক্ষে অস্তগত না হইলেও, দিবসে সূর্য্যের আলোকে অদৃশ্য থাকে। এই তারকাপুঞ্জের সম্পূর্ণ ঘূর্ণনে (অর্থাৎ একস্থান হইতে আরম্ভ করিয়া আবার সেই স্থানে আসিতে) প্রায় একদিন ও এক রাত্রি অতিবাহিত হয়। যে সময়ে কোন একটী তারকার সম্পূর্ণ ঘূর্ণন সাধিত হয়, সেই সময় নাক্ষত্র-দিন নামে অভিহিত। আমাদের ঘটিকাযন্ত্রে নির্ণীত সময় হিসাবে এক নাক্ষত্র-দিনের পরিমাণ ২৩ ঘণ্টা ৫৬ মিনিট ৪ সেকেণ্ড। গোলাকার পৃথিবীর নিজ অক্ষদণ্ডের চতুর্দ্দিকে পশ্চিম হইতে পূর্ব্বদিকে ঘূর্ণনের জন্য আমরা পৃথিবীর উপর হইতে আকাশমার্গস্থ তারকাগুলিকে পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে ঘুরিতে দেখি, বাস্তবিক তাহারা আমাদের সম্পর্কে নিশ্চল। পৃথিবীর কাল্পনিক অক্ষদণ্ড (axis of rotation) উভয়দিকে বর্দ্ধিত করিয়া দিলে, যে দুই স্থলে তাহা আকাশ-মার্গ ভেদ করিবে, তাহা উত্তর ও দক্ষিণ ধ্রুববিন্দু। আমরা পৃথিবীর উত্তর গোলার্দ্ধে বাস করি, এজন্য কেবল উত্তর ধ্রুবটী দেখিতে পাই ; যাঁহারা দক্ষিণ গোলার্দ্ধে বাস করেন, তাঁহারা দক্ষিণ ধ্রুবটী দেখিতে পান ; আর যাঁহারা বিষুবরেখার উপর বাস করেন, তাঁহারা দুইটী ধ্রুবই ক্ষিতিজ রেখায় দেখিবেন। আমরা উত্তর ধ্রুবের চারিদিকে তারকাগুলি ঘুরিতে দেখি।

পৃথিবীর তলদেশস্থ যে কোন স্থান হইতে আকাশ গোলার্দ্ধের ন্যায় দেখায় এবং পৃথিবীর ঐ স্থানটী তাহার কেন্দ্রস্বরূপ মনে করা যায়। এইরূপে আমরা পৃথিবীর চতুর্দ্দিকস্থ আকাশ একটী বৃহৎ গোলকরূপে মনে করিতে পারি এবং পৃথিবীকে তাহার কেন্দ্রস্থ বলিতে পারি। এই আকাশ-গোলকে আমরা উত্তর ও দক্ষিণ ধ্রুব (পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ মেরুর সমরেখায়) স্থির করি এবং ঐ উভয় ধ্রুবের সমদূরে আকাশমার্গে একটী বৃত্ত অঙ্কিত করা হয়, যাহার নাম বিষুবন্মণ্ডল (Equinoctial or Celestial Equator)। পৃথিবীর বিষুবদ্‌বৃত্তের সমতল আকাশমার্গে বর্দ্ধিত করিলে, তাহা বিষুবন্মণ্ডলের সহিত মিলিত হইবে। আবার দুই ধ্রুবের মধ্য দিয়া আকাশ-মার্গে উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত বহু বৃত্ত কল্পনা করা হয়, তাহাদের নাম ঘটিকা-বৃত্ত (Hour circle)। আমরা আকাশগোলকে ঐরূপ ২৪ বৃত্ত কল্পনা করি ; প্রত্যেকে এক এক ঘণ্টা অন্তরে থাকে। পৃথিবীর তলদেশস্থ কোন স্থানের যাম্যোত্তর বৃত্তের (meridian) সমতল আকাশমার্গে বর্দ্ধিত করিয়া দিলে, তাহা যে স্থলে মিলিত হইবে, তাহাও বৃত্তাকার ; এই বৃত্তের নাম আন্তরীক্ষ যাম্যোত্তর বৃত্ত (Celestial meridian)। কোন স্থানের শীর্ষদেশে যদি ঘটিকাবৃত্ত থাকে, তাহা তখন আন্তরীক্ষ যাম্যোত্তর বৃত্তের সহিত মিলিত হইয়া যায়।

এক্ষণে সূর্য্য-সম্বন্ধে কিছু জানা আবশ্যক। আমরা দেখি, সূর্য্য প্রতিদিন তারকাবলীর মত পূর্ব্বে উদিত হইয়া পশ্চিমে অস্ত যাইতেছে, আবার পরদিন প্রাতে উদিত হইতেছে। কিন্তু সূর্য্যের ও নক্ষত্রগণের গতির মধ্যে কিছু প্রভেদ আছে। আমরা যদি সন্ধ্যার পর এমন কয়েকটী তারকা দেখিয়া রাখি, যাহারা সূর্য্য অস্ত যাইবার কিছুক্ষণ পরে অস্ত যায় এবং যদি সেগুলিকে প্রতিদিন লক্ষ্য করিয়া যাই, আমরা দেখিব যে, তাহারা ক্রমশঃ আরও শীঘ্র অস্ত যাইতেছে এবং অবশেষে সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বেই অস্ত যাইতেছে এবং সন্ধ্যার সময় অদৃশ্য হইয়া যায়। কিছুকাল পর দেখিব যে, সেগুলি প্রাতঃকালে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই উদিত হইতেছে এবং নিশ্চয় সূর্য্যাস্তের বহু পূর্ব্বেই অস্ত যাইতেছে। এইরূপে ৩৬৫ দিবস গত হইলে, আমরা আবার সন্ধ্যার পর ঠিক সেই সময়ে ঐ তারকাগুলি দেখিতে পাইব। ইহাতে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, যদিও সূর্য্য ও তারকাগুলি প্রতিদিন উদিত ও অস্তমিত হইতেছে, তারকাগুলি প্রথমতঃ সূর্য্যের সহিত উদিত ও অস্তমিত হইয়া ক্রমশঃ অগ্রে উদিত ও অস্তমিত হইতে হইতে বৎসরান্তে (৩৬৫ দিনে) আবার একসঙ্গে উদিত ও অস্তমিত হয়। তারকাগুলি অগ্রগামী হয় এবং সূর্য্য পশ্চাৎপদ হইয়া পড়ে সুতরাং আমরা সূর্য্যের দ্বিবিধ গতি বলিতে পারি—(১) তারকাদিগের সহিত পূর্ব্ব-পশ্চিমে গতি (ঘূর্ণন) এবং (২) ক্রমশঃ পশ্চাৎপদ হওয়ায়, পশ্চিম হইতে পূর্ব্বদিকে আকাশমার্গ বেষ্টন করিয়া পুনরায় সেই তারকাপুঞ্জের সহিত মিলনের জন্য গতি। সূর্য্যের তারকাদের সহিত পূর্ব্ব-পশ্চিমে একদিনের গতি গড়ে ২৪ ঘণ্টায় সাধিত হয় অর্থাৎ নক্ষত্রদের তুলনায় সূর্য্যের গতিতে ৪ মিনিট সময় বেশী লাগে—অর্থাৎ সূর্য্য প্রতিদিন ৪ মিনিট করিয়া পিছাইয়া পড়িতেছে। পৃথিবীর নিজ অক্ষদণ্ডের চতুর্দ্দিকে বর্ত্তনবশতঃ আমরা তারকাপুঞ্জের ন্যায় সূর্য্যের পূর্ব্বপশ্চিমে দৈনিক গতি দেখিতে পাই; বাস্তবিক পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহ-সম্পর্কে সূর্য্য নিশ্চল। সূর্য্যের দ্বিতীয় গতির পথ অর্থাৎ সূর্য্য আকাশমার্গে যে বৃত্তাকার পথ অবলম্বন করিয়া বৎসরে একবার পশ্চাদ্‌গতিতে ঘুরিয়া আসিতেছে, সে কক্ষার নাম ক্রান্তিবৃত্ত (ecliptic)। ক্রান্তিবৃত্তের উভয় পার্শ্বে প্রায় ৮ অংশ-পরিমিত স্থানের তারকাপুঞ্জ লইয়া আমাদের রাশিচক্র। ক্রান্তিবৃত্ত ও বিষুবন্মণ্ডল সমান্তরাল নহে এবং উভয়ে দুই বিপরীত স্থানে ছেদিত হয়। এই মিলনস্থান-দ্বয়কে ক্রান্তিপাত (Equinoctial points) কহে। যে ক্রান্তিপাত হইতে সূর্য্য বিষুব-মণ্ডলের দক্ষিণ হইতে উত্তরদিকে গমন করে, তাহা মেষক্রান্তি (First point of Aries) এবং যাহা হইতে বিষুবন্মণ্ডলের উত্তর হইতে দক্ষিণে গমন করে, তাহার নাম তুলাক্রান্তি (First point of Libra)। এই দুই ক্রান্তিপাতের ব্যবধানে বিষুবন্মণ্ডল ও ক্রান্তিবৃত্তের যে স্থানদ্বয় পরস্পর হইতে সর্ব্বাপেক্ষা দূরে থাকে, তাহা পরমক্রান্তি নামে অভিহিত (Solstitial points). আমরা উত্তর গোলার্দ্ধে থাকিয়া যদি প্রতিদিন সূর্য্যের উদয় ও অস্ত-স্থান পর্য্যবেক্ষণ করিতে থাকি, দেখিতে পাইব যে, ২১এ মার্চ্চের পর (৭।৮ই চৈত্রের পর) সূর্য্য মেষক্রান্তিপাত হইতে প্রতিদিন উদিত হইবার সময় উত্তরদিকে উর্দ্ধে সরিয়া যাইতেছে এবং তিন মাসকাল এইরূপে সরিতে সরিতে পরমক্রান্তিস্থানে উপনীত হয়। সূর্য্য আবার দক্ষিণদিকে সরিয়া আসিয়া তিনমাসে তুলাক্রান্তির

উপর আসিয়া পড়ে এবং আরও দক্ষিণে নামিতে থাকিয়া, তিন মাসে অপর পরমক্রান্তি-স্থানে উপনীত হয় এবং পুনরায় উর্দ্ধে উত্থিত হইয়া বাকি তিন মাসে মেষক্রান্তিপাতে আসিয়া পড়ে। সূর্য্যের চারিদিকে পৃথিবীর নিজ কক্ষায় ভ্রমণের জন্য আমরা সূর্য্যকে পরিভ্রমণ করিতে দেখি। পৃথিবী নিজ অক্ষদণ্ডের চারিদিকে ঘুরিতে ঘুরিতে নিজ কক্ষ দিয়া যেমন পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে অগ্রসর হইতে থাকে, সূর্য্যকে আমরা বিপরীত দিকে আকাশমার্গে তারকামণ্ডলের মধ্য দিয়া পশ্চাৎপদ হইতে দেখি। পুনশ্চ পৃথিবীর বিষুবদ্‌বৃত্ত এবং তাহার কক্ষের সমতল পরস্পরকে ছেদ করে বলিয়া, ক্রান্তিপাতের সৃষ্টি হইয়াছে এবং সূর্য্যকে বিষুবন্মণ্ডলের একবার উত্তরে ও একবার দক্ষিণে যাইতে দেখি।

আকাশমার্গে কোন জ্যোতিষ্কের স্থান নির্দ্দেশ করিতে হইলে, আমরা প্রধানতঃ দুইটী পন্থা অনুসরণ করি (চিত্র ১)। প্রথমতঃ, আমরা বিষুবন্মণ্ডলের উপর তাহা নির্দ্দেশ করিতে পারি। আমরা যদি ঐ জ্যোতিষ্কের উপর দিয়া এমন একটী বৃত্তাংশ (ধনু) কল্পনা করি, যাহা ধ্রুবদ্বয়ের উপর দিয়াও গমন করিয়া বিষুবন্মণ্ডলকে ছেদ করে, তাহা হইলে, ঐ ধনু দ্বারা জ্যোতিষ্কটীর স্থান নির্দ্দেশ করিতে পারি। মেষক্রান্তি হইতে বিষুবন্মণ্ডলে ঐ ছেদস্থান পর্য্যন্ত যে ধনু থাকে, তাহাকে সরলোত্থান (Right ascension) বলে, (যেমন চিত্রে ঘক) আর ঐ ধনুর যে খণ্ড জ্যোতিষ্কটী ও বিষুবন্মণ্ডলের সহিত ছেদের মধ্যবর্ত্তী হয়, তাহা ঐ
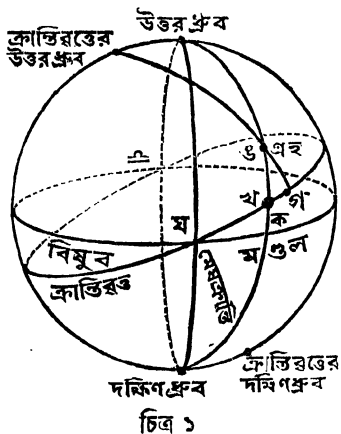
চিত্র ১

জ্যোতিষ্কটীর ক্রান্তি বা declination নামে অভিহিত (যেমন ঙক)। আমরা right-ascension এবং declinationএর দ্বারা কোন জ্যোতিষ্কের স্থান-নির্দ্দেশ করিতে পারি। দ্বিতীয়তঃ, ক্রান্তিবৃত্তের উপর আমরা কোন জ্যোতিষ্কের স্থান নির্দ্দেশ করিতে পারি। আমরা বিষুবন্মণ্ডলের ধ্রুবের ন্যায় ক্রান্তিবৃত্তের দুইটী ধ্রুববিন্দু কল্পনা করিতে পারি এবং right ascensionএর মত ক্রান্তিবৃত্তের ধনুকে Longitude (স্ফুট, যেমন ঘগ) ও declinationএর মত ধনুর খণ্ডকে latitude (যেমন ঙগ) বলিয়া অভিহিত করিতে পারি। এই দুইএর দ্বারা আমরা জ্যোতিষ্কটীর স্থান নির্দ্দেশ করিতে পারি।

আমরা ইতিপূর্ব্বে নাক্ষত্রিক দিনের কথা উল্লেখ করিয়াছি। এই সময়ে কোন একটী নক্ষত্র কোন স্থানের যাম্যোত্তর বৃত্তের উপর হইতে চলিতে আরম্ভ করিয়া আবার তাহার উপর আসিয়া পড়ে। যে সময়ে মেষক্রান্তি যাম্যোত্তর বৃত্তের উপর আসিয়া পড়ে, সেই সময় হইতে নাক্ষত্রিক দিনের আরম্ভ ধরা হয়। আমাদের সৌরমণ্ডলের (অর্থাৎ মধ্যস্থ সূর্য্য ও তাহার গ্রহ-উপগ্রহ ধরিয়া সৌরমণ্ডল) চতুর্দ্দিকে বহু দূরে তারকাগুলি বিক্ষিপ্ত, সুতরাং আমরা সহজেই বুঝিতে পারিব যে, পৃথিবীর নিজ অক্ষদণ্ডে ঘূর্ণনের জন্য ইহার তলদেশে প্রত্যেক স্থানই দিবারাত্রে (এক-

দিনে) একবার চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া আসিতেছে ; তজ্জন্য ক্রান্তিপাত এক বার যাম্যোত্তর বৃত্তের উপর দিয়া গমন করে। এক নাক্ষত্রিক দিন আমাদের সৌর দিন অপেক্ষা কম। যে সময়ে মেষক্রান্তি যাম্যোত্তর বৃত্তের উপর আসিয়া পড়ে, তখন এক নাক্ষত্রিক দিনের শেষ এবং দ্বিতীয় নাক্ষত্রিক দিনের আরম্ভ হয় বলিয়া ঘড়ী নাক্ষত্রিক দিন-পরিমাণার্থ চালিত হইলে, তাহা ঐ সময়ে শূন্য ঘণ্টা মিনিটাদি প্রদর্শন করিবে। এইরূপ ঘটিকাযন্ত্র নাক্ষত্রিক সময় নিরূপণের জন্য ব্যবহৃত হইবে। কারণ, নাক্ষত্রিক দিন আবার নাক্ষত্রিক ঘণ্টা-মিনিটাদিতে বিভক্ত করা যাইতে পারে।

এক্ষণে সৌর দিন (solar day) কাহাকে বলে, দেখা যাউক। সূর্য্য স্থানীয় যাম্যোত্তর বৃত্ত অতিক্রম করিয়া পুনরায় তাহার উপর আসিতে যে সময় লাগে, তাহাই একটী সৌর দিন। এক বৎসরে ৩৬৫·২৪২৪ অথবা ৩৬৫¼ সৌর দিন। সূর্য্যের ক্রান্তিবৃত্ত ধরিয়া আকাশমার্গে একবার ঘুরিয়া আসিতে যে সময় লাগে, তাহাই সৌর-বৎসর। সূর্য্যঘড়ি (Sundial) দ্বারা সৌরদিনের সময় নিরূপিত হয়। সৌর-দিনগুলি সব সমান নহে ; তাহার কারণ, ক্রান্তিবৃত্তে সূর্য্যের গতি সমভাব নহে, অর্থাৎ পৃথিবীর নিজকক্ষে দৈনিক গতি সমভাবে সাধিত হয় না। সৌরদিনগুলি সব অসমান হওয়ায়, সাধারণ ঘটিকা-যন্ত্রের দ্বারা তাহাদের প্রকৃত সময় নিরূপণ করা অসম্ভব। সৌরদিনগুলির পরিমাণ অসমান হওয়ায় ঐ সকল দিনের ঘণ্টা-মিনিটাদিও সব অসমান জানিতে হইবে। এ কারণ জ্যোতির্ব্বিৎ পণ্ডিতগণ একটী মধ্যসূর্য্য বা গণিতসূর্য্য কল্পনা করিয়াছেন। প্রকৃত বা প্রত্যক্ষ সূর্য্যের একবার ক্রান্তিবৃত্তে ঘুরিয়া আসিতে যে সময় লাগে (অর্থাৎ এক সৌরবর্ষে), সেই সময়ে এই কাল্পনিক সূর্য্যকে বিষুবন্মণ্ডলে একবার ঘুরিয়া আসিতে স্থির করা হয়। এই সময়কে সৌরদিন-সংখ্যা-হিসাবে বিভক্ত করিয়া এক এক ভাগকে মধ্য-সৌরদিন বলিয়া স্থির করা হয়, সুতরাং মধ্য-সৌরদিনগুলি পরিমাণে সমান বুঝিতে হইবে এবং তজ্জন্য সাধারণ ঘটিকাযন্ত্রের সাহায্যে মধ্য-সৌরদিনের সময় নিরূপিত হইয়া থাকে।

এক্ষণে দেখা গেল যে, মধ্য-সৌরদিনগুলি সব সমান, কিন্তু প্রকৃত সৌরদিনগুলি সেরূপ নহে ; তাহাদের কতকগুলি পরিমাণে বৃহত্তর, কতকগুলি ক্ষুদ্রতর। আবার কতকগুলি মধ্য-সৌরদিন অপেক্ষা বৃহত্তর, কতকগুলি সমান, আর কতকগুলি ক্ষুদ্রতর ; তবে প্রভেদ বেশী নয়। মধ্য-সৌরদিনের কোন নির্দ্দিষ্ট সময় ও প্রকৃত সৌরদিনের কোন নির্দ্দিষ্ট সময় (যেমন মধ্য-সৌরদিনের ১২ ঘটিকা ও প্রকৃত সৌরদিনের ১২ ঘটিকা), এই উভয়ের অন্তবর্ত্তী সময় (মধ্য-সৌরদিনের সময় হইতে হিসাবে) Equation of time বা সমকালপ্রভেদ নামে অভিহিত। সচরাচর আধুনিক পাশ্চাত্ত্য জ্যোতিষ ও পঞ্জিকায় মধ্যাহ্ন সময় লওয়া হয়। গণিত-সূর্য্যের মধ্যাহ্নকাল হইতে প্রত্যক্ষ সূর্য্যের মধ্যাহ্নকালের অন্তরই মধ্যাহ্নে সমকাল-প্রভেদ। যখন মধ্যসূর্য্য অগ্রগামী হয়, অর্থাৎ মধ্য-সৌরদিনের মধ্যাহ্ন প্রকৃত সৌরদিনের মধ্যাহ্নের পূর্ব্ববর্ত্তী হয়, তখন সমকালপ্রভেদ যুক্ত হইবে ; আর যদি মধ্য-সৌরদিনের মধ্যাহ্ন পশ্চাতে থাকে, তাহা হইলে সমকালপ্রভেদ বিযুক্ত হইবে। বৎসরের মধ্যে চারিবার মধ্যসূর্য্য ও প্রত্যক্ষ-সূর্য্য একস্থানে থাকে বলিয়া সমকালপ্রভেদ কিছুই থাকে না ; ৩।৪ ঠা

বৈশাখ, ১১২রা আষাঢ়, ১৬।১৭ই ভাদ্র ও ১০।১১ই পৌষ—এই চারিদিনে এইরূপ ঘটিয়া থাকে। পাশ্চাত্ত্য নাবিক-পঞ্জিকায় প্রতিদিনের সমকালপ্রভেদ হিসাব করিয়া লিপিবদ্ধ থাকায়, তাহা হইতে উভয় দিনেরই সময় হিসাব করিয়া লওয়া যায়।

এক্ষণে গণিত বা মধ্য এবং প্রত্যক্ষ সৌরদিনের প্রভেদের (অর্থাৎ সমকাল-প্রভেদের) কারণ দেখা যাউক। প্রথমতঃ ঐ প্রভেদের মূলতত্ত্ব আলোচনা করা যাউক। ইহার কারণ দুইটী। (১) পৃথিবীর কক্ষ ঠিক বৃত্তাকার নহে—তাহা বৃত্তাভাস (elliptical)। বৃত্তে একটী কেন্দ্র থাকে, কিন্তু বৃত্তাভাসে দুইটী foci বা উপকেন্দ্র থাকে। বৃত্তাভাসের এক উপকেন্দ্রে বা focusএ সূর্য্য অবস্থিত। কক্ষের যে স্থান সূর্য্যের সর্ব্বাপেক্ষা নিকটস্থ, তাহা পেরিহেলিয়ন (perihelion) নামে অভিহিত এবং যে স্থান সর্ব্বপেক্ষা দূরস্থ, তাহা আপ্‌হেলিয়ন (aphelion) বা মন্দোচ্চ নামে অভিহিত। যে রেখা পেরিহেলিয়ন হইতে আপ্‌হেলিয়ন পর্য্যন্ত বিস্তৃত, তাহাকে line of the apsides বা উচ্চরেখা কহে। (২) ক্রান্তিবৃত্ত ও বিষুবন্মণ্ডল সমান্তরাল না হইয়া কিছু তির্য্যক্‌-ভাবে থাকায়, পরস্পরে দুই বিপরীত স্থানে ছেদিত হইয়া ক্রান্তিপাতের সূচনা করিয়াছে। আমরা পৃথিবীর উপর বাস করিয়া তাহার যাম্যোত্তর রেখাগুলির (যাহারা বিষুবদ্‌বৃত্তের সমকোণে মেরুদ্বয়-মধ্যে অর্দ্ধবৃত্তাকারে বিস্তৃত) পরস্পরের দূরত্ব হইতে সময় নিরূপণ করিতে পারি এবং তজ্জন্য মধ্যসূর্য্যকে বিষুবদ্‌বৃত্তের উপর কল্পনা করিতে বাধ্য হই। এই মধ্যসূর্য্যের সহিত তুলনার জন্য ক্রান্তিবৃত্তে চালিত প্রত্যক্ষ-সূর্য্যের স্থান ক্রান্তিবৃত্ত হইতে বিষুবন্মণ্ডলে যথাযথ গ্রহণ করিয়া থাকি। ক্রান্তিবৃত্ত ও বিষুবন্মণ্ডল সমন্তরাল নয় বলিয়া প্রত্যক্ষসূর্য্য ক্রান্তিবৃত্তে যদি সমগতিতে ভ্রমণ করিত, তাহা হইলেও, বিষুবন্মণ্ডলে তাহার গতি সমভাবে হইতে পারে না, তাহার উপর আবার প্রত্যক্ষসূর্য্য নিজ কক্ষায় বিষমগতিতে ভ্রমণ করে। এই জন্য মধ্যসূর্য্য ও প্রত্যক্ষসূর্য্যে গতির প্রভেদ লক্ষিত হয়।

পৃথিবীর কক্ষের আকৃতির বৃত্তাভাসবশতঃ যে সমকালপ্রভেদ ঘটিয়া থাকে, তদ্‌বিষয়ে এক্ষণে আলোচনা করা যাউক (চিত্র ২)। ভৌতিক নিয়মাধীনে পৃথিবী যখন পেরিহেলিয়নের নিকট

চিত্র ২

আসিয়া পড়ে, তখন তাহার গতি সর্ব্বাপেক্ষা বেগশালিনী হয় এবং তজ্জন্য প্রত্যক্ষসূর্য্য যে হারে ক্রান্তিবৃত্তে পশ্চিম হইতে পূর্ব্বে (অর্থাৎ পৃথিবী পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে) গমন করিতেছে, তাহা মধ্য-সূর্য্যের গতির হার অপেক্ষা অধিকতর। নিজ অক্ষদণ্ডের চারিদিকে পৃথিবীর পশ্চিম হইতে পূর্ব্বে ঘূর্ণনবশতঃ প্রকৃত সৌরদিনগুলি মধ্য-সৌরদিন অপেক্ষা দীর্ঘতর। পেরিহেলিয়নে প্রকৃত সৌর-দিনের কোন নির্দ্দিষ্ট সময় কাল্পনিক মধ্য সৌরদিনের ঐ নির্দ্দিষ্ট সময় একসঙ্গে থাকে বলিয়া, এই সময়ে সমকালপ্রভেদ শূন্য হয়। কিন্তু পেরিহেলিয়নের পর যত দিন গত হয়, প্রত্যক্ষ-সৌরদিন-গুলি ক্রমশঃ দীর্ঘতর হইতে থাকে বলিয়া, তাহাদের কোন নির্দ্দিষ্ট সময় কাল্পনিক মধ্য-সৌরদিন-গুলি ঐ নির্দ্দিষ্ট সময়ের পশ্চাতে সরিয়া যায় এবং সমকালপ্রভেদ এখন যুক্ত হয়। তিন মাসের শেষে সমকাল প্রভেদ + ৭৪ মিনিট হয়, কিন্তু তাহার পর আবার প্রত্যক্ষ-সৌরদিনগুলি খর্ব্বতর হইতে থাকে এবং তজ্জন্য সমকালপ্রভেদও কম হইতে থাকে। তিন মাসের শেষে (অর্থাৎ পেরিহেলিয়ন হইতে ছয় মাসের শেষে) আবার ঐ দ্বিবিধ দিনগুলির পরিমাণ সমান হওয়ায়, সমকাল-প্রভেদও শূন্য হইয়া পড়ে; এই সময় পৃথিবী মন্দোচ্চে বা আপ্‌হেলিয়নে অবস্থিতি করে। পৃথিবী যেমন আপ্‌হেলিয়ন হইতে আবার কক্ষের অপরদিক্ দিয়া যাত্রা করে, তখন প্রত্যক্ষ দিন-গুলি কাল্পনিক মধ্য-দিনগুলির অগ্রগামী হওয়ায়, তাহাদের কোন নির্দ্দিষ্ট সময় মধ্য-সৌরদিনের সময়ের অগ্রে অবস্থিত করিতে থাকে; তজ্জন্য সমকাল-প্রভেদ হীন হইতে থাকে। ক্রমশঃ তিন মাসের শেষে সমকালপ্রভেদ ৭৪ মিনিট পর্য্যন্ত হইয়া আবার অবশিষ্ট তিন মাসে কম হইতে হইতে পেরিহেলিয়নএ তাহা শূন্য হইয়া পড়ে। সুতরাং দেখা গেল যে, পেরিহেলিয়ন এবং আপ্‌হেলিয়ন—এই দুই স্থানে সমকালপ্রভেদ শূন্য এবং দুইএর মধ্যস্থানে সর্ব্বাধিক প্রভেদ ৭৪ মিনিট যুক্ত বা বিযুক্ত হইয়া থাকে।

এক্ষণে ক্রান্তিবৃত্ত ও বিষুবন্মণ্ডলের পরস্পর তির্য্যগ্‌ভাবে অবস্থানবশতঃ সমকালপ্রভেদের আলোচনা করা যাউক। ১ম ও ৩য় চিত্র দ্বারা বিষয়টী স্পষ্টীকৃত হইবে। মেষক্রান্তি হইতে
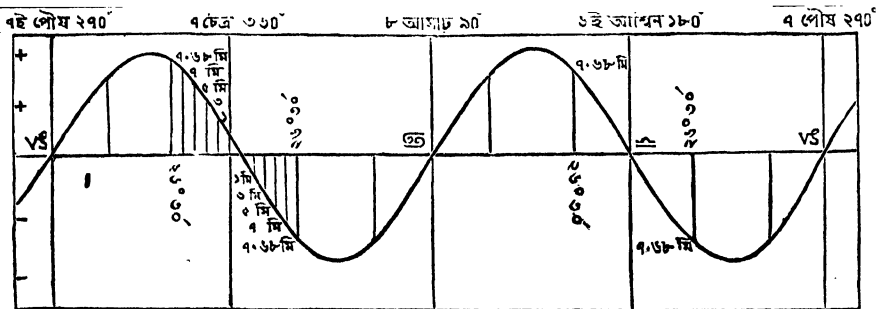
চিত্র ৩

প্রত্যক্ষ ও কাল্পনিক মধ্যসূর্য্যের গতি ধরা হউক। প্রত্যক্ষসূর্য্য ক্রান্তিবৃত্তে ও কাল্পনিক মধ্যসূর্য্য বিষুবন্মণ্ডলে গমন করিতেছে। দুই ক্রান্তিপাতস্থানে ও দুই পরমক্রান্তি-স্থানে সমকালপ্রভেদ

সমান হইবে। কারণ, এই চারি স্থানে তাহাদের সরলোত্থান (right ascension) সমান হইয়া থাকে। অন্য স্থানে উভয়ের সরলোত্থান সমান হয় না। মেষক্রান্তি হইতে আরম্ভ করিয়া প্রকৃত-সৌরদিনগুলি কাল্পনিক মধ্যসৌরদিনের অগ্রগামী হওয়ায়, সমকালপ্রভেদ বিযুক্ত হইবে এবং দেড়মাসে প্রভেদ সর্ব্বাধিক হইয়া (−১০ মিনিট) অবশিষ্ট দেড়মাসে আবার শূন্য হইয়া যায়। তৎপরে দেড়মাসে সমকালপ্রভেদ +১০ মিনিট হইয়া আবার কমিতে থাকিয়া শূন্য হইয়া পড়ে, এক্ষণে সূর্য্যদয় তুলাক্রান্তিতে উপস্থিত হয়। এইরূপে পুনর্ব্বার সমকালপ্রভেদ প্রথমে −১০ মিনিট এবং শূন্য হইয়া আবার+ ১০ মিনিট হইবার পর সূর্য্যদয় মেষক্রান্তিতে উপস্থিত হয়।

আমরা দ্বিবিধ কারণবশতঃ সমকালপ্রভেদ বিভিন্নভাবে আলোচনা করিলাম। কিন্তু আমরা যাহা প্রকৃতপক্ষে দেখিতে পাই, তাহা এই দুই প্রকার সমকালভেদের মিলন-ফল।

পৃথিবীর কক্ষের বৃত্তাভাসবশতঃ প্রকৃত-সৌরদিন ও মধ্যসৌরদিনের কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ের প্রভেদ (অর্থাৎ সমকাল) প্রভেদ ৭½ মিনিটের অধিক হয় না—

মধ্যসৌরসময়—প্রকৃত সৌরসময় = +৭½ মিনিট।

প্রকৃত সৌর সময়—মধ্য সৌর সময় = −৭½ মিনিট।

ক্রান্তিবৃত্তের তির্য্যগ্‌ভাবে স্থিতির কারণ সমকালপ্রভেদ ১০ মিনিট পর্য্যন্ত হইতে পারে—

মধ্য সৌরসময়—প্রকৃতসৌরসময় = +১০ মিনিট।

প্রকৃত সৌরসময়—মধ্য সৌর সময় = −১০ মিনিট।

এক্ষণে দেখা যাউক, দুই কারণবশতঃ সমকালপ্রভেদ একত্র করিলে, কোন কোন সময়ে তাহা শূন্য হইবে। প্রথমতঃ যদি উভয় কারণেই এক সময়ে সমকালপ্রভেদ শূন্য হয়, তাহা হইলে সমকাল ভেদের মিলনফল শূন্য হইবে। দ্বিতীয়তঃ, যদি প্রথম কারণবশতঃ সমকাল-প্রভেদ +৭½ মিনিট হয় এবং দ্বিতীয় কারণবশতঃ−৭½ মিনিট হয়, তাহা হইলে একত্রিত সমকালপ্রভেদ শূন্য হইবে। বিষুবন্মণ্ডলের মেষক্রান্তির নিকটস্থ যে স্থানে সমকালপ্রভেদ শূন্য হয়, তাহাই প্রাচীন হিন্দু জ্যোতির্ব্বিদগণ নিরয়ণ-বিন্দু বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। * শূন্য সমকালপ্রভেদ বৎসরে চারিবার ঘটিয়া থাকে—দুই ক্রান্তিপাত-বিন্দু ও দুই পরমক্রান্তির সন্নিকটে। আমরা পরে দেখিব যে, ক্রান্তিবিন্দুদ্বয় নিরয়ণ-বিন্দু হইতে ২৬ অংশ ৩০ কলা পর্য্যন্ত দুই দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে, প্রাচীন হিন্দু জ্যোতির্বিদগণ তাহা ৩০ অংশ বা ২৭ অংশ বলিয়া ধরিয়া গিয়াছেন। অপর নিরয়ণ-বিন্দুদ্বয় পরমক্রান্তির দুই পার্শ্বে ২৪ অংশ ৩০ কলা পর্য্যন্ত বিক্ষিপ্ত হইতে পারে। আর্য্যভট তাহা ২৪ অংশ ধরিয়া গিয়াছেন।

---

* সাধারণতঃ আমরা "নিরয়ণ-বিন্দু" রেবতী নক্ষত্রে স্থিত বলিয়া মনে করি। সূর্য্যসিদ্ধান্তে "পৌষ্ণান্তে-ভগণঃ স্মৃতঃ" এই পদের অর্থ "পৌষ্ণস্ত রেবতীযোগতারায়া অন্তে নিকটে প্রদেশে" রঙ্গনাথের টীকায় পাওয়া যায় বলিয়া এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে আমরা সূর্য্যসিদ্ধান্তের শ্লোকের অর্থ "সূর্য্যের নিকটে" করিলে বুঝিতে পারিব, ইহা পৃথিবীর কক্ষের 'পেরিহেলিয়ান ও সূর্য্যের দিক্ হইতে আপ্‌হেলিয়ান-স্থানে অবস্থিত এবং যখন গণনা আরম্ভ হইয়াছিল, সে সময়ে তাহা রেবতী নক্ষত্রের সঙ্গে মিলিত ছিল। (পরিশিষ্ট দেখুন)।

আমরা এক্ষণে নিরয়ণ-বিন্দু হইতে ক্রান্তিপাতদ্বয়ের উভয় দিকে ২৬ অংশ ৩০ কলা পর্য্যন্ত বিক্ষেপের কারণ নিদর্শন করিতে চেষ্টা করিব। আমরা দেখিয়াছি যে, পৃথিবীর কক্ষের বৃত্তাভাস-বশতঃ এবং বিষুবন্মণ্ডলের সহিত ক্রান্তিবৃত্তের বক্রভাবে স্থিতির দরুণ সমকালপ্রভেদ ঘটিয়া থাকে। যদি পৃথিবীর কক্ষ (অর্থাৎ ক্রান্তিবৃত্ত) এবং ক্রান্তিপাতদ্বয় চিরকাল নিশ্চল হইয়া একস্থানে অবস্থিতি করিত, তাহা হইলে সমকালপ্রভেদ এক সময়ে একপ্রকার হইত—ক্রমশঃ পরিবর্ত্তন হইত না। কিন্তু দুই কারণে বৎসরের পর বৎসর সমকালপ্রভেদের সময় পরিবর্ত্তন হইতেছে এবং তজ্জন্য ক্রান্তিপাতবিন্দু ও নিরয়ণ-বিন্দু—এই উভয়ের পরস্পরের দূরত্বেরও পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। প্রথমতঃ পৃথিবীর বৃত্তাভাসকক্ষ অতি ধীরে ধীরে ঘূর্ণিত হইতেছে, ইহাকে আমরা পেরিহেলিয়নের গতি বলি। সুতরাং পেরিহেলিয়ন ও আপ্‌হেলিয়ন একস্থানে নির্দ্দিষ্ট না থাকায়, সমকালপ্রভেদের সময়ও ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত হইতেছে। দ্বিতীয়তঃ, বিষুবন্মণ্ডলের বিপরীত-ঘূর্ণনে ক্রান্তিপাতদ্বয় কক্ষ-বর্ত্তনের বিপরীত দিকে অপসরিত হইতেছে এবং তজ্জন্যও সমকালপ্রভেদের সময় পরিবর্ত্তিত হইতেছে। মোট সমকাল প্রভেদের সময় এই দুই পরিবর্ত্তনের জন্য প্রতি বৎসর অতি অল্পপরিমাণে পরিবর্ত্তিত হইতেছে।

উপরোক্ত দুইটী পরিবর্ত্তনের উপর আরও দুইটী পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয়, তদ্দ্বারাও সমকাল-প্রভেদের এত অল্পপরিমাণ বিভিন্নতা লক্ষিত হয় যে, তাহা গণ্য না করিলে বিশেষ কোন ক্ষতি হয় না। প্রথমতঃ বৃত্তাভাস কক্ষের আকার অতি ধীরে ধীরে পরিবর্ত্তিত হইতেছে, কিন্তু ইহা এত অল্প যে, বহুবৎসর পর্য্যন্ত তজ্জন্য গণনার কিছু ক্ষতি হয় না। তবে সোমসিদ্ধান্তে যে অয়নাংশের গতি ৩০ অংশ, পরে ব্রহ্মসিদ্ধান্তাদিতে ২৭ অংশ এবং আধুনিক হিসাবে ২৬ অংশ ৩০ কলা—এই যে পার্থক্য হিন্দুগণের স্থূল গণনার উপর সমুদায় নির্ভর না করিয়া, অন্ততঃ কিছুও কক্ষের আকৃতির পরিবর্ত্তনের উপর নির্ভর করিয়াছে বলিয়া মনে হয়। দ্বিতীয়তঃ ক্রান্তিবৃত্ত এবং বিষুবন্মণ্ডলের সম্পাতে যে কোণ হয় (যাহাকে আমরা পরমক্রান্তি বলি) তাহা অতি ধীরে ধীরে পরিবর্ত্তিত হইতেছে। ইহা উপস্থিত বৎসরে প্রায় অর্দ্ধ বিকলা করিয়া কমিয়া আসিতেছে। ইহা দ্বারাও সমকালপ্রভেদের বিশেষ পরিবর্ত্তন ঘটে না।

পেরিহেলিয়ন ও ক্রান্তিপাতবিন্দুর বিপরীত দিকে ঘূর্ণনের জন্য ক্রান্তিবিন্দু ও নিরয়ণ-বিন্দুর মধ্যস্থ দূরত্ব ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে। অনুমান ৪০০০ খৃষ্টপূর্ব্বে আপ্‌হেলিয়ন ও মেষ-ক্রান্তি নিরয়ণবিন্দুর সহিত একস্থানে অবস্থিত ছিল। তদবধি আপ্‌হেলিয়ন কক্ষের ঘূর্ণনবশতঃ প্রতিবৎসর ১১·৮ বিকলা করিয়া পূর্ব্বদিকে সরিয়া যাইতেছে এবং মেষক্রান্তি প্রতি বৎসর ৫০·২ বিকলা করিয়া পশ্চিমদিকে সরিয়া যাইতেছে, কাজেই আপ্‌হেলিয়ন হইতে মেষক্রান্তির দূরত্ব প্রতিবৎসর ১১·৮+৫০·২ অথবা ৬২ বিকলা করিয়া বৃদ্ধি পাইতেছে; এ কারণ সমকালপ্রভেদ প্রতিবৎসর পরিবর্ত্তিত হইতেছে এবং নিরয়ণ-বিন্দুর স্থানও পরিবর্ত্তিত হইতে বাধ্য হইতেছে। ক্রান্তিপাত ও আপ্‌হেলিয়নের বিপরীত বর্ত্তনে নিরয়ণ-বিন্দু উভয়ের মধ্যে আসিয়া পড়ে এবং ক্রান্তিপাত হইতে পূর্ব্বে অপসারিত হইতে থাকে। পৃথিবীর কক্ষের বৃত্তাভাসবশতঃ সমকালপ্রভেদ

৭৪ মিনিট হইয়া থাকে এবং ইহা পেরিহেলিয়নের ৯০ অংশ (সুক্ষ্মরূপে ৮৮ অংশ ৫০ কলা) দূরে অবস্থিত এবং একদিকে যুক্ত ও অপরদিকে বিযুক্ত (অথবা আপহেলিয়ন হইতে ৯০ অংশ, একদিকে বিযুক্ত ও অপরদিকে যুক্ত)। সুতরাং যদি ক্রান্তিবৃত্তের তির্য্যগ্ভাববশতঃ সমকাল-প্রভেদ ঐ স্থানে ৭৪ মিনিট হয় এবং যুক্ত স্থানে বিযুক্ত ও বিযুক্ত স্থানে যুক্ত হয়, তাহা হইলে বিষুবমণ্ডলের ঐ স্থানে মিলিত সমকালপ্রভেদ শূন্য হইবে এবং তথায় নিরয়ণ-বিন্দুর অবস্থিতি হইবে। এইরূপ হইতে গেলে ক্রান্তিপাতবিন্দুকে আদ্য-স্থান হইতে ২৭ অংশ (২৬ অংশ ৩০ কলা) পশ্চিমে সরিয়া যাইতে হইবে। এক্ষণে আপ্হেলিয়ন মেষক্রান্তি হইতে ৯০+২৭ বা ১১৭ অংশ দূরে যাইয়া পড়িবে। কিন্তু ক্রান্তিবৃত্তের উপর তাহার স্থান ১২০ অংশ দূরে হইবে। আপ্হেলিয়ন মেষক্রান্তিপাত হইতে আরও অগ্রসর হইতে থাকিলে, নিরয়ণ-বিন্দু ক্রান্তিপাতের দিকে ধাবিত হইবে। যখন আপ্হেলিয়ন মেষক্রান্তি হইতে ১২০+৬০ বা ১৮০ অংশ দূরে যাইবে এবং পেরিহেলিয়ন মেষক্রান্তির উপর আসিয়া পড়িবে, তখন নিরয়ণ-বিন্দুও উহাদের সহিত মিলিত হইয়া যাইবে। আপ্হেলিয়ন আরও চলিতে চলিতে যখন মেষক্রান্তি হইতে ১৮০+৬০ বা ২৪০ অংশে (পেরিহেলিয়ন ৬০ অংশে) আসিয়া পড়িবে, তখন নিরয়ণ-বিন্দু মেষক্রান্তিপাতের অপরদিকে ২৭ অংশ দূরে আসিয়া উপস্থিত হইবে। অবশেষে যখন আপ্হেলিয়ন সরিতে সরিতে ২২০+১৪০ বা ৩৬০ অংশে উপনীত হইবে, নিরয়ণ-বিন্দুও আবার প্রত্যাবর্ত্তন করতঃ আপ্হেলি-য়নের সহিত মেষক্রান্তিতে আসিয়া উপস্থিত হইবে। আমরা যদি নিরয়ণ-বিন্দুকে স্থির ও নিশ্চল ধরি, তাহা হইলে ক্রান্তিপাতবিন্দুকে নিরয়ণ-বিন্দুর পূর্ব্বপশ্চিমে ২৭ অংশ পর্য্যন্ত গমনাগমন ধরিতে পারি। এইরূপে আমরা মেষক্রান্তি ও তুলাক্রান্তি—উভয়কেই নিরয়ণ-বিন্দুর পূর্ব্বপশ্চিমে ২৭ অংশ পর্য্যন্ত গমনাগমন ধরিতে পারি। পরমক্রান্তিদ্বয়কে ঐ রূপে ২৪ অংশ ৩০ কলা পর্য্যন্ত গমনাগমন করিতে দেখা যায়। দুইখানি অভ্রপট্টে অথবা সেলিউলয়েড্ পট্টে দ্বিবিধ সমকাল-প্রভেদ (চিত্রানুরূপ) পৃথক্ পৃথক্ অঙ্কিত করতঃ দুইটী পট্টকে বৃত্তাকারে বন্ধন করিয়া একটী অপরটীর ভিতরে রাখিয়া বিপরীত দিকে ঘুরাইলে মিলিত সমকালপ্রভেদ শূন্যের স্থান অর্থাৎ নিরয়ণ-বিন্দুর স্থান স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে। গোলত্রিকোণমিতির সাহায্যেও বিষয়টী প্রমাণ করা যায়, তাহা অনাবশ্যক ও অপেক্ষাকৃত কঠিনবোধে পরিত্যক্ত হইল।

এক্ষণে ক্রান্তিপাতের নিরয়ণ-বিন্দু হইতে অপসৃত হইয়া ২৭ অংশ দূরে গমন করতঃ পুনর্ব্বার তাহার সহিত মিলিত হইয়া, অপর দিকে ২৭ অংশ যাইতে কত সময় অতিবাহিত হয়, তাহার আলোচনা করা যাউক।

আমরা দেখিয়াছি—

(১) মেষক্রান্তিপাত হইতে আপহেলিয়নের ১১৭ অংশ (১২০ অংশ) গমনে নিরয়ণ-বিন্দু মধ্যস্থ হইয়া মেষক্রান্তিপাত হইতে ২৭ (৩০ অংশ) সরিয়া আসে। নিরয়ণ-বিন্দু হইতে ধরিলে এক দিকে আপ্হেলিয়ন ৯০ অংশ দূরে এবং অপরদিকে মেষক্রান্তি ২৭ অংশ দূরে অবস্থিত থাকে।

আপহেলিয়ন—৯০ অংশ—নিরয়ণ-বিন্দু—২৭ অংশ—মেষক্রান্তি···(ক)

(২) মেষক্রান্তি-পাত হইতে আপ্‌হেলিয়ন আরও ৬০ অংশ দূরে চালিত হইলে, অর্থাৎ মোট ১২০+৬০ বা ১৮০ অংশ অপসৃত হইলে নিরয়ণ-বিন্দু মেষক্রান্তি-পাতের উপর আসিয়া পড়ে। তখন নিরয়ণ-বিন্দু হইতেও আপ্‌হেলিয়ন ১৮০ অংশ দূরে থাকে (২৭ কে মোটামুটি ৩০ ধরা হইল)

আপ্‌হেলিয়ন—৬০+৯০+২৭ অংশ— { মেষক্রান্তি / নিরয়ণ বিন্দু } ···(খ)

(৩) মেষক্রান্তিপাত হইতে আপ্‌হেলিয়ন আরও ৬০ অংশ সরিয়া গেলে অর্থাৎ মোট ১২০+৬০+৬০ বা ২৪০ অংশ সরিয়া গেলে, নিরয়ণ-বিন্দু ক্রান্তিপাতের অপরদিকে ২৭ অংশ সরিয়া যাইবে। নিরয়ণ-বিন্দু হইতে ধরিলে আপ্‌হেলিয়ন ২৪০+৩০ =২৭০ অংশে দূরে থাকিবে।

আপ্‌হেলিয়ন—৬০+৬০+৯০—মেষক্রান্তি—২৭ (৩০)···(গ)

(৪) অবশেষে মেষক্রান্তিপাত হইতে আপ্‌হেলিয়ন আরও ১২০ অংশ, অর্থাৎ মোট ১২০ ৬০+৬০+১২০ বা ৩৬০ অংশ সরিয়া গেলে (অর্থাৎ পুনরায় মেষক্রান্তির সহিত মিলিত হইলে), নিরয়ণবিন্দুও পশ্চাৎপদ হইয়া তাহাদের সহিত মিলিত হইবে।

আপ্‌হেলিয়ন
নিরয়ণ-বিন্দু } ···(ঘ)
মেষক্রান্তি

আমরা আপ্‌হেলিয়ন, নিরয়ণ-বিন্দু এবং মেষক্রান্তিপাতবিন্দুর চতুর্বিধ সম্পর্ক (ক-ঘ) দেখিলাম। এক্ষণে তাহাদের ব্যবধানে যে সময় অতিবাহিত হয়, তাহার আলোচনা করা যাউক। বলিয়া রাখিতে হইবে যে, এত প্রাচীন কালের হিসাব মোটামুটি ভিন্ন হইতে পারে না, সুতরাং গণনা সবই স্থূল বলিয়া ধরিতে হইবে। এমন কি, আধুনিক পাশ্চাত্য জ্যোতিষের মতেও এত অধিক বর্ষের গণনা সূক্ষ্ম হইতে পারে না। আমরা দেখিলাম যে, প্রতি বর্ষে আপ্‌হেলিয়ন ক্রান্তিপাত হইতে ৬২ বিকলা (৬১·৯) করিয়া সরিয়া যাইতেছে; উপস্থিত তাহা মোটামুটি এক কলা বলিয়া ধরা যাইবে।

আদ্য-কাল এবং প্রথম সম্পর্কের (ক) ব্যবধান আপ্‌হেলিয়নের গতি ১২০ অংশ হওয়ায় ১২০×৬০÷১=৭২০০ বৎসর। তদ্রূপ প্রথম (ক) এবং দ্বিতীয় সম্পর্কের (খ) ব্যবধানে ৬০×৬০÷১=৩৬০০ বৎসর অতিবাহিত হইবে। দ্বিতীয় (খ) এবং তৃতীয় (গ) সম্পর্কের ব্যবধানে ৬০×৬০÷১=৩৬০০ বৎসর অতিবাহিত হইবে। অবশেষে তৃতীয় (গ) এবং এক চতুর্থ সম্পর্কের (ঘ) ব্যবধান ১২০×৬০÷১=৭২০০ বৎসর হইবে। সর্ব্বসুদ্ধ ২১৬০০ বৎসর হইবে। সুতরাং ক্রান্তি-বিন্দু হইতে আরম্ভ করিয়া আপ্‌হেলিয়নের এক সম্পূর্ণ ঘূর্ণন দ্বারা তাহার সহিত পুনর্মিলনে ২১৬০০ বৎসর অতিবাহিত হইবে। তাহা হইলে এক মহাযুগে আপ্‌হেলিয়ন বা পেরিহেলিয়নের গতি [illegible] বা ২০০ বার সাধিত হয়। ২১৬০০ বৎসর মোট

হিসাব বলিয়া ধরিতে হইবে; আধুনিক মতে সূক্ষ্ম গণনায় ২০৯৮৬ বৎসর হয়। মুঞ্জাল ও ভাস্করের অয়নচলন এই আপ্‌হেলিয়নের গতি, তাঁহাদের মতে ইহার এক পূর্ণঘূর্ণনে ২১৬৩৬ বৎসর অতিবাহিত হয়। তাঁহারা ক্রান্তিপাতকে আপ্‌হেলিয়নের স্থান হইতে চালিত বলিয়া ধরেন।

৪। এক্ষণে প্রাচীন সিদ্ধান্তগ্রন্থে উল্লিখিত অয়নাংশ-নিরূপণের মূলতত্ত্ব পাশ্চাত্ত্য জ্যোতিষের তুলনায় আলোচনা করা যাউক।

আমরা আপ্‌হেলিয়নের এক সম্পূর্ণ ঘূর্ণনের সময় ২১৬০০ বৎসর দেখিয়াছি এবং ঐ সময়ে অয়নাংশের নিরয়ণ-বিন্দুর উভয় পার্শ্বে ২৭ অংশ পর্য্যন্ত গমনাগমন দেখিয়াছি। আপ্‌হেলিয়ন এক যুগে ২০০ বার ঘূর্ণিত হয়, তাহাও জানিয়াছি।

সিদ্ধান্ত-জ্যোতিষগুলির মতে এক যুগে চক্রের বা অয়নগ্রহের পূর্ব্বদিকে ৬০০ বার গতি লিখিত হইয়াছে এবং ৯০ অংশ অয়ন-গ্রহের গতিতে ২৭ অংশ (বা ৩০ অংশ) অয়নাংশের গতি হয়। আমরা পাশ্চাত্ত্য জ্যোতিষের মতে এই অয়নাংশের সম্পূর্ণ গমনাগমন তিন ভাগে বিভক্ত করিতে পারি—(১) ৭২০০ বৎসরে নিরয়ণ-বিন্দু হইতে পূর্ব্বদিকে ২৭ অংশ গমন; (২) পূর্ব্বদিক্ হইতে নিরয়ণ-বিন্দু অতিক্রম করিয়া পশ্চিমদিকে ২৭ অংশ গমন; ইহাতে ৩৬০০+৩৬০০ বা ৭২০০ বৎসর লাগে; (৩) পূর্ব্বদিকে আবার ঐ ২৭ অংশ গমন করিয়া নিরয়ণ-বিন্দুর সহিত মিলন; ইহাতে ৭২০০ বৎসর লাগিবে। এই হিসাবে অয়নগ্রহের গতিও তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়—(১) ৯০ অংশ, (২) ৯০+৯০ বা ১৮০ অংশ; (৩) ৯০ অংশ। এই তিন গতির সমষ্টি ৩৬০ অংশ। সুতরাং অয়নগ্রহের পূর্ব্বগতি (নিরয়ণ-বিন্দু হইতে পূর্ব্বদিকে গমন—ইহাই সিদ্ধান্তগ্রন্থগুলিতে স্পষ্ট করিয়া লিখিত আছে) অর্থাৎ ইহার গতিসমষ্টির $\frac{1}{3}$ ভাগ যদি এক যুগে ৬০০ বার সাধিত হয়, তবে তাহার সম্পূর্ণ গতি (৩৬০ অংশ ব্যাপিয়া) এক যুগে $\frac{1}{3}\times$ ৬০০ বা ২০০ বার সাধিত হইবে। সুতরাং আমরা এক সম্পূর্ণ অয়নগ্রহের ঘূর্ণন একযুগে ২০০ বার ধরিতে পারি এবং অয়নগ্রহকে আপ্‌হেলিয়ন বা পেরিহেলিয়নের গতির সহিত তুলনা করা যাইতে পারে, তবে তাহার গতি ক্রান্তিপাতবিন্দু হইতে না ধরিয়া নিরয়ণ-বিন্দু হইতে ধরিতে হইবে। অয়নগ্রহের গতি এইরূপে একযুগে ৬০০ বার সাধিত হইলে, অয়নাংশের গতিও ঐ সময়ে ৬০০ বার সাধিত হইবে। অয়নগ্রহের এক পূর্ণাবর্ত্তনে অয়নাংশ শূন্য হয়, এজন্য কোন অভীষ্ট বর্ষ-সংখ্যার অয়নাংশ-নিরূপণে অগ্রে অয়নগ্রহের পূর্ণাবর্ত্তনের পর অবশিষ্ট অংশ-কলাদি হইতেই অয়নাংশ নির্দ্ধারিত হইবে। তাহা ত্রৈরাশিক সাহায্যে অনায়াসেই নিরূপিত হইবে।

এক যুগের দিনসংখ্যা : অভীষ্ট বর্ষের দিনসংখ্যা : : ৬০০ : অভীষ্ট বর্ষের দিন-সংখ্যার অয়ন-গ্রহের গতি। গতিতে যে ভগাংশ থাকিবে, তাহাই অংশ-কলাদিতে পরিণত করিলে অবশিষ্ট অংশ-কলাদি হইবে।

অয়নাংশ নিরয়ণ-বিন্দুর পূর্ব্বপশ্চিমে গণনা করা হয় বলিয়া অয়নগ্রহের পূর্ণগতির পর অবশিষ্ট অংশ-কলাদি নিরয়ণ-বিন্দু হইতে নিরূপিত হওয়া আবশ্যক; তজ্জন্যই তাহাদের ভুজ-সংস্কারের আবশ্যকতা। এই বিষয় পূর্ব্বেই আলোচিত হইয়াছে।

অয়নগ্রহের অংশ-কলাদির ভুজজ্যা হইতে অয়নাংশ নিরূপিত হইবে। আমরা জানি যে, অয়নগ্রহের ভুজজ্যা ৯০ অংশ হইলে অয়নাংশ নিরয়ণ-বিন্দু হইতে ২৭ অংশ (সোমসিদ্ধান্তমতে ৩০ অংশ) দূরে থাকিবে। এক্ষণে ত্রৈরাশিক-সাহায্যে অয়নাংশ নিরূপিত হইবে।

৯০ : অয়নগ্রহের অংশকলাদির ভুজজ্যা : : ২৭ : অয়নাংশ

৫। অবশেষে পাশ্চাত্ত্য জ্যোতিষের মতে বিশুদ্ধরূপে অয়নাংশ নিরূপণের প্রণালী আলোচনা করা যাউক।

আমরা জানিয়াছি যে, মধ্যসূর্য্যকে বিষুবন্মণ্ডলে ঘূর্ণিত বলিয়া কল্পনা করা হয়। প্রত্যক্ষসূর্য্য ক্রান্তিবৃত্তে পরিভ্রমণ করে। সমকাল প্রভেদ নির্ণয় করিবার জন্য প্রত্যক্ষসূর্য্যের গতি বিষুবন্মণ্ডলে নির্দ্ধারিত করা আবশ্যক এবং সম্ভবপর, তবে নির্দ্দিষ্ট স্থানের কিছু প্রভেদ লক্ষিত হয়; যেমন, ক্রান্তিবৃত্তে সূর্য্যের স্থান অর্থাৎ সূর্য্যের দ্রাঘিমা (লঙ্গিটিউড্—longitude) ১২০ অংশ হইলে বিষুবন্মণ্ডলে সূর্য্যের স্থান অর্থাৎ সূর্য্যের সরলোত্থান (রাইট্-আসেন্সান্—Right ascension) ১১৭ অংশ। এস্থলে বলিয়া রাখা উচিত যে, সূর্য্যের স্থান উভয় বৃত্তেই মেষক্রান্তি হইতে গণিত হয়। কারণ, তাহা হইলে প্রত্যক্ষ ও মধ্যসূর্য্যের গতি একস্থান হইতে আরম্ভ ধরা যাইবে। মিলিত সমকালপ্রভেদ শূন্য হইলে (অর্থাৎ নিরয়ণ-বিন্দুতে) বিষুবন্মণ্ডলে চালিত মধ্যসূর্য্য এবং তাহাতে নির্দ্ধারিত প্রত্যক্ষসূর্য্য একসঙ্গে মিলিত হয়। নিরয়ণ-বিন্দু হইতে আপ্হেলিয়ন ৯০ অংশ দূরে থাকিলে মেষক্রান্তিপাত অপরদিকে ২৭ অংশ দূরে থাকে এবং তখন অয়নাংশ ২৭ অংশ বলিয়া গৃহীত হয়। কাজেই মেষক্রান্তি হইতে তন্নিকটস্থ নিরয়ণ-বিন্দুর দূরত্ব (ঐরূপে তুলাক্রান্তি হইতে তন্নিকটস্থ নিরয়ণ-বিন্দুর দূরত্ব) অয়নাংশ বলিয়া পরিগণিত। যে সময়ে সমকালপ্রভেদ শূন্য হইবে, সেই সময়ে প্রত্যক্ষসূর্য্যের বিষুবন্মণ্ডলে নির্দ্ধারিত স্থানের নিকটস্থ ক্রান্তিপাত (মেষ বা তুলাক্রান্তি) হইতে দূরত্বই অয়নাংশ হইবে। অর্থাৎ নিকটস্থ ক্রান্তিপাতবিন্দু হইতে গণিত নিরয়ণ-বিন্দুতে প্রত্যক্ষসূর্য্যের দ্রাঘিমা বা সরলোত্থানই অয়নাংশ বলিয়া গৃহীত হইবে।

যখন মেষক্রান্তিতে সমকালপ্রভেদ বিযুক্ত হইবে, তখন মেষক্রান্তি নিরয়ণ-বিন্দুর পূর্ব্বে থাকিবে, যখন যুক্ত হইবে, তখন মেষক্রান্তি নিরয়ণ-বিন্দুর পশ্চিমে থাকিবে। নিরয়ণ-বিন্দু মেষক্রান্তির পূর্ব্বে অয়নাংশযুক্ত এবং পশ্চিমে থাকিলে অয়নাংশবিযুক্ত হইবে। ইহাও সিদ্ধান্তগ্রন্থে উল্লিখিত আছে।

এক্ষণে নাবিকপঞ্জিকার সাহায্যে অয়নাংশ কিরূপে সূক্ষ্মভাবে গণিত হইতে পারে, দেখা যাউক।

১৮৪৪ শকাব্দের ১লা বৈশাখের (আদিতে) অয়নাংশ নিরূপণ করা যাউক। প্রথমতঃ, ১৮৪৪ শকাব্দের আদি ইংরাজি সনের কত তারিখ, তাহা নিরূপণ করিতে হইবে। কেবল ইংরাজি সন জানিলেই চলিতে পারে; কারণ, ইংরাজি সনের প্রথম যে দিন সমকালপ্রভেদ শূন্য হইবে, সেই দিনেই নিরয়ণ-বিন্দুর মেষক্রান্তির নিকট স্থিতি বলিয়া ধরিতে হইবে। ১৮৪৪ শকাব্দা ইংরাজি ১৯২২ সনের সম বলিয়া, আমরা ঐ সনের নাবিকপঞ্জিকা হইতে মেষক্রান্তির নিকটস্থ নিরয়ণ-বিন্দুর স্থিতিকাল ১৫।১৬ এপ্রিলের মধ্যে পড়িয়াছে জানিতে পারিব। দ্বিতীয়তঃ, এই দুই দিনের

মধ্যে কোন সময় সমকালপ্রভেদ শূন্য হইয়াছে, তাহা নির্ণয় করা আবশ্যক। তৃতীয়তঃ ঐ সময়ের সূর্য্যস্ফুট নাবিকপঞ্জিকা হইতে নির্ণয় করিয়া যাহা হইবে, তাহাই বিশুদ্ধ অয়নাংশ হইবে।

নিরয়ণ-বিন্দুর স্থিতিকাল অথবা সমকালপ্রভেদ শূন্য হইবার সময় নিরূপণ করিতে হইলে দুইটির একটী পন্থা অনুসরণ করা যাইতে পারে। প্রথম পন্থাটী অতি সহজ এবং একটী ত্রৈরাশিক প্রক্রিয়া মাত্র, তবে ইহার ফল স্থূল হইবে। দ্বিতীয় পন্থাটী অপেক্ষাকৃত জটিল, তবে ইহার ফল সূক্ষ্ম।

প্রথম প্রক্রিয়া।

১৫ই এপ্রিল, সমকালপ্রভেদ − ০ মিনিট ১০'৭৯ সেকেণ্ড } গ্রিণউইচের বেলা
১৬ই এপ্রিল, সমকালপ্রভেদ + ০ মি ৪'০৫ সে } ১২টার সময়

দুইএর প্রভেদ + ০ মি ১৪'৮৪ সে

সুতরাং ১৪'৮৪ : ১০'৭৯ : : একদিন : দিনের ভগ্নাংশ

দিনের ভগ্নাংশ $= \frac{১০৭৯}{১৪৮৪} =$ ১৭ ঘণ্টা ২৭ মি ০'৪৮ সে।

নাবিকপঞ্জিকায় দিবা ১২টার সময়ে ঐ সমকালপ্রভেদ লিখিত হওয়ায় সমকালপ্রভেদ শূন্যের সময় ১৭ ঘ ২৭ মি ০'৪৮ সে − ১২ ঘণ্টা = প্রাতঃকাল ৫টা ২৭ মি ০'৪৮ সে। ইহা গ্রীণউইচের ঘটিকা হিসাবে বুঝিতে হইবে।

কলিকাতার দেশান্তর ৫ ঘ ৫৩ মি ২১সে এবং কলিকাতা গ্রীণউইচের পূর্ব্বে স্থিত বলিয়া তাহা যুক্ত হইবে।

সুতরাং কলিকাতায় সমকালপ্রভেদের শূন্যকাল ৫টা ২৭ মি ০'৪৮ সে + ৫টা ৫৩ মি ২১সে = ১১টা ২০ মি ২১'৪৮ সে হইবে। ইহা নিরয়ণ-বিন্দুর অবস্থিতি-কাল।

দ্বিতীয় প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ায় অগ্রপশ্চাৎ কয় দিনের সমকালপ্রভেদ ধরিতে হইবে।

এপ্রেল সমকালপ্রভেদ	প্রথম প্রভেদ	দ্বিতীয় প্রভেদ
১৪ই − ০ মি ২৫'৯৯ সে ($ক^{১}$)		
	+ ১৫'২০ সে ($খ^{১}$)	
১৫ই − ০ ১০'৭৯ ($ক^{\circ}$)		− ০'৩৬ সে ($গ^{১}$)
	+ ১৪'৮৪ ($খ_{\circ}$)	
১৬ই + ০ ৪'০৫ ($ক_{১}$)		− ০'৩৮ সে ($গ^{\circ}$)
	+ ১৪'৪৬ ($খ_{২}$)	
১৭ই + ০ ১৮'৫১ ($ক_{২}$)		

বেসেল (Bessel)-কৃত অন্তর্নিবেশ (interpolation) সূত্র (formula) হইতে গঠিত নিম্নলিখিত সূত্রের সাহায্যে সূক্ষ্মরূপে দিনের ভগ্নাংশ নিরূপিত হইবে।

$$\text{দিনের ভগ্নাংশ} = \frac{-ক^{\circ}}{খ_{\circ} - \left(\frac{গ^{১}+গ^{\circ}}{২}\right)\times\frac{১}{২} - \left(\frac{গ^{১}+গ^{\circ}}{২}\right)\times\frac{১}{২}\times\frac{+ক^{\circ}}{+খ^{\circ}}}$$

= ১৭ ঘ ২৩ মি ২৭'৪৮ সেকেণ্ড।

সুতরাং সমকালপ্রভেদের শূন্যকাল = সকাল ৫টা ২৩ মি ২৭·৪৮ সেকেণ্ড।

কলিকাতায় সমকালপ্রভেদের শূন্যকাল = ১১টা ১৬ মি ৪৮·৪৮ সে।

গ্রিণউইচ ঘটিকায় সমকালপ্রভেদের শূন্যকালের সূর্য্যের স্ফুট গ্রহণ করিলে তাহাই অয়নাংশ হইবে। এ কারণ পর পর কয়দিনের সৌরস্ফুট নাবিকপঞ্জিকা হইতে উদ্ধৃত হইল।

এপ্রিল	১২টার সময়ের সৌরস্ফুট				প্রথম প্রভেদ	দ্বিতীয় প্রভেদ
১৩	২২ অংশ	৪৬ কলা	১৭·৭ বিকলা	(ক^{২})		
					৫৮ক ৪৪·৪ বি (খ^{২})	
১৪	২৩	৪৫	২·১	(ক^{১})		—১·৮ বি (গ^{২})
					৫৮ ৪২·৬ (খ^{১})	
১৫	২৪	৪৩	৪৪·৭	(ক^{০})		—১·৭ (গ^{১})
					৫৮ ৪০·৯ (খ$_{০}$)	
১৬	২৫	৪২	২৫·৬	(ক$_{১}$)		—১·৮ (গ^{০})
					৫৮ ৩৯·১ (খ^{১})	
১৭	২৬	৪১	৪·৭	(ক$_{২}$)		—১·৬ (গ^{১})
					৫৮ ৩৭·৫ (খ$_{২}$)	
১৮	২৭	৩৯	৪২·২	(ক$_{৩}$)		

দেখা যাইতেছে যে, ১৫।১৬ই এর মধ্যে কোন এক সময়ের সৌরস্ফুট নিরূপণ করিতে হইবে। এই সময়কে দিনের কোন অংশ হিসাবে (কারণ, আমরা প্রতিদিনের স্ফুট পাইতেছি) "স" বলিয়া ধরিলে, ১৫ই তারিখের ১২টা হইতে তাহা ক^{স} বলিতে পারা যায়। এক্ষণে বেসেলের সূত্রমত ক^{স} নিরূপিত হইবে। ক^{স}ই আমাদের অয়নাংশ।

$$ক^{স} = ক^{০} + সখ^{০} + ^{স (স - ১)}\left(\frac{গ^{১} + গ^{০}}{২}\right)$$

এস্থলে $স = ১৭ঘ\ ২৭\ মি\ ২৭·৪৮\ সে = \frac{৩২০২৪৭২}{৪৪১৯৪৯৭}$ দিন

$$সুতরাং\ অয়নাংশ = ২৪\ অংশ\ ৪৩\ ক\ ৪৪·৭\ বিকলা + \frac{৩২০২৪৭২}{৪৪১৯৪৯৭} \times ৫৮ক\ ৪০·৯\ বিকলা$$

$$+ \frac{৩২০২৪৭২}{৪৪১৯৪৯৭} \times \left(\frac{৩২০১৪৭২}{৪৪১৯৪৯৭১}\right)$$

$$\times \frac{১}{২} \times \left(\frac{-১·৭ - ১·৮}{২}\right)$$

$$= ২৫\ অংশ\ ২৬\ ক\ ১৬\ বিকলা।$$

এইরূপে নাবিকপঞ্জিকার সাহায্যে পূর্ব্ব ও পরবর্ত্তী বর্ষের অয়নাংশ নির্ণয় করিলে ইহার বার্ষিক গতি জানা যাইবে। কয়েক বর্ষের অয়নাংশ নিরূপণ করিতে পারিলে ইহার গতির হার শুদ্ধরূপে জানা যাইতে পারে। কিছু অধিক গত বর্ষসংখ্যার অয়নাংশ ধারাবাহিকরূপে স্থির করিয়া, তাহাদের সাধারণীকরণ (integration) প্রক্রিয়ার দ্বারা এমন একটী নিয়ম গঠিত হইতে পারে, যাহাতে নাবিকপঞ্জিকার বিনা সাহায্যে বহু বর্ষ পর্য্যন্ত অয়নাংশ গণিত হইতে পারে।

ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, সূর্য্যসিদ্ধান্তে "পৌষ্ণান্তে ভগণঃ স্মৃতঃ" কথাগুলিতে রেবতী নক্ষত্রের শেষে ভগণের আদি না বুঝাইতে পারে; এই বাক্যাবলী সোমসিদ্ধান্তে এবং ব্রহ্ম-সিদ্ধান্তেও দেখা যায়। ভাস্করাচার্য্যও রেবতী নাম উল্লেখ করিয়াছেন। এ কারণে পৌষ্ণান্তে অর্থে রেবতীর অন্তে ধরিলে আমরা দেখি যে, আদিবিন্দু সচল না হইয়া নিশ্চল হইবে এবং তাহা আমাদের মূল তত্ত্বের প্রমাণের বিপক্ষে যাইবে। কিন্তু আমরা সিদ্ধান্তজ্যোতিষগুলির পূর্ব্বের নানা গ্রন্থ আলোচনা করিয়া জানিতে পারি যে, তৎকালে নক্ষত্রের আদি অশ্বিনী বলিয়া ধরা হইত না। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে কৃত্তিকার নিকট আদিবিন্দু অবস্থিত বলিয়া উল্লেখ আছে। আবার পিতামহসিদ্ধান্তে আদিবিন্দুর স্থান ধনিষ্ঠা নক্ষত্রে ছিল। মহাভারত রচনাকালে শ্রবণা নক্ষত্রকে আদি বলিয়া ধরা হইত। এতদ্দ্বারা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, আদিবিন্দু সচল এবং হিন্দুগণ বহুদিন হইতে আদিবিন্দুর স্থান নির্দ্দেশ করিয়া আসিতেছেন।

শ্রীএকেন্দ্রনাথ দাস ঘোষ

অশুদ্ধি সংশোধন

পৃষ্ঠা	১৩	পংক্তি	২৫	"ষাম্যোদগ" "যাম্যোদগ্" হইবে।
পৃষ্ঠা	"	"	৩১	"তেষামন্তরং শাস্তদাস্পদাৎ"। "তেষামন্তরংশাস্তদাস্পদাৎ" হইবে।
পৃষ্ঠা	১৪	পংক্তি	১০	"বিযুক্ত্যা" "বিযুক্ত্যা" হইবে।
পৃষ্ঠা	"	"	১২	"যঃ" "যঃ" হইবে।
পৃষ্ঠা	১৫	পংক্তি	১৯	"কৃত্যে" "কৃত্যো" হইবে।
পৃষ্ঠা	"	"	২৩	"বিষুবদ্দয়ে" "বিষুবদ্বয়ে" হইবে।
পৃষ্ঠা	১৬	পংক্তি	২৫	"নাড্যাদিকং" "নাড্যাদিকং" হইবে।

মুর্শিদাবাদের একটী প্রাচীন লিপি *

আমি ইতিপূর্ব্বে পরিষৎ-পত্রিকার চতুর্ব্বিংশ খণ্ডের তৃতীয় সংখ্যায় "মুর্শিদাবাদের কয়েকখানি লিপি" নামক একটী প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়াছিলাম। সে সময় তথাকার যে সকল শিলালিপি আমার দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল, উক্ত প্রবন্ধে সমস্তই সন্নিবেশিত ছিল। প্রাতঃস্মরণীয়া রাণী ভবানীর রাজধানী বড়নগরের অপর পারে অধুনা দেবীপুর নামক যে গণ্ডগ্রাম অবস্থিত আছে, এক কালে তাহা সাধু মোহান্তদিগের লীলাক্ষেত্র ছিল। বঙ্গদেশের বিভিন্ন স্থান হইতে সর্ব্বশ্রেণীর ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তিরা উক্ত স্থানে মানবদেহের সার্থকতার জন্য আসিয়া মন্দির-মঠাদি প্রতিষ্ঠাপূর্ব্বক সাধুসঙ্গমে ও ধর্ম্মযাজনে জীবন যাপন করিতেন। পুণ্যতোয়া ভাগীরথীর স্রোতের কবলে অধিকাংশ ধ্বংস হইয়া উক্ত দেবীপুর গ্রামের সামান্য অংশই এক্ষণে বর্ত্তমান আছে। উক্ত গ্রামে প্রসিদ্ধ তিনটী আখড়া বা মঠ ছিল। প্রত্যেক মঠেই এক বা ততোধিক মন্দির প্রতিষ্ঠিত এবং তাহাতে দেবসেবা ও অতিথি-সৎকারাদির সুন্দর ব্যবস্থা ছিল। এক্ষণে উক্ত গ্রামের সেই আখড়াগুলির বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা ভগ্নাবশেষে ও জঙ্গলাকীর্ণ অবস্থায় পরিণত হইয়াছে। কিছু দিবস পূর্ব্বে তথাকার মধ্যম আখড়ায় একটী শিলালিপি রক্ষিত আছে শুনিয়া, আমি তাহা দেখিতে যাই। উক্ত আখড়ার একটী গৃহে কাল প্রস্তরের একটী বৃহৎ শিলালিপি দেখিতে পাই। সে সময় আমার নিকট তাহার প্রতিলিপি (rubbings) লইবার কোন সরঞ্জাম ছিল না। পূর্ব্বপ্রদেশের প্রত্নবিভাগের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আমার বন্ধু শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত দীক্ষিত মহাশয় গত শ্রাবণ মাসে পরিদর্শন উপলক্ষে তথায় গমন করিলে, আমিও তাঁহার অনুসরণ করিয়া ঐ প্রস্তরটী তাঁহাকে দেখাই। আমাদের সঙ্গে ইতিহাস-প্রেমিক শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস সরকার মহাশয়ও ছিলেন। সেই সময় এই শিলালিপির ছাপ লওয়া হয়, তাহাই আজ আপনাদিগের সম্মুখে উপস্থিত করিলাম। ইহা দৈর্ঘ্যে প্রায় ২৮ ইঞ্চি ও প্রস্থে ১৪।০ ইঞ্চি, কঠিন কাল প্রস্তরে তোলা অক্ষরে ক্ষোদিত। ইহার চারি ধারও সুন্দর নক্সায় শোভিত। সমস্ত লিপিটী মধ্যভাগে একটী স্থূল রেখা দ্বারা দুই ভাগে বিভক্ত, উপরিভাগে দেবনাগরী অক্ষরে হিন্দী ভাষায় পাঁচটী কবিতা লিখিত আছে। নিম্নভাগ আর একটী স্থূল রেখা দ্বারা দুই ভাগে বিভক্ত; তাহার বাম দিকে বাঙ্গালা অক্ষরে পদ্যে ও দক্ষিণ দিকে পারসী কবিতায় লিপিটী ক্ষোদিত আছে। উপরোক্ত চারি ধারে প্রত্যেকটীর মধ্যভাগে দেবনাগরী অক্ষরে হিন্দী ও সংস্কৃত ভাষায় দেবতাদিগের নমস্কার ক্ষোদিত আছে। এইরূপ তিন ভাষাযুক্ত শিলা-লিপি সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না।

শিলালিপির সারাংশ এই যে, বিক্রমসংবৎ ১৭৮১, শকাব্দা ১৬৪৬ বর্ষে বৈশাখ মাসে অক্ষয়-তৃতীয়া দিবসে মহারাজ গন্ধর্ব্ব সিংহ বাহাদুরপুরের সন্নিকট দেবীপুরের দক্ষিণে গঙ্গাতীরে

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ১৩৩০ বঙ্গাব্দের নবম মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

জমি ক্রয়পূর্ব্বক ধর্ম্মার্থে হরিমন্দির নির্ম্মাণ ও কূপ খনন করাইয়াছিলেন। লিপিতে জমির পরিমাণ বাইশ বিঘা আট কাঠা, এবং চৌহদ্দী—পশ্চিমে গঙ্গার আইল, উত্তরে দেবীপুর ও দক্ষিণে বাহাদুরপুর লিখিত আছে। ঐ জমি রত্নেশ্বরের স্ত্রীর নিকট হইতে ক্রয় করার উল্লেখ হিন্দী, বাঙ্গালা ও পারসী—এই তিনটী ভাষাতেই আছে। হিন্দী ও বাঙ্গালা ভাষায় কেবলমাত্র রত্নেশ্বরের স্ত্রীর নিকট উদ্যান হইতে খরিদ করার বিষয় লিখিত আছে। কিন্তু পারসী ভাষাতে ব্রাহ্মণকুলোদ্ভব রত্নেশ্বরের বিধবা পত্নী ঈশ্বরী দেবীর উদ্যান হইতে লাখরাজ জমি খরিদ করার উল্লেখ থাকায়, রত্নেশ্বরের স্ত্রীর পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। লেখকের নাম রামকৃষ্ণ উল্লেখ আছে।

উপরোক্ত দেবীপুর ও বাহাদুরপুর গ্রামদ্বয়ের অস্তিত্ব এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে। বঙ্গদেশের যে ইতিহাসগুলি সচরাচর পাওয়া যায়, তাহাতে উল্লিখিত মহারাজ গন্ধর্ব্ব সিংহের কোন বিবরণ দেখা যায় না। তিনি নিশ্চয়ই বঙ্গদেশের কোন না কোন স্থানের প্রতিপত্তিশালী পুরুষ ছিলেন। হিন্দীতে নৃপ গন্ধর্ব্ব সিংহ ও পরে তাহার বিশেষণস্বরূপ মহারাজ শব্দ লিখিত আছে। বাঙ্গালায় মহারাজা গন্ধর্ব্ব সিংহ বাহাদুর এবং পারসীতে কেবলমাত্র রাজা গন্ধর্ব্ব সিংহ লিখিত আছে। যাহা হউক, গন্ধর্ব্ব সিংহ যে, সে সময়ে কোন খ্যাতনামা ব্যক্তি ছিলেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ করিবার কারণ নাই।

এই শিলালিপির আর একটী বিবেচ্য বিষয়ে আমি আপনাদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। সেটী এই যে, ইহার হিন্দী ভাষার লিপিতে বিক্রম সংবৎ ১৭৮১ লিখিত আছে। বাঙ্গালা ভাষার লিপিতে শকাব্দা "ষোলষস" ও অঙ্কে "৪৬ সনে" অর্থাৎ ১৬৪৬ সনের উল্লেখ আছে। ইহার সামঞ্জস্য হওয়াই বিবেচ্য বিষয়। সংবৎ ১৭৮১ ও শকাব্দা ১৬৪৬ এই দুইয়ে অমিল নাই। কিন্তু ঐ সনে হিজরী ১১৪৬ স্থলে ১১৪২ হওয়া উচিত ছিল। যদি উপরোক্ত সংবৎ কিংবা শকাব্দা এবং হিজরী—এই দুই সন তারিখ, একটী জমি ক্রয় করিবার ও অপরটী শুভদিনে মন্দির প্রতিষ্ঠা করিবার সময় ধরা যায়, তাহা হইলে, হিন্দী ও বাঙ্গালা ভাষার লিপির সন তারিখই অর্থাৎ সম্বৎ ১৭৮১, শকাব্দা ১৬৪৬ বৈশাখ শুক্লা তৃতীয়া—(অক্ষয়তৃতীয়া) মন্দির-প্রতিষ্ঠার সময় বলিয়া ধরা উচিত। জমি ক্রয়ের সময় অবশ্য ইহার কিছুদিন পূর্ব্বে হইবারই কথা; অথচ পারসী ভাষার লিপির সন তারিখ তাহার আরও তিন চারি বৎসর পরের সময় নির্দ্দেশ করিতেছে। এ সম্বন্ধে আমার আর কোনরূপ সাধন না থাকায়, আমি কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি নাই। এক্ষণে এই অপ্রকাশিত শিলালিপির লিখিত মহারাজ গন্ধর্ব্ব সিংহ সম্বন্ধে যদি কোন সুবিজ্ঞ ব্যক্তি তত্ত্বানুসন্ধানপূর্ব্বক তাহার ফলাফল প্রকাশিত করেন, তাহা হইলে আমার পরিশ্রম বিশেষ সফল হইবে।

শিলালিপির বঙ্গাক্ষরে অক্ষরান্তর

(দেবনাগর)

১। শীর্ষভাগে—শ্রীকৃষ্ণ বাসুদেবজু সদাসহাই।

২। দক্ষিণভাগে—শ্রীলছমনায় নমঃ।

৩। নিম্নভাগে—শ্রীগণেশায় নমঃ ॥ শ্রীঃ।

৪। বামভাগে—শ্রীরঘুনাথায় নমঃ ॥

(উপর অংশে দেবনাগর)

১। সম্বতু ১৭৮১ বৈশাষ মাস সুদি তীজ ॥ শ্রীনৃপ গন্ধর্ব্ব সিংঘ ভূব মোললে বয়ো ধর্ম্মকো-বীজ ॥ দেবপুরী অস্থানু য়

২। হ বাগু গঙ্গকে তীর ॥ জর খরীদি লীনৌ সৌঙ্গ শ্রীহরিসুত্রণকোঁ ধীর ॥ রতনেসুরকী নারিনেঁ দয়ৌ খুশী করি মোল ॥ থ

৩। রি রোপী মহারাজনেঁ ধর্ম্মপুরী অডোল। উত্তর দেবীপুর বসে পচ্ছিম গঙ্গা আলি ॥ মেঁড বহাদুর পুর লগী দচ্ছিন

৪। পূরব খালি ॥ বীঘা বীস পর দোয়হৈ আঠ বিসে পরিমাঁন ॥ হরিমন্দিলু কীনহো তহাঁ বাঁধ্যৌ কূপ নিরাঁন ॥ ৫ ॥

(নিম্নে বাম অংশে বাঙ্গালা)

১। ওঁ শ্রীমহারাজা গন্ধর্ব্ব সিংহ বাহাদুর রত্নে—

২। সয়ের ত্রি স্থানে বাগ হইতে বাইশ বিঘা আট

৩। কাঠা ইহ পশ্চিমে গঙ্গার আঁলি উত্তরে দেবীপু—

৪। র পুর্ব্ব দক্ষিণ বাহাদুরপুর জর খরিদ লইয়া

৫। সকাব্দা সোলষস ৪৬। সনে বৈসাখ মাষের ×

৬। অক্ষয়ত্রিতীয়া দিবশে হরিমন্দির ও কূপ দিলা।

(নিম্নে দক্ষিণ অংশে পারসী)

১। রাজা গন্ধরব্ সিন্হ্ বহাদুর বাঘ্ করদন্দ জর খুরীদ শুদ নমূদ অন্দর হবেলী চাহসীরাঁ অফজীদ।

২। মী-গিরফ্ৎ অজ নিজদ মুসমাত ঈশ্বরী দেবা চোবুদ, অহ্লিয়ে রতনেসর জুন্নারদার মুতবর্বক বজুদ।

৩। বিস্তউ দো বিঘা মোয়াজী হস্ত বিস্ওয়ে লাখরাজ, হদ্দ মঘরিব অওজ দরিয়ায়ে মৌজ দর মৌজমিজাজ।

৪। পূস্র বহাদুর হর দো সুদ মসরীক ও জনুব দারদ জমীন, তা শমাল হদ্দ দেবীপুর মোকর্‌র শুদ। আমীন।

৫। অজ তরারিখ নহুম শব্‌রাল দহ উ শশ্‌ সনহ্‌ জলূস, য়ক হজার উ য়কসদ উ চেহল উ শশ্‌ হিজরী মনুয

৬। অজু খৎ-ই রামকৃষ্ণ

শ্রীপূরণচাঁদ নাহার

মুর্শিদাবাদের একটি প্রাচীন লিপি

"মুর্শিদাবাদের একটী প্রাচীন লিপি"
পাঠ সম্বন্ধে মন্তব্য

শ্রীযুক্ত পূরণচাঁদ নাহার মহাশয় আমাদের সমক্ষে এই অপূর্ব্ব ত্রিভাষাময় লিপিখানি উপস্থিত করিয়াছেন, আমরা তজ্জন্য তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ।

কিন্তু দেবনাগরী ও বাঙ্গালা অংশে প্রদত্ত তারিখ তিনি যেরূপ পড়িয়াছেন, আমরা তাহা গ্রহণ করিতে পারিতেছি না। তিনি স্বকীয় পাঠ অবলম্বন করিয়া দেবনাগরী ও বাঙ্গালা অংশের সংবৎ ও শকাব্দের সহিত ফারসী অংশের হিজরী সনের অসামঞ্জস্য দেখিয়াছেন, এবং তাঁহার প্রবন্ধের শেষ প্যারাগ্রাফে সেই অসামঞ্জস্যের কারণ নির্দ্দেশ করিবার প্রয়াস করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও আমি উভয়ে মিলিয়া এই লিপিখানির ভূষার ছাপাটি আলোচনা করি। ফারসী পাঠটিও আমরা পড়ি। শ্রীযুক্ত রাখাল বাবু ফারসী অংশের তারিখটী লইয়া অনুশীলন করেন। আমরা দেখিতেছি, লিপিতে কোনও অসামঞ্জস্য নাই।

দেবনাগরী অংশে প্রথম ছত্রে তারিখ এই দেওয়া আছে :—

সংবতু ১৭৯১ বৈসাষ (ষ=খ) মাস সুদি তীজ ॥

শ্রীযুক্ত পূরণচাঁদ বাবু ১৭৮১ পড়িয়াছেন। স্পষ্ট ১৭৯১ আছে, ১৭৮১ নহে।

বাঙ্গালা অংশে পঞ্চম ও ষষ্ঠ ছত্রে তারিখ এই আছে :—

সকাব্দা সোলষ পাচপোন বৈসাখ মাসের অক্ষয় ত্রিতিয়া দিবশে ॥

অর্থাৎ শকাব্দা ১৬৫৫ বৈশাখ মাস অক্ষয় তৃতীয়া।

শ্রীযুক্ত পূরণচাঁদ বাবু পড়িয়াছেন, "সকাব্দ সোলষস ৪৬। সনে" ইত্যাদি। এই পাঠ মোটেই আমরা গ্রহণ করিতে পারি না। "পঞ্চান্ন" স্থলে "পাচপোন" বঙ্গদেশে বিরল নহে। "সোলষস ৪৬"—অর্দ্ধ অংশ অক্ষর বিন্যাসের দ্বারা, অর্দ্ধ অংশ সংখ্যা-লেখের দ্বারা—এইরূপে কাল-নির্দ্দেশ একেবারে দুর্লভ। শ্রীযুক্ত পূরণচাঁদ বাবু "পা" কে "স ৪" পড়িয়াছেন, "চ" কে "৬" ধরিয়াছেন, "পোন" কে '। সনে' পড়িয়াছেন। ইহাতেই যত গোল।

সংবৎ ১৭৯১=শকাব্দা ১৬৫৫=খ্রীষ্টীয় ১৭৩৪, এখানে কোনও গোল নাই।

ফারসী অংশের পঞ্চম ছত্রে তারিখ এই দেওয়া আছে :—

অজ্ তবারিখ ই নহুম্ শব্‌বাল দহ্ উ শশ্ সনহ্ জলুস য়ক্ হজার উ য়ক্ স্বদ্ উ চিহিল উ শশ্ হিজরহ্।

রাজ্যাঙ্ক (=সনহ্ জলুস্) ১৬ (দহ্-উ-শশ্) ৯ই শওয়াল, এক হাজার এক শত চল্লিশ ও ছয় হিজরী (=১১৪৬ হিজরী)।

দিল্লীতে মুহম্মদ শাহ হিজরী ১১৩১ হইতে ১১৬১ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তাঁহার রাজত্বের ষোড়শ বর্ষ=১১৪৬ হিজরী। ১১৪৬ হিজরী ১৪ জুন ১৭৩৩ খ্রীষ্টাব্দ হইতে আরম্ভ হয়। ১১৪৬ হিজরীর শওয়াল মাস ১৭৩৪ সালের মার্চ্চে পড়ে। সুতরাং ১৭৯১ সংবৎ=১৬৫৫ শকাব্দ=১১৪৬ হিজরী—এই তিনে বেশ মিল আছে।

দেবনাগরী অংশের ভাষা রাজস্থানী-মিশ্র ব্রজভাষা; চতুর্থী বিভক্তিস্থলে "নে" ("রতনেস্বরকী নারিনেঁ দয়ৌ"=রত্নেশ্বরের স্ত্রীকে দিল) রাজস্থানীর বিভক্তি।

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

——০——

হিন্দু ও বৌদ্ধে তফাৎ *

হিন্দু, দেবতা উপাসনা করেন। বৌদ্ধ, গুরুর উপাসনা করেন। হিন্দু ও বৌদ্ধে এই প্রথম ও প্রধান তফাৎ। হিন্দু দেবতা উপাসনা করেন; তাঁহাদের উদ্দেশ্য—দেবতার সঙ্গে এক লোকে বাস করেন, সমান আকার প্রাপ্ত হন, সমান অলৌকিক শক্তি লাভ করেন, এমন কি, একদেশে দেবতার দেহের সহিত মিশিত হন। পুরা মাত্রায় দেবতা হন, এ কথা তাঁহারা মনেও ধারণা করিতে পারেন না। বৌদ্ধেরা গুরু ভজনা করেন; তাঁহাদের উদ্দেশ্য—গুরু হইবেন, বুদ্ধ হইবেন, শূন্য হইবেন। শূন্যে শূন্য মিশিয়া যাইবে।

বৌদ্ধেরা দেবতাকে অত্যন্ত ছোট বলিয়া মনে করেন। দেবতারা মানুষের চেয়ে একটু বড় হইতে পারেন, কিন্তু গুরুর চেয়ে তাঁহারা অনেক নীচে। শাক্যমুনি যখন বোধিমূলে বসিয়া বোধিলাভ করিলেন, ইন্দ্র ও ব্রহ্মা তাঁহার পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন। ইন্দ্র ত্রয়স্ত্রিংশ স্বর্গের অধিপতি, ব্রহ্মা রূপলোকের অধিপতি; ইঁহারা দুজনেই বুদ্ধের কাছে জোড়হস্ত। নারায়ণপরিপৃচ্ছা নামক পুস্তকে আছে যে, নারায়ণ সাজিয়া গুজিয়া, শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম ধারণ করিয়া, গরুড় আসনে বসিয়া বুদ্ধদেবের নিকটে আসিলেন এবং গূঢ় দার্শনিক মতের মীমাংসা করিয়া লইয়া গেলেন। শাক্যসিংহ যখন জন্মাইলেন, তখন শাক্যদের নিয়ম অনুসারে খোকাটীকে মহেশ্বরের মন্দিরে লইয়া যাওয়া হইল। মহেশ্বর নিজে উঠিয়া ছেলেটীকে কোলে করিয়া লইলেন। এই সকল দেখিয়া বেশ জানা যায় যে, আমাদের যে বড় বড় দেবতা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, সকলেই বুদ্ধ অপেক্ষা অনেক ছোট। কিন্তু বেদের সময় হইতেই আমরা ইন্দ্র, বায়ু, বরুণ প্রভৃতি দেবতার পূজা করিয়া আসিতেছি। বেদে যজুর্ব্বেদী ব্রাহ্মণ, দেবতাদের আহার, আহারের স্থান, সব তৈয়ার করিতেন; ঋগ্বেদী তাঁহাদের হব বা আহ্বান করিতেন। তাঁহারা খাইতে বসিলে সামবেদী আহারের সময় তাঁহাদের স্তব উচ্চৈঃস্বরে গান করিতেন। দেবতারা আহারে তৃপ্ত হইয়া তাঁহাদের বর দিয়া যাইতেন, যথা—পুত্র, পশু, দ্রবিণ ইত্যাদি। বেদের পর ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর আমাদের উপাস্য দেবতা হইলেন। তাঁহাদের কাছেও আমরা বর চাহিতাম—ধন দাও, পুত্র দাও, পশু দাও। যাঁহারা পার্থিব সুখের জন্য ব্যগ্র নহেন, তাঁহারা সার্ষ্টি, সালোক্য, সারূপ্য ও বড় জোর সাযুজ্য প্রার্থনা করিতেন। কিন্তু বৌদ্ধদের চরম প্রার্থনা, নির্ব্বাণ ও বুদ্ধত্বপ্রাপ্তি। অনুপধিশেষনির্ব্বাণ বা শূন্যে মিশিয়া যাওয়া।

আমরা ঠাকুরদের ধ্যান করি। বলি—"ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং, ধ্যেয়ঃ সদা সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী", অথবা বলি,—"বন্দে শৈলসুতাসুতং," "ভজামি, প্রণমামি" প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করি। কিন্তু বৌদ্ধেরা যখন তাঁহাদের দেবতাদের ধ্যান করেন, তাঁহারা "আত্মানং অমুকদেবতারূপেণ বিভাব্য" পূজা করেন, আমিই বজ্রযোগিনী হইয়াছি, আমিই লোকেশ্বর হইয়াছি, আমিই প্রজ্ঞাপারমিতা

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ৩১শ বার্ষিক চতুর্থ বিশেষ অধিবেশনে পঠিত।

হইয়াছি বলিয়া পূজা করেন। এই সকল দেবতা ইন্দ্র চন্দ্রাদি দেবতা হইতে পৃথক্। ইঁহাদের কথা পরে বলিব। আমাদের দেবতারা অনেক বৌদ্ধ দেবতার পায়ের তলে থাকেন। অনেক সময়ে আমাদের ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরেরও ঐরূপ দুর্দ্দশা বৌদ্ধেরা করিয়া থাকেন।

মহাযানের পর বৌদ্ধদের যে সব যান হইয়াছে, তাহাতে দেবতা আছে। কিন্তু সে সকল দেবতা দেব ও দেবী, আমাদের দেব ও দেবীদের মত ভিন্ন ভিন্ন বিভাগ বা ডিপার্টমেণ্টের দেবতা নহেন; তাঁহারা সকলেই শূন্যের প্রতিমূর্ত্তি। আপনারা পঞ্চ ধ্যানী বুদ্ধের নাম শুনিয়াছেন। বৈরোচন, অক্ষোভ্য, রত্নসম্ভব, অমিতাভ ও অমোঘসিদ্ধি; তাঁহারা পাঁচটী স্কন্ধের শূন্যমূর্ত্তি। পাঁচটী স্কন্ধ কি কি? রূপস্কন্ধ, সংজ্ঞাস্কন্ধ, সংস্কারস্কন্ধ, বেদনাস্কন্ধ ও বিজ্ঞানস্কন্ধ, এই পাঁচটী স্কন্ধের শূন্যমূর্ত্তির নাম পঞ্চধ্যানী বুদ্ধ। ইঁহাদের পাঁচটী শক্তি আছেন, রোচনা, মামকী, তারা, পাণ্ডরা, আর্য্যতারিকা। ইঁহাদের আবার পাঁচজন বোধিসত্ত্ব আছেন; গণেশ, মহাকাল, পদ্মপাণি, রত্নপাণি, বিশ্বপাণি। এই শক্তিগুলি ও এই বোধিসত্ত্বগণ সবই শূন্যমূর্ত্তি। এই পনরটী শূন্যমূর্ত্তি হইতে অসংখ্য অসংখ্য বুদ্ধ দেব দেবীর মূর্ত্তি হইয়াছে; সবই শূন্যমূর্ত্তি। বৌদ্ধেরা—আমরা সেই সেই মূর্ত্তি হইয়া গিয়াছি, এই বিভাবনা বা ধ্যান করিয়া তাঁহাদের পূজা করেন। আমরা শূন্যমূর্ত্তির ধ্যানই করি না। আমরা আমাদের সম্মুখে যে মূর্ত্তি, তাহাতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া, তাঁহাকে দেবতা করিয়া লইয়া ধ্যান করি।

আমাদের শূন্য অন্ধকার তমোভূত। বৌদ্ধদের শূন্য প্রভাস্বর, স্বয়ংপ্রকাশ, স্বয়ংজ্যোতিঃ। আমাদের আদিসৃষ্টি আছে। বৌদ্ধদের মতে এই পরিদৃশ্যমান জগৎ অনাদিপ্রবাহ। উহার আদিও নাই, অন্তও নাই। বুদ্ধদেবকে সৃষ্টির কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিতেন, তোমার আপনার চরকায় তেল দাও। তুমি কোথা থেকে এলে, কোথায় যাইবে, তাই ভাব। পৃথিবীর কথা ভাবায় তোমার দরকার নাই। আকাশ কোথা হইতে হইল, জিজ্ঞাসা করিলেও সেই কথাই বলিতেন। সুতরাং তাঁহার কাছে সৃষ্টিকথা শুনিবার আশা নাই। যখন বৌদ্ধদের মধ্যে যুবা বৃদ্ধে দলাদলি হইল, তখন যুবকেরা প্রথম যে বই লেখে, সেই মহাবস্তু অবদানে লেখা আছে, আগে বহু দিন পূর্ব্বে—কত কল্পকোটি বৎসর পূর্ব্বে, তাহার ঠিকানা নাই, জীব ছিলেন তাঁহারা স্বয়ংপ্রকাশ, তাঁহাদের শরীরে ভার ছিল না, তাঁহারা দিক্, কাল, আকাশে ইচ্ছামত ঘুরিয়া বেড়াইতেন, তাঁহাদের দুঃখ ছিল না, নিরন্তর প্রীতি সুখে বিচরণ করিতেন। কিছু কাল পরে একটা হ্রদের মত দেখা দিল। উহাতে অতি পাতলা অথচ অতি সুমিষ্ট জলের মত একটা পদার্থ ছিল; তাই অনেকে খাইতে লাগিলেন, খাইতে খাইতে তাঁহাদের শরীরে একটু একটু ভার বোধ হইতে লাগিল। আবার বহুকাল পরে আর একটা কি বাহির হইল, তাহা খাইতে খাইতে তাঁহাদের শরীরে তেজ বা আলো ক্রমে কমিতে লাগিল। ক্রমে গাছ দেখা দিল, সমস্ত গাছই ফলভরে অবনত, সেই ফল তাঁহারা খুব খাইতে লাগিলেন, শরীরের ভারও একটু বাড়িল, আলোও কমিয়া গেল। তাহার পর শস্যক্ষেত্র দেখা দিল, তাঁহারা তাহাও খাইতে লাগিলেন। তাঁহাদের স্ত্রীত্ব ও পুংচিহ্ন আবির্ভূত হইল, ক্রমে তাঁহাদের সন্তান সন্ততি হইতে লাগিল এবং ফসল তৈয়ারি করা দরকার হইল। যখন আমার খেতের ফসল

তুমি খাইতে লাগিলে, তখন সকলে একত্র হইয়া একজন মহাকায় পুরুষকে নিয়োগ করা হইল। তাঁহার বেতন নির্দ্ধারণ করা হইল, উৎপন্নের ৬ ভাগের একভাগ। তাঁহার নাম হইল মহাসম্মত। এই সব পড়িয়া আমরা দেখিতে পাই যে, হিন্দুরা যে অন্ধকার হইতে সৃষ্টি বলিয়াছেন, ইঁহারা তাহা বলেন না। ইঁহারা বলেন, আলো হইতেই অন্ধকার হইয়াছে। আর হিন্দুরা যে বলেন,— "অষ্টাভির্লোকপালানাং মাত্রাভির্নির্ম্মিতো নৃপঃ" অর্থাৎ রাজা দেবাংশ, ইঁহারা তাহাও বলেন না। ইঁহাদের রাজা গণদাস; লোকে তাঁহাকে বাছিয়া লইয়া বেতন দিয়া রাখিয়াছে। উত্তর অঞ্চলের বৌদ্ধেরা রাজাকে কখনই বড় বলিয়া মানিত না। সেই জন্য ভারতবর্ষে ও চীনে রাজাদের হাতে তাহাদের অনেক নিগ্রহ ভোগ করিতে হইয়াছিল। সময়ে সময়ে সমস্ত বৌদ্ধ সংঘ বিনাশ করিয়া ফেলা হইত। রাজাদের হাতে হিন্দুদের এ দুর্ভোগ বড় ভুগিতে হয় নাই।

বৌদ্ধধর্ম্ম নগরের পক্ষেই সুবিধা। হিন্দুধর্ম্ম নগর ও গ্রাম, সর্ব্বত্রই সমান ভাবে আদর পাইত। কৌটিল্য বৌদ্ধদের বড় ভাল চক্ষে দেখিতেন না। তিনি এক জায়গায় বলিয়াছেন, উহাদিগকে পাড়াগাঁয়ে, যেখানে লোক চাষবাস করিয়া খায়, সেখানে যাইতেই দিবে না। নূতন গাঁয়ে উহাদের প্রবেশ নিষেধ। উহারা সেখানে গেলে, লোককে ভিক্ষু করিতে চেষ্টা করিবে, চাষবাস বন্ধ হইয়া যাইবে। হিন্দুরা গৃহস্থ, তাঁহারা সংসারের উন্নতি চান, বৌদ্ধদের সে দিকে দৃষ্টিই নাই। সে জন্য হিন্দু ও বৌদ্ধে কখনই ঠিক বনিবনাও হইত না। অথচ হিন্দুরা ভিক্ষা না দিলে বৌদ্ধদের ভিক্ষু হওয়াই চলিত না।

হিন্দুরা বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম মানিতেন, তাঁহাদের শেষ আশ্রম যতি বা ভিক্ষু। যে ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ না হইয়া যতি হইত, হিন্দুরা তাহাকে ভাল চক্ষে ত দেখিতই না, বরং তাহাকে শাস্তিও দিত। কিন্তু বৌদ্ধেরা বর্ণ ও আশ্রম না দেখিয়াই সকলকে ভিক্ষু করিত। বুদ্ধদেবের সময়েই এই ব্যাপার লইয়া মহা গোলযোগ উঠে। তিনি যখন কপিলবাস্তুতে ধর্ম্ম প্রচারে ব্যস্ত ছিলেন, তখন দলে দলে শাক্যেরা বাল যুবা বৃদ্ধ স্ত্রীপুরুষ ভিক্ষু হইতে লাগিল। শুদ্ধোদন দেখিলেন, ক্রমে শাক্যদের জাতি ও নাম লোপ হইতে চলিল। তখন তিনি বুদ্ধকে বলিলেন, তুমি ২১ বৎসরের আগে যদি কাহাকেও ভিক্ষু কর, তাহা হইলে তোমাকে তাহার পিতা মাতার সম্মতি লইতে হইবে। তাই নিয়ম হইল, ২১ বৎসর বয়সের আগে কাহাকেও ভিক্ষু করা হইবে না। সে নিয়ম আজও আছে। বৌদ্ধদের যে কম্মবাচা আছে, তাহাতে কেহ ভিক্ষু হইতে আসিলে তাহাকে প্রথমেই জিজ্ঞাসা করা হয়, "তোমার বয়স ২১ বৎসর হইয়াছে ত?" এইরূপে শুদ্ধোদন নাবালকদিগকে ভিক্ষু হওয়ার দায় হইতে রক্ষা করিয়া গিয়াছেন।

হিন্দুদের মতে যে সন্ন্যাস গ্রহণ করিল, সে চতুর্ব্বর্ণ-সমাজ হইতে বাহির হইয়া গেল। তাহার দেহ অশুচি। তাহার সম্পত্তি উত্তরাধিকারীরা ভাগ করিয়া লইবে। সে যদি আবার ফিরিয়া আসে, তাহাকে আর বর্ণাশ্রমের মধ্যে গ্রহণ করা হইবে না। সে ভ্রষ্ট যোগী হইয়া থাকিবে। সংসারে প্রবেশ করিলে সে আর আপনার পূর্ব্বপদ পাইবে না। বৌদ্ধেরা কিন্তু অনেককে সংঘ ত্যাগ করিয়া আবার সংসারে প্রবেশ করিতে দেয়। উহারা কয়েক বৎসরের জন্যও ভিক্ষু করিতে রাজী।

অশোক রাজা একবার এক বৎসরের জন্ম সংঘে প্রবেশ করিয়াছিলেন। যে সংঘে যায়, সে আপনার সমস্ত সম্পত্তি স্বত্ব লইয়া সংঘে যায়। তাহার সম্পত্তি তাহার থাকে না, উহা সংঘের হইয়া যায়। বৌদ্ধেরা হিন্দুদের ঠাট্টা করিত, হিন্দুদের ত সন্ন্যাস লওয়া নয়, পুত্র পৌত্রদের সম্পত্তি বাঁটিয়া দিবার একটা ফন্দী। আমাদের সংঘে আশা মানে, আপনার সমস্ত সম্পত্তি সাধারণীকরণ বা দুনিয়াকে দান করা। হিন্দু ও বৌদ্ধদের মধ্যে এই ব্যাপার লইয়া সর্ব্বদা বিবাদবিসম্বাদ হইত। মনে কর, একজন বড় ধনী আছেন; তাঁহার একটী ছেলেকে উহারা ভিক্ষু করিল। তাহার পিতা মরিলে তাহার অংশ সংঘের হইয়া যাইবে। অন্য ভাইএরা তাহাতে রাজী হইত না। সর্ব্বদা ঝগড়া বিবাদ হইত। আমার মনে হয়, ভারতবর্ষে বৌদ্ধ ধর্ম্মের পতনে এও একটা প্রধান কারণ। ভিক্ষুদের দেখিলেই সম্পন্ন গৃহস্থেরা ভয় পাইত—ছেলে ধরিতে আসিয়াছে।

হিন্দুদের ভূসম্পত্তি সবই সপিণ্ডদের হইত। ছেলে জন্মাইলেই সে সম্পত্তির অংশাধিকারী হইত। বাপ আর সে সম্পত্তি হস্তান্তর করিতে পারিতেন না। মিতাক্ষরা প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্রে লেখা যে, জন্মমাত্রেই স্থাবর সম্পত্তিতে তাহার স্বত্ব হয়। কিন্তু বাঙ্গালায় এ মত চলে না। এখানে বাপ মরার সময় যে যে ছেলে, পৌত্র বা প্রপৌত্র বাঁচিয়া থাকিবে, তাহারা উত্তরাধিকারের স্বত্ব পাইবে। এটা অনেকে মনে করেন, বাঙ্গালায় বৌদ্ধ প্রাধান্য ছিল বলিয়া হইয়াছে। হিন্দুরা communal interest দেখিত, বৌদ্ধেরা personal interest দেখিত।

বুদ্ধদেব নিজে যে সকল আইন করিয়া গিয়াছিলেন, সবই সংঘের জন্য। তাঁহার বিনয় সংঘের মধ্যেই চলিত। গৃহস্থ বৌদ্ধ উপাসক উপাসিকাদের জন্য তিনি যে সকল নিয়ম করিয়া গিয়াছিলেন, তাহাও সংঘ ও উপাসক উপাসিকার মধ্যে যে সম্পর্ক ছিল, তাহারই উপর স্থাপিত। এই সকল নিয়মের বাহিরে উপাসক উপাসিকাদিগকে অর্থাৎ গৃহস্থ বৌদ্ধদিগকে রাজার আইন মানিয়া চলিতে হইত। দেওয়ানী ও ফৌজদারী অথবা ধর্ম্মস্থীয় ও কণ্টকশোধন রাজার হাতে ছিল। এ সকল বিষয়ে বৌদ্ধেরা কোন আইন কানুন ভারতবর্ষে করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। সুতরাং ভারতবর্ষের বৌদ্ধদিগকে চিরদিনই রাজার অধীন হইয়া চলিতে হইত। ইৎসিং এক জায়গায় বলিয়া গিয়াছেন, কেমন করিয়া সংঘ রাজার সঙ্গে যাহাতে বিবাদ না হয়, তাহার চেষ্টা করিতেন। একজন ভিক্ষুকে কোন কারণে সংঘ হইতে তাড়াইয়া দেওয়া হয়, সংঘাধিপ তাহার যাহা কিছু ভিক্ষু-সম্পত্তি ছিল, তাহার কাপড় চোপড় বিছানা প্রভৃতি তাহার নিকট পাঠাইয়া দিলেন। সে আর সেই জিনিস লইবার জন্য সরকারের সাহায্য লইবার সুবিধা পাইল না। অনেক রাজা বৌদ্ধ সংঘকে গ্রাম দান করিতেন। নালন্দার মঠগুলির ২০০ খানা গ্রাম ছিল। গ্রামণীর যে কাজ, তাহা সংঘেরাই করিতেন। সুতরাং সংঘ যে একেবারে রাজার কথা মানিব না, তাহা বলিতে পারিতেন না। অনেক রাজা আবার এই সকল গ্রাম বাজেয়াপ্ত করিবার চেষ্টা করিতেন। অনেক জায়গায় দেখিতে পাওয়া যায়, এক সংঘের গ্রাম অন্য সংঘকে দেওয়া হইত। সংঘে আবার ব্যবসা ও বাণিজ্য চলিত। সুতরাং রাজার সঙ্গে তাঁহাদিগকে ভাব রাখিয়া চলিতে হইত। রাজা বৌদ্ধবিরোধী হইলে এবং তাঁহার সভায় ব্রাহ্মণ প্রবল হইলে সংঘকে অনেক সময় বিপদে পড়িতে হইত। কিন্তু তথাপি

সংঘের যথেষ্ট প্রতাপ ছিল। লোকে যখন সংঘের অনুরাগী থাকিত, রাজা সহজে তাহাদের উপর হুকুম চালাইতে বা তাহাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিতে যাইতেন না।

রাজনীতি, সমাজ শাসন ইত্যাদি বিষয়ে হিন্দু ও বৌদ্ধে যে তফাৎ ছিল, তাহা কতক কতক দেখান হইল। কিন্তু দার্শনিক মত বিষয়ে উহাদের তফাৎ বড়ই বেশী ছিল। হিন্দুরা এখন বলেন, তাঁহাদের ছয়খানি দর্শন,—মীমাংসা, বেদান্ত, সাংখ্য, যোগ, ন্যায় ও বৈশেষিক। মীমাংসা বৌদ্ধদের থাকিতেই পারে না। কারণ, উহা বেদের ব্যাখ্যা লইয়া ব্যস্ত। এই শাস্ত্রকে দর্শন বলিতেও পারা যায়, নাও বলিতে পারা যায়। যখন উহা বেদের ব্যাখ্যা লইয়া নিয়ম করে, তখন উহা দর্শন নহে। কিন্তু যখন যজ্ঞ করিলে অপূর্ব্ব হয় বলে, অপূর্ব্বে বা অদৃষ্টের বলে স্বর্গ ও নরক হয় বলে, স্বর্গের লক্ষণ করে, প্রমাণ কয়টা ও তাহার লক্ষণ কি বলে, তখন উহা দর্শন। বেদান্ত, বেদের উপনিষৎগুলি প্রমাণ মনে করিয়া, তাহার উপর ব্রহ্ম, অপবর্গ প্রভৃতি কথার বিচার করে, তখন উহা নিশ্চয়ই দর্শন। যখন এ দুখানি দর্শন বেদকে ভিত্তি করিয়া তৈয়ারি হইয়াছে, তখন ইহার সহিত বৌদ্ধদের কোনও সম্পর্ক নাই।

পাতঞ্জল দর্শন যোগের কথা। যোগ সবাই করে—বৌদ্ধেরাও করে, জৈনেরাও করে, হিন্দুরাও করে; সুতরাং উহাকে দর্শন না বলিলেও চলে। একজন দর্শনসমূহের ইতিহাস-লেখক জৈন পণ্ডিত বলিয়া গিয়াছেন, যোগ দর্শন নয়, উহা কতকগুলি নিয়ম মাত্র; সকল যোগীই উহা মানিয়া চলেন। পতঞ্জলির যোগসূত্রে আমাদের বা বৌদ্ধদের কোনই আপত্তি নাই।

সাংখ্য লইয়া মহাগোল। সকল দর্শনের চেয়ে সাংখ্য পুরাণ। জৈন, বৌদ্ধ প্রভৃতি সম্প্রদায় উঠিবার অনেক আগে সাংখ্যদর্শন হইয়াছিল। সকলেই উহা হইতে আপন আপন মতের মালমশলা সংগ্রহ করিয়াছেন। অশ্বঘোষ বুদ্ধচরিতে স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন যে, বুদ্ধ দেবের যে দুজন গুরু ছিলেন, দুজনেই সাংখ্যমতাবলম্বী ছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের যে কৈবল্য, তাহা বুদ্ধদেবের পছন্দ হয় নাই। তাই তিনি উহাঁদিগকে ছাড়িয়া ছয় বৎসর ধ্যান ধারণার পর পরমার্থ জ্ঞান প্রাপ্ত হন। সে পরমার্থ-জ্ঞান কিন্তু ঐ সাংখ্য মতের উপরই দাঁড়াইয়া আছে। তবে সাংখ্যদের মূল কথা যে সৎকার্য্যবাদ, তাহা উনি ত্যাগ করিয়াছেন। কারণ সৎ, তাহা হইতে সৎ কার্য্যের উৎপত্তি অর্থাৎ কার্য্য কারণের পরিণাম মাত্র। বুদ্ধদেব সৎকার্য্যবাদটিকে ঘুচাইয়া বলিলেন, "সর্ব্বং ক্ষণিকং ক্ষণিকম্।" গোড়ায় যদি সৎকার্য্যবাদ বন্ধ করিয়া ক্ষণিকবাদ হইল, আগায়ও তাহা হইলে কেবলবাদ ভাঙ্গিয়া গিয়া শূন্যবাদ হইল। বুদ্ধদেব বলিলেন, "সর্ব্বং শূন্যং শূন্যম্।" সাংখ্য ও সব জিনিষের সংখ্যা করিয়া থাকে বলিয়া সাংখ্য নাম পাইয়াছে। বৌদ্ধেরাও তেমনি সকল বিষয়েরই সংখ্যা করিয়া গিয়াছেন। মূল সাংখ্য ২২টী সূত্র মাত্র। প্রত্যেকটিরই একটি করিয়া সংখ্যা আছে। যথা—১। অষ্টৌ প্রকৃতয়ঃ। ২। ষোড়শ বিকারাঃ। ৩। পুরুষ ইত্যাদি। বৌদ্ধেরাও তেমনি বলেন, চতুরার্য্যসত্য, ষট্‌পারমিতা, দশভূমি ইত্যাদি। যদিও বৌদ্ধদের সাংখ্যদের মত সূত্রাবলী নাই, কিন্তু দার্শনিক পদার্থগুলির সংখ্যা করা সম্বন্ধে দুজনই একপন্থী।

কপিলসূত্রগুলিতে বেদ যে প্রমাণ, সে কথা নাই। তাই হিন্দুরাও বইখানাকে নাকচ করিয়া দিয়াছিলেন। সাংখ্য বলিতে তাঁহাদের কাছে ষষ্টিতন্ত্র বুঝাইত। ষষ্টিতন্ত্রের পুথি এখনও পাওয়া যায় নাই। কিন্তু উহার এক সূচি অহির্বুধ্ন পঞ্চরাত্রে পাওয়া গিয়াছে। আর ঐ ষষ্টিতন্ত্র সংক্ষেপ করিয়াই ঈশ্বরকৃষ্ণ তাঁহার কারিকা লিখিয়াছেন। ঈশ্বরকৃষ্ণের কারিকাই হিন্দু সাংখ্যের প্রাচীনতম পুথি। উহাতে বেদ যে প্রমাণ, সে কথা আছে। কিন্তু সে বেদ সাংখ্যজ্ঞান হইতে অনেক নীচে। "দৃষ্টবদানুশ্রবিকঃ স হ্যবিশুদ্ধিক্ষয়াতিশয়যুক্তঃ"—দৃষ্ট পদার্থ হইতে যেমন একান্ত ও অত্যন্ত দুঃখ নিবৃত্তি হয় নাই, আনুশ্রবিক অর্থাৎ বেদোদিত ক্রিয়াকলাপ হইতেও সেইরূপ অত্যন্ত ও একান্ত দুঃখনিবৃত্তি হয় না। নাই হউক, তথাপি উহা বেদ মানে, উহাকে গ্রহণ করা যায়। কিন্তু কপিলকে গ্রহণ করা যায় না, সে বেদ মানে না। কপিলের উপর হিন্দুদের এত ঘৃণা যে, শ্রাদ্ধ-সভায় যদি কাপিল বা লোকায়ত উপস্থিত হয়, উহাদিগকে শিয়াল কুকুরের মত তাড়াইয়া দিতে হইবে। সাংখ্যপ্রবচনভাষ্যও সাংখ্যের একখানি নূতন পুথি। এখানিও হিন্দুরা গ্রহণ করিয়াছেন, যে হেতু ইহাতে বেদকে প্রমাণ বলিয়া মানে। সুতরাং দুরকম সাংখ্য আছে;—এক রকম হিন্দুদের ও আর একরকম বৌদ্ধদের। বৌদ্ধেরা কাপিল সূত্রের প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন এবং ঈশ্বরকৃষ্ণকারিকা চীন দেশের ত্রিপিটকে পাওয়া যায়।

বৈশেষিক লইয়া আরও গোল। প্রবাদ আছে, বৈশেষিক আঠার রকম। আমরা ত অত পাই নাই। এক রকম সকলেই জানে, কণাদের ষট্‌পদার্থী—উহাতে বেদের কথা আছে,—"বুদ্ধিপূর্ব্বো বাক্যকৃতির্বেদে"; সুতরাং হিন্দুরা উহা গ্রহণ করিয়াছেন। আর এক রকম দশপদার্থী বৈশেষিক চীন দেশ হইতে পাওয়া গিয়াছে, উহাতে বেদের উল্লেখ একেবারে নাই, হিন্দুরা উহা গ্রহণ করেন নাই। কিন্তু বৌদ্ধেরা উহা রাখিয়াছে। বৈশেষিক এক রকম "ফিসিকাল সাএন্স"; সুতরাং উহাতে সকলেরই দরকার। লইতে সকলেরই হইবে, সকলেই আপন আপন মত করিয়া লইয়াছেন।

আরও বেশী গোল ন্যায়শাস্ত্র বা লজিক লইয়া। দুপক্ষেই বলেন, উহা অক্ষপাদের লেখা। অক্ষপাদ দুজনেরই ভরসা। কিন্তু টীকায় দুরকম হইয়া গিয়াছে। আমি অনেকগুলি প্রবন্ধে দেখাইয়াছি যে, অক্ষপাদের সূত্রগুলি শুদ্ধ মাত্র তর্কশাস্ত্র। আমরা উহাতে কিছু কিছু প্রক্ষেপ করিয়া উহাকে দর্শনশাস্ত্র করিয়া তুলিয়াছি। সে সকল কথা এখানে আর পুনরুক্তি করিব না। উহাতে চারিটি প্রমাণের কথা আছে, সে কথাও পরে বলিব। এখানে এই মাত্র বলি যে, বাৎস্যায়ন ঐ সূত্রের টীকা লিখিলে দিঙ্‌নাগ উহার ঘোর প্রতিবাদ করেন। আবার উদ্দ্যোতকর ঐ ভাষ্যের বার্ত্তিক লিখিয়া দিঙ্‌নাগের মত খণ্ডন করেন। আবার বৌদ্ধেরা ঐ মত খণ্ডন করেন। আবার বাচস্পতি মিশ্র তাহার খণ্ডন করেন। এইরূপে বহুবার খণ্ডন মণ্ডনের পর দুই সম্প্রদায়ের মত দুই রকম হইয়া গিয়াছে। দিঙ্‌নাগের মত চীন ও জাপানে খুব চলিতেছে। ভারতবর্ষে বাৎস্যায়নের মতই প্রবল।

তর্কশাস্ত্রের ইতিহাস অতি বিচিত্র। চাণক্যের সময় বোধ হয়, গোতমের সূত্র চলিত ছিল না। কারণ, আমরা অনুমান বলি ও অনুমান শব্দ প্রয়োগ করি। তিনিও অনুমান শব্দ প্রয়োগ করেন

বটে, কিন্তু আমরা যাহাকে অনুমান বলি এবং যাহার জন্য অনুমান শব্দ প্রয়োগ করি, তাঁহার মতে তাহা সাদৃশ্যজন্যজ্ঞানজন্য জ্ঞান। গোতমসূত্র চলিত থাকিলে উনি এরূপ করিতে পারিতেন না। অশোকের সময় কথাবস্তু নামে একখানি বৌদ্ধদের বিচারগ্রন্থ লেখা হয়। উহাতে বিচার করিয়া বৌদ্ধদের সমস্ত মত স্থাপন করা হয়। উহা উঁহাদের তৃতীয় সঙ্গীতির সময় রচিত হয় এবং সমস্ত স্থবিরবাদের আচার্য্যগণ উহাতে সম্মতি দিয়াছিলেন। উহার বিচার-প্রণালী বিচিত্র। মুসলমান আমলে আদালতে যেমন জবাব, হদ্দজবাব, রদ্দজবাব চলিত ছিল, উহা কতকটা সেইরূপ। একটা কথা উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে অনেক ফেকড়ি উঠিল, সব ফেকড়ি উদ্ধার করিয়া তবে মূলকথার বিচার হইল। মীমাংসকদের বিচার-প্রণালী আর একরকম। ১। সন্দেহ। ২। বিষয়। তাহার পর পূর্ব্বপক্ষ, তাহার পর উত্তর। তাহার পর নির্ণয়। এই পাঁচটির নাম অধিকরণ। কিন্তু মহাযানীরা ঠিক ইংরাজী সিলগিসম (syllogism) মত কথা কহিত, উহাকে তাহারা প্রয়োগ কহিত, উহাতে বিচারটা বেশ পরিষ্কার হইয়া যাইত।

বিচারপ্রণালী হইতেই প্রমাণের কথা উঠে—উভয় সম্প্রদায়ের প্রমাণাবলী বড় বিচিত্র। বুদ্ধদেব সাত রকম প্রমাণ মানিতেন। পৌরাণিকেরা আট রকম, কেহ কেহ প্রতিভা বলিয়া আর একটা প্রমাণও মানিতেন। মীমাংসকেরা ছয়টি মানিতেন। গোতম একদিকে আর নাগার্জ্জুন আর একদিকে; দুজনেই প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শাব্দ, এই চাররূপ প্রমাণ মানিতেন। বৈশেষিকেরা দুইটি মাত্র প্রমাণ মানেন বলিয়া কথা আছে। কিন্তু কণাদের পুথিতে আগাগোড়াই আগমের কথা আছে। কণাদ, প্রত্যক্ষ ও অনুমানের দ্বারা বায়ু প্রমাণ করিতে অক্ষম হইয়া, আগমের উপর নির্ভর করিয়া বায়ু নামক পদার্থ স্থাপিত করিয়াছেন। আকাশের স্থাপনা সেইরূপে। সুতরাং বলিতেই হইবে, তিনি আগমও মানিতেন। ঈশ্বরকৃষ্ণও এই তিনটী প্রমাণই মানিয়া গিয়াছেন। চার্ব্বাকেরাই কেবল প্রত্যক্ষ ভিন্ন প্রমাণ মানিতেন না।

নাগার্জ্জুনের ও বর্ত্তমান আকারে গোতমসূত্রের পর চারিটি প্রমাণই পণ্ডিতসমাজে আদর পায়। কিন্তু ইহার এক শত বৎসর পরে মৈত্রেয় নামে একজন বৌদ্ধ নৈয়ায়িক উপমান প্রমাণ স্বীকারের প্রয়োজন দেখেন না। তিনি তিনটি প্রমাণই যথেষ্ট মনে করিতেন। তাঁহারও এক শত বৎসর পরে দিঙ্‌নাগ নামে একজন বড় পণ্ডিত প্রাদুর্ভূত হইয়া বলিলেন, শব্দও প্রমাণ হইতে পারে না। প্রমাণ দুই বই নয়—প্রত্যক্ষ আর অনুমান। একেবারে বর্ত্তমান ইউরোপীয় লজিকের মত হইয়া গেল preception and inference. অনুমান প্রমাণ হইলেই কিরূপে অনুমান করিতে হয়, তাহাতে কয়বার বাক্য প্রয়োগ করিতে হয়, তাহা লইয়া বিবাদ হয়। এই বাক্য-প্রয়োগের নাম "অবয়ব"। গোতমের পূর্ব্বে দশ রকম অবয়ব ছিল। বাৎস্যায়ন বলেন, গোতম প্রথম পাঁচটি অবয়ব উড়াইয়া দিয়া, পাঁচটি অবয়বের অনুমান সাজাইয়া গিয়াছেন। নৈয়ায়িকেরা এখনও পাঁচ অবয়বেই অনুমান সাজান। দিঙ্‌নাগ কিন্তু আর দুইটি তুলিয়া দিলেন। বলিলেন, তিনেই যথেষ্ট। প্রতিজ্ঞা, হেতু আর উদাহরণ। প্রথমটিতে পক্ষ ও সাধ্য নির্দ্দেশ, দ্বিতীয়টিতে হেতু নির্দ্দেশ ও তৃতীয়টিতে সাধ্য ও হেতুর মধ্যে ব্যাপ্তি দেখান। অবয়ব কম হওয়ায় বৌদ্ধদের

বিচারপ্রণালী পরিষ্কার ও সংক্ষেপ হইয়া উঠিল। উহাদের সঙ্গে আঁটিয়া উঠা ভার হইয়া উঠিল। দিঙ্‌নাগের সংস্কৃত বই এতদিনের পর পাওয়া গিয়াছে ও ছাপা হইতেছে। বইখানি ছাপা হইলে উহাতে আমাদের ও বৌদ্ধদের ন্যায়শাস্ত্র বুঝিবার খুব সুবিধা হইবে।

বৌদ্ধদের মেটাফিজিক্‌সের ইতিহাস আছে। বুদ্ধদেবকে যদি কেহ জিজ্ঞাসা করিত, নির্ব্বাণের পর কি থাকিবে? তিনি তাহার জবাব দিতেন না। যদি বা কিছু বলিতেন ত বলিতেন, সে কথায় তোমার কি? তুমি ত জন্মজরামরণের হাত হইতে এড়াইয়া গেলে, তোমার ত ত্রিতাপ নাশ হইল, সেই যথেষ্ট। শূন্য জিজ্ঞাসা করিলেও তিনি তাহাই বলিতেন। ৫০০ বৎসর পরে অশ্বঘোষও তাহাই করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার প্রধান উক্তি,—

দীপো যথা নির্বৃতিমভ্যুপেতো
নৈবাবনিং গচ্ছতি নান্তরিক্ষম্।
দিশং ন কাঞ্চিৎ বিদিশং ন কাঞ্চিৎ
স্নেহক্ষয়াৎ কেবলমেতি শান্তিম্॥
কৃতী তথা নির্বৃতিমভ্যুপেতো
নৈবাবনিং গচ্ছতি নান্তরিক্ষম্।
দিশং ন কাঞ্চিৎ বিদিশং ন কাঞ্চিৎ
ক্লেশক্ষয়াৎ কেবলমেতি শান্তিম্॥

কিন্তু তাঁহার পর এক শত বা দেড় শত বৎসরের পর নাগার্জ্জুন সাহস করিয়া নির্ব্বাণ বা শূন্যের লক্ষণ করিলেন,—"সদসৎ তদুভয়ানুভয়চতুষ্কোটিবিনির্ম্মুক্তং শূন্যম্।" উহা সৎও নয়, অসৎও নয়। দুএ জড়াইয়াও নয়, দুই ছাড়াও নয় অর্থাৎ উহা অনির্ব্বচনীয়। শূন্যই পরমার্থ, শূন্যই সত্য, শূন্যই বজ্র। শূন্যবাদ ক্রমে দুই ভাগ হইয়া গেল।

দৃঢ়ং সারমসৌশীর্য্যমচ্ছেদ্যাভেদ্যলক্ষণম্।
অদাহি অবিনাশি চ শূন্যতা বজ্রমুচ্যতে॥

এই একদল বলিল, শূন্য ছাড়া আর কিছুই নাই। উহার নাম অপ্রতিষ্ঠিতসর্ব্বধর্ম্ম। আর এক দল মায়োপমাদ্বৈতবাদ। শূন্য ছাড়া সব বস্তু মায়ার মত। শঙ্করাচার্য্য ইহার সাত শত বৎসর পরে মায়াবাদ প্রচার করেন। সে মত বৈষ্ণবেরা প্রচ্ছন্ন-বৌদ্ধ বলিয়া ত্যাগ করিয়া নানাবিধ ভক্তিমত প্রচার করিলেন। বিষ্ণুস্বামী বৈদিক ক্রিয়া-কলাপের সঙ্গে বৈষ্ণব মত প্রচার করেন। রামানুজ বিশিষ্টাদ্বৈত মত, মধ্বাচার্য্য দ্বৈতাদ্বৈত মত প্রচার করেন। শঙ্করের উপর কিন্তু সকলেরই রাগ— তিনি প্রচ্ছন্নবৌদ্ধ। শঙ্করের দুই তিন শত বৎসর পরে উদয়নাচার্য্য সমস্ত বৌদ্ধমত খণ্ডন করিয়া, আমাদের দেশের ন্যায়-মত দৃঢ়ভাবে স্থাপিত করিয়া যান। তিনি শূন্যবাদ খণ্ডন করেন, ক্ষণিকবাদ খণ্ডন করেন ও অদৃষ্ট-সহকৃত ঈশ্বরের জগৎকর্ত্তৃত্ব স্থাপন করিয়া যান।

দর্শনশাস্ত্র অতি কঠিন, সহজে হৃদয়ঙ্গম হয় না। আমার এতক্ষণ ধরিয়া দর্শনের চর্চ্চাটা ভাল

হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না, উহা শেষ করিয়া উঠা কঠিন। তবে কালচারের কথা বলিতে গেলে দর্শনশাস্ত্রের কথাটা না বলা ভাল নয়।

বৌদ্ধেরা গোড়ায় দেশীয় ভাষায়ই বই লিখিতেন। আমরা এখন যাহাকে পালি বলি, উহাতে কত ভাষা আছে, তাহা বলা যায় না। প্রাচীন পুঁথিগুলির ভাষা প্রায়ই পৃথক্ পৃথক্। বৌদ্ধেরা আর এক ভাষায় পুথি লিখিতেন, তাহার নাম মিশ্রভাষা; উহার কতক সংস্কৃত, কতক প্রাকৃত। এই ভাষায় অনেক বই আছে। গদ্যে এই লেখা, মাঝে মাঝে প্রমাণস্বরূপ পদ্য, পদ্য ও গদ্যের ভাষা একরূপ নহে, পদ্যের ভাষা পুরাণ। ক্রমে গদ্য অংশ সংস্কৃত হইতে আরম্ভ হইল। সে সংস্কৃত পড়িলেই মনে হইবে, এ মহাভাষ্যের ভাষা নয়, কোন প্রাকৃতের তর্জ্জমা মাত্র। এ সব কথা আগে কেহ বিশ্বাস করিত না। কিন্তু সদ্ধর্ম্মপুণ্ডরীক নামে একখানি বই আছে, উহার গদ্যটা ঐ রকম সংস্কৃত, আর পদ্যটা মিশ্র। নেপাল হইতে যে কয়খানি পুথি পাইয়াছি, সব ঐ রকম। কিন্তু তকলা মাকান মরু খুঁড়িয়া যে সদ্ধর্ম্মপুণ্ডরীকের প্রাচীন পুথি পাওয়া গিয়াছে, তাহার সবটাই ঐ মিশ্র ভাষায় লেখা।

শেষ অবস্থায় বৌদ্ধেরা অনেকেই সংস্কৃত লিখিতেন। দার্শনিকেরা ভাল সংস্কৃতই লিখিতেন। তথাপি কুমারিল তাঁহাদের অব্যুৎপন্ন শব্দ, অশুদ্ধ শব্দ লইয়া বিশেষ বিদ্রূপ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু যাঁহারা দার্শনিক ছিলেন না, তাঁহাদের সংস্কৃত বুঝাই যায় না। তাঁহারা বলিতেন, আমরা ব্রাহ্মণদের মত সুশব্দবাদী নই, আমাদের অর্থ বোধ হইলেই হইল। আমরা পুংলিঙ্গ স্থানে স্ত্রীলিঙ্গ লিখিব, প্রথমা স্থানে সপ্তমী লিখিব, আত্মনেপদের স্থানে পরস্মৈপদ লিখিব, একবচন স্থানে বহুবচন লিখিব, যাহা খুসী করিব, অর্থ বোধ হইলেই হইবে।

বৌদ্ধদের ভিতর একদল পাণিনির টীকা লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা সমস্ত বাক্যর পাণিনির সূত্র হইতেই বাহির করিতে চান, কাত্যায়ন ও পতঞ্জলিকে একেবারে নস্যাৎ করিয়া দেন। পাণিনির সূত্র ভাল করিয়া বুঝিতে গেলে ইঁহারাই আমাদের একমাত্র অবলম্বন। কাত্যায়ন ও পতঞ্জলি পাণিনির সমালোচনা করিয়াছেন, অব্যাপ্তি অতিব্যাপ্তি দেখাইয়াছেন। ইঁহারা তাহা করেন না। লক্ষ্মণসেন বৈদিক সূত্রগুলি বাদ দিয়া একখানি ব্যাকরণ করিতে চান। তিনি সে ব্যাকরণের ভার দিয়াছিলেন, একজন বৌদ্ধ পণ্ডিতের উপর। তাঁহার নাম পুরুষোত্তম।

ভাস্করাচার্য্য বলিয়াছেন, বৌদ্ধদের জ্যোতিষ বিচিত্র। তাঁহারা মনে করেন, চন্দ্র সূর্য্য, গ্রহ তারা দুই প্রস্থ, জোড়াজোড়া আছে। আজ যাহারা উদয় হয়, কাল তাহারা আসে না, পরশু দিন তাহারা আবার আসিবে। হিন্দুদের কিন্তু এরূপ নাই। সেই গ্রহনক্ষত্রই রোজ উদয় হয়।

ধর্ম্ম ও বিশ্বাস সম্বন্ধে বৌদ্ধ ও হিন্দুর ভিতর যে ভেদ আছে, তাহার কিছু কিছু বলিলাম। এখন আহার বিহার, আচার ব্যবহারে তাঁহাদের যে ভেদ আছে, তাহাই বলিতে চেষ্টা করিব। হিন্দুদের আহারের ব্যবস্থা চারায়ণ ঋষি করিয়া গিয়াছেন। লোকে পূর্ব্বাহ্নে ও অপরাহ্নে ভোজন করিবে। কেহ কেহ বলেন, অপরাহ্নে না হইয়া সন্ধ্যার পর ভোজন করিবে। ইহা ছাড়াও সংস্কৃত পুস্তকে দেখিতে পাওয়া যায় যে, প্রাতঃকালে অনেকে একটা প্রাতরাশ করিয়া থাকিতেন।

তাহার আর একটা নাম ছিল কল্যবর্ত্ত। ক্রমে এতবার খাওয়া উঠিয়া গিয়া একবার দিনে ও একবার রাত্রে খাওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে। আমরা বাল্যকাল হইতে শুনিয়া আসিতেছি, এক সূর্য্যতে দুইবার খাইতে নাই। এ খাওয়ার মানে আচমনীয় দ্রব্য অর্থাৎ যাহা খাইয়া আচমন করিতে হয় অর্থাৎ মুখ ধুইতে হয়; কিন্তু ফলাহার যখন তখন করা যায়; ফলাহার শব্দের অর্থ ফল খাওয়া, কিন্তু উহার এখন একটা পারিভাষিক অর্থ হইয়াছে। পানিফলের জিলিপি, পানিফলের কচুরি, এগুলিও ফলাহারের মধ্যে গণ্য হইয়াছে; যখন তখন খাওয়া যায়। খাইয়া মুখ না ধুইলেও চলে।

বৌদ্ধদের খাওয়ার ব্যবস্থা কিন্তু আর এক রকম। তাঁহারা একবার খাইবেন; বারটার আগে সে খাওয়াটি হইয়া যাওয়া চাই। খাইতে খাইতে যদি বারটা বাজে, অমনি উঠিয়া যাইতে হইবে। ছায়াটা দু আঙ্গুল পূর্ব্বে হেলা পর্য্যন্ত সময়ে খাইতে চাহিয়াছিল বলিয়া বৌদ্ধদের ভিতর ঘোর দলাদলি হইয়া যায়। অনেকে বারটার পূর্ব্বেও একটু আধটু জলযোগ করিতেন। বারটার পর কিন্তু তরল পদার্থ ভিন্ন আর কিছুই খাইবার নিয়ম ছিল না। তরল পদার্থ যথা—নারিকেলের জল, ফলের রস, ইত্যাদি। দক্ষিণ দেশের বৌদ্ধেরা অর্থাৎ সিংহল, বর্ম্মা, শ্যাম প্রভৃতি দেশের বৌদ্ধেরা এখনও এই নিয়ম পালন করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু উত্তরের বৌদ্ধেরা, গোড়াগুড়িই খাওয়া দাওয়ার বিষয়ে একটু শিথিল ছিলেন। তাই নিয়ে উত্তর ও দক্ষিণ-বৌদ্ধদের ভিতর ঝগড়া, তাই নিয়েই দলাদলি। ক্রমে যখন মহাযান মত প্রবল হইল, তখন খাওয়া দাওয়ার বাঁধাবাঁধিটা একেবারে উঠিয়া গেল। এখনকার নেপালী ও তিব্বতী বৌদ্ধদের সম্বন্ধে একজন ইংরাজ বলিয়াছেন, সকল ধর্ম্মেই আছে, Fast and worship—এদের দেশে কিন্তু Feast and worship; না খাইয়া তাহারা কিছু করে না। আর আমাদের বাঙ্গালার ব্রাহ্মণদের 'ভুক্ত্বা কিঞ্চিন্ন চাচরেৎ'—আহার করিয়া কোনরূপ ধর্ম্ম কর্ম্ম করিবে না; ভিক্ষুককে ভিক্ষামুঠাও দিবে না।

উপবাস

উপবাস শব্দের অর্থ কি? উপ উপসর্গ ও বস্ ধাতু। এ থেকে 'না খাওয়া' হল কেমন করে? এ সম্বন্ধে শতপথ-ব্রাহ্মণে লেখা আছে যে, যজমান যেমন যজ্ঞ করিবেন বলিয়া সঙ্কল্প করিলেন অর্থাৎ যজ্ঞশালা বাঁধিলেন, দেবতারা অমনি রাত্রে আসিয়া সে যজ্ঞশালার নিকটে ঘুরিতে লাগিলেন। যজ্ঞশালার নিকটে দেবতারা বাস করেন বলিয়া তাহার নাম হইল উপবাস। তার পর দিন এই সকল দেবতা অতিথিকে না খাওয়াইয়া যজমান খাইতে পারে কি না, ইহা লইয়া বিচার উঠিল। একদল বলিলেন—"অনশন", আর একদল বলিলেন,—না, কিছু খাইতে হইবে। শেষের মত প্রবল হইল, অন্ন বিস্তর বৃক্ষের ফল খাইতে পারিবে, কিন্তু সে পেট ভরিয়া খাইলে হইবে না। পিতৃকৃত্য করিতে গেলে কিন্তু একেবারেই খাইতে পারিবে না। আমাদের দেশে কিন্তু এ বিষয়ে বড়ই কড়াকড়ি। ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরা সর্ব্বদাই বলেন,—"ভুক্ত্বা কিঞ্চিন্ন চাচরেৎ।" বৈষ্ণবেরা কিন্তু কিছু আহার না করিয়া সন্ধ্যা আহ্নিক করেন না। তান্ত্রিকেরাও তাই করেন। স্মার্ত্ত পঞ্চোপাসক কিন্তু কড়াকড়ি করিয়া "ভুক্ত্বা কিঞ্চিন্ন চাচরেৎ" করেন।

বৌদ্ধেরা অষ্টমী, চতুর্দ্দশী, পূর্ণিমা ও অমাবস্যায় উপবাস করেন। প্রথম প্রথম উহার নাম ছিল—উপোসথ, পোসধ। জৈনেরা কিন্তু তাহাও ছাড়িয়া দিয়া শুধু 'পো' করিয়াছেন। ঐ দিন তাঁহারা না খাইয়া বিহারে যাইতেন ও বৈকাল বেলাটা ধর্ম্মকথা শুনিয়া কাটাইতেন। বারব্রত ইত্যাদিতে উত্তরের বৌদ্ধেরা বড় উপবাস করেন না। খাওয়া দাওয়া সম্বন্ধে তাঁহাদের কোন নিয়ম নাই। আমরা যেমন অনেক বাছিয়া গুছিয়া খাই, তাঁহারা তেমন করেন না। যে বুদ্ধের অহিংসা প্রধান কথা, তাঁহার শিষ্যেরা এখন মাংস খাইতে কোনরূপ দ্বিধাই করেন না। তবে অনেকে নিরামিষ-ব্রত করিয়া থাকেন। চীনেরা আমিষ বলিয়া দুধ ঘিও খায় না। তাহারা উহাকে animal food বলে। পেঁয়াজ রসুনে বৌদ্ধদের কিছুমাত্র দ্বিধা নাই। মদেও তাহাদের আপত্তি নাই। আমার বন্ধু ইন্দ্রানন্দ বলিতেন, যে যত বড় পণ্ডিত হইবে, সে তত বেশী মদ খাইবে।

ক্ষৌরকার্য্য

প্রাচীন কালে হিন্দুরা কামাইতে হইলে দুজন নাপিত রাখিতেন;—একজন নাভির উর্দ্ধটা কামাইত—আর একজন অধঃটা কামাইত। যে উপরের দিক্‌টা কামাইত, সে আচরণীয় হইত, যে নীচের দিক্‌টা কামাইত, সে অনাচরণীয় হইত। বাৎস্যায়ন কামসূত্রে বলেন, দাড়ী ও গোঁপ কামান চতুর্থ দিনে করিতে হয়, নখ কাটাও তাই। অধোদেশ উৎপাটন করিয়া কামাইলে দশ দিন, না হলে পাঁচ দিন। উরত কামাইতে হইলে ফেনা ব্যবহার করিতে হইত। সন্ন্যাসীদের ও স্ত্রীলোকদের বগল কামাইতে নাই। সন্ন্যাসীদের অধোলোম কামাইতে নাই। মাথার সব চুল রাখা সে কালে পুরুষের মধ্যেও চলিয়াছিল। এখনও দক্ষিণ দেশে পুরুষেরা সব চুল রাখে ও বিনুনী করিয়া খোঁপা কাটে। মাথাটি তল করিয়া কামাইয়া মধ্যে খুব বড় রকমের টিকি রাখা আর্য্যাবর্ত্তে চলিয়াছিল—সন্ন্যাসীরাই কেবল সমস্ত মাথাটা কামাইতেন, শিখা পর্য্যন্তও রাখিতেন না।

বৌদ্ধ ভিক্ষুরা মাথাটা তল করিয়া কামাইতেন, তাঁহারা মাথার চুল পনের দিনের বেশী রাখিতে পারিতেন না। নয় দিনের মধ্যেই কামাইতে হইত। যেখানে যেখানে বৌদ্ধ মঠের ঢিপি পাওয়া গিয়াছে, সেখানে সেখানেই অনেক ক্ষুর পাওয়া গিয়াছে। তাহাতে অনেকে অনুমান করেন যে, বৌদ্ধেরা নিজে নিজেই কামাইতেন। অনেকেই শরীরের সমস্ত লোম কামাইয়া ফেলিতেন। গৃহস্থ বৌদ্ধদের গ্রাম্য নাপিতেরাই কামাইত। হয় ত ভিক্ষুদেরও কামাইত। কিন্তু বিহারে মেলা ক্ষুর পাওয়ায় সে বিষয়েও একটু সন্দেহ হইয়াছে। নাপিতেরা পাটুনী, চণ্ডাল, মুচি, হাড়ী প্রভৃতি অনেক জাতিকেই কামাইত না। এই সব জাতির নিজের জাতির মধ্যেই নাপিত থাকিত। তাহারাই আপনাদের জাতিদের মধ্যে কামাইত। গ্রাম্য নাপিতেরা মুসলমানদের কামাইত; এমন কি, তাহাদের পায়ের নখ কাটিতেও আপত্তি করিত না। কিন্তু এই সকল জাতিকে তাহারা কখনই কামাইতে যায় না। অনেক সময় মজা হয়। একজন মুচি যদি মুসলমান হয়, গ্রাম্য নাপিতেরা তাহাকে কামাইবে; কিন্তু যদি সেই মুচি ভেক লইয়া বৈষ্ণব হয় ত তাহাকে কামাইবে না। হাড়ীদের নাপিত নাই। তাহারা নিজে নিজেই কামায়। সে জন্ত

আমাদের দেশে একটা কথা আছে, হাড়ীর ক্ষুরে তোকে কামাইয়া দিব, অর্থাৎ তোকে একেবারে অনাচরণীয়, অব্যবহার্য্য করিয়া দিব অর্থাৎ কোন নাপিত তোকে কামাইবে না।

বিছানা

হিন্দুরা অতি প্রাচীন কাল হইতে চার-পাই ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। চার-পাইয়ের নাম আসন্দী। দড়ির ছাওয়া, বাঁশের বা কাঠের চার-পা। ক্রমে খাট-পালং, তক্তপোষ প্রভৃতি নানারূপ শয্যাধার চলিতে লাগিল। এমন কি, আমরা এখন শ্রাদ্ধের দানেও একখানা খাট, একখানা তক্তপোষ, অন্ততঃ একখানা পিঁড়িও দিয়া থাকি। বৌদ্ধেরা কিন্তু উচ্চাসন এবং মহাসন একেবারেই বর্জ্জন করেন। উচ্চাসন বর্জ্জন করিলে তাঁহার খাট, পালং ও চৌকী, চার-পাই চলে না। মাটিতে মাদুর বিছাইয়া শুইতে হয়। মহাসন ত্যাগ করায় গদী, তোষক, বিছানার চাদর, তাকিয়া, গিদ্দে, বালিশ, পাশ-বালিশ, গাল-বালিশ, পা-বালিশ, সব ত্যাগ করিতে হয়। বড্ড বড়মানুষী কর, একখানি কার্পেটের উপর শুইয়া থাক, না হয় গালিচা কাঁথাই তাঁহাদের বেশী সম্বল। বিচিত্র বিচিত্র কারিকরী-করা কাঁথা, ফুল-তোলা কাঁথা বৌদ্ধদের জন্য হইয়াছিল বোধ হয়। এখনও অনেক জাতীয় সন্ন্যাসীর কাঁথাই সম্বল।

পোষাক

বেদের সময় ব্রাহ্মণরা মাথায় একটা পাগড়ী দিতেন। এখনও কোন বৈদিক কার্য্য করিতে গেলে একটা উষ্ণীষ লইতে হয় তাঁহারা জুতাও ব্যবহার করিতেন। উপানহ না হইলে তাঁহাদের চলিত না। একখানা ধুতি ও একখানা চাদর থাকিত। তাহার উপর উপবীতও থাকিত। এখন ত উপবীত, কয়েক খেই কাপাশের সূতা হইয়াছে, কিন্তু পৈতার সময় চাম্‌ড়ার পৈতা ব্যবহার করিবার কথা আছে। চামড়া পাওয়া যায় না বলিয়া অন্ততঃ একটুকরাও কালসারের চামড়া বাঁধিয়া দিতে হয়। আগে বোধ হয়, একখানা চাম্‌ড়া দিয়া গাটা ঢাকিয়া রাখিতেন। জামা বোধ হয় থাকিত না। কারণ, সেলাই-করা কাপড় লইয়া কোন ধর্ম্মকর্ম্ম করিবার বিধি নাই।

বৌদ্ধদের কিন্তু এক ধুতি আর এক চাদর। এ ছাড়া আর কোন পোষাকের কথা শোনা যায় না। চাদরখানা এক কাঁধে ফেলিয়া আর কাঁধ হইতে খুলিয়া রাখা হইত। সে কাপড় ও উত্তরীয় আবার খুব সেলাই-করা হইত। সেলাইয়ে তাঁহাদের আপত্তি ছিল না। সে কাপড়ও তাঁহারা সর্ব্বদা যে পরিষ্কার রাখিতেন, এমন নহে, কিন্তু ছোপাইয়া পরিতেন। কি দিয়া ছোপান হইত, ঠিক জানা যায় না। কখনও কখনও বলে কাষায় বস্ত্র, কখনও বলে রক্ত বস্ত্র। রাঙ্গা রঙ দিয়া ছোপাইতেন, কি কাষায় রঙ দিয়া ছোপাইতেন, অথবা হয় ত দুই রঙকেই তাঁহারা রক্ত বলিতেন। তবে দেশের নিয়মানুসারে তাঁহারা যে জামা বা চৌবন্দী ব্যবহার করিতেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। নেপালী বৌদ্ধেরা নেপালী গৃহস্থের মতই কাপড় পরেন। তবে নেপালে এখন বিহারও নাই, মঠও নাই। যাঁহারা বিহারে বাস করেন, তাঁহারা যদিও আপনাদিগকে ভিক্ষু বলেন, তথাপি বিবাহ করেন ও ছেলেপিলে লইয়া সংসার করেন।

স্নান

ব্রাহ্মণদের অতি প্রাচীন কাল হইতেই নানা রকম স্নানের ব্যবস্থা আছে,—ভস্মস্নান, গোময়-স্নান, ঘৃতস্নান, দুগ্ধস্নান, দধিস্নান, অবগাহন স্নান, শিখামজ্জন স্নান, উষ্ণজলে স্নান, তোলাজলে স্নান। বৌদ্ধদের ভিতর এতরূপ স্নান ছিল না হিন্দুরাও যে এত রকম স্নান সর্ব্বদাই করিতেন, তা নয়, যজ্ঞে ব্রতী হইবার পূর্ব্বে যজমানকে এরূপ স্নান করাইতেন, অভিষেকের পূর্ব্বে রাজাকে এরূপ স্নান করাইতেন, অন্য সময় অবগাহন স্নানই প্রায় করিতেন। না পারিলে মাথা ধুইয়া ফেলিতেন অথবা গা ধুইয়া ফেলিতেন। বিবাহের সময় বরকন্যাকে তোলাজলে স্নান করাইতেন। বৌদ্ধদের স্নান জলে জলেই হইত, ভস্মাদির স্নান সম্বন্ধে বড় শুনা যায় না। কিন্তু স্নানের সময় তাঁহারা মন্ত্র পড়িতেন,—"যথা হি জাতমাত্রেণ স্নাপিতাঃ সর্ব্বতথাগতাঃ। তথাহং স্নাপয়িষ্যামি শুদ্ধং দিব্যেন বারিণা॥ ওঁ সর্ব্বতথাগতাভিষেকসময়শ্রিয়ে হূং হূং।"

মুখ ধোওয়া

ব্রাহ্মণেরা অধিকাংশ স্থানেই দাঁতন করিতেন। দাঁতনের কাঠি হয় আট আঙ্গুল, না হয় বার আঙ্গুল থাকিত। কিন্তু শ্রাদ্ধাদির সময় তাঁহারা দাঁতন করিতেন না, পাছে দাঁত দিয়া রক্ত পড়িয়া ক্ষতাশৌচ হয়। ক্ষতাশৌচ হইলে শ্রাদ্ধাদিতে অধিকার থাকে না, সে জন্য শ্রাদ্ধের দিন ১২টা কুলকোচা করিয়া মুখ ধোওয়া ব্যবস্থা করা আছে। মাজনে তাঁহাদের আপত্তি ছিল না। অনেক জিনিষ দিয়া তাঁহারা মাজন তৈরী করিতেন। কিন্তু তর্জ্জনী অঙ্গুলী দিয়া দাঁত মাজা অত্যন্ত নিষেধ। মধ্যমা অঙ্গুলী দিয়া দাঁত মাজাই খুব প্রশস্ত। কারণ, অঙ্গুলীর মধ্যে উহাই সর্ব্বপেক্ষা কমজোর। উহা দিয়া ঘষিলে দাঁতে চাড় লাগে না। তর্জ্জনী দিয়া ঘষিলে চাড় লাগে ও উহাতে বিলক্ষণ ক্ষতি হয়। দাঁতন সম্বন্ধে ব্রাহ্মণেরা অনেক গাছ পরীক্ষা করিয়াছিলেন এবং সকল স্মৃতির পুস্তকেই কোন্ কোন্ কাঠে দাঁতন করিতে হয় এবং কোন্ কোন্ কাঠে দাঁতন করিতে নাই, তাহার লম্বা ফর্দ্দ আছে। যে কাঠ নরম, অনায়াসে চিবাইয়া কুলি করা যায়, তাহাই প্রশস্ত। বেশী বয়সে দাঁত পড়িয়া গেলে দাঁতন ছেঁচিয়া দাঁত পরিষ্কার করিয়া দিতে হয়। যে সব গাছে কষ আছে, সেই গাছের ডালেই ভাল দাঁতন হয়, তাহাতে দাঁতের গোড়াও শক্ত হয়।

বৌদ্ধেরা দাঁতনী করিতেন। কিন্তু তাঁহাদের দাঁতন প্রায়ই বার আঙ্গুল হইত। আট আঙ্গুল দাঁতন তাঁহারা বড় ব্যবহার করিতেন না। দাঁতন বার আঙ্গুল হইলে উহা দ্বারা জিব-ছোলারও কাজ করিতে পারা যায়। বৌদ্ধেরা ধাতুদ্রব্য ব্যবহার করিতেন না। কাজেই তাঁহাদের ধাতুনির্ম্মিত জিবছোলা থাকিত না। সুতরাং তাঁহারা বার আঙ্গুল দাঁতনই পছন্দ করিতেন। আট আঙ্গুল দাঁতন দিয়া জিব ছুলিতে গেলে দাঁতে আঙ্গুল লাগিত এবং কাটিয়া যাইবার সম্ভাবনা ছিল। মাজন দিয়া দাঁতন করিলে প্রায় দাঁতে পাথুরি হয়। মাড়ী ও দাঁতের মধ্যে একটা পাথরের মতন শক্ত জিনিষ জন্মিয়া মাড়ীকে আলগা করিয়া দেয়। সে জন্য মাজনটা সে কালে দন্তরোগ ব্যতিরেকে বৌদ্ধ

বা ব্রাহ্মণ, কেহই ব্যবহার করিতে চাহিতেন না। দাঁতন করিতে গেলে দাঁতনটী বার বার ধুইতে হইত। একবার মুখ হইতে বাহির করিলেই তাহা ধুইয়া আবার ব্যবহার করিতে হইত। ইৎসিংএর পুস্তকে আমরা পড়ি যে, চীনেরা আমাদের কাছ থেকে দাঁতন করা শিখিয়াছিল। কিন্তু আমরা এখন দাঁতন করাটা অসভ্যতা বলিয়া মনে করি। দাঁতন নিত্য নূতন হওয়ার কথা ছিল। না পাইলে একদিন কাটিয়া পাঁচ দিন ব্যবহারও চলিত।

মুখ ধোওয়ার সংস্কৃত নাম আচমন। আচমনে তিনবার জল মুখের মধ্যে দিতে হয়। তারপর দুইবার ওষ্ঠ ও অধর স্পর্শ করিতে হয়। তাহার পর চক্ষু কর্ণ নাসিকা স্পর্শ করিতে হয় অর্থাৎ ঐগুলি ধুইতে হয়। তত্তকরগুপ্ত বলেন, দাঁতন করিবার সময় মন্ত্র পড়িতে হয়,—"ওঁ নমো রত্নত্রয়ায়, নমো হারিত্যৈ, মহাযক্ষিণ্যৈ, অন্নে পানে ফুঃ স্বাহা।"

কাপড় কাচা ও তেলমাখা

ধোবা বা রজকে ব্রাহ্মণের কাপড় কাচিত। কিন্তু ব্রাহ্মণেরা নিজ হাতে রোজই কাপড় ধুইয়া ফেলিতেন। ছেঁড়া কাপড় অথবা ময়লা কাপড় পরা তাঁহাদের নিষেধ ছিল। কয়দিন অন্তর তাঁহারা কাপড় ধোবাবাড়ী দিতেন, তাহা জানা যায় না। তবে রোজ কাপড় কাচায় তাঁহাদের কাপড় শীঘ্র ময়লা হইত না। বৌদ্ধেরা কিন্তু তাঁহাদের কাপড় ধোবাবাড়ী দিতেন, এ কথা শুনা যায় না। কিন্তু স্নানের পর যে রোজ তাঁহারা কাপড় কাচিতেন, সেটা ঠিক। নিজের হাতে কাপড়খানি নিঙড়াইয়া শুকাইয়া লইতেন। ব্রাহ্মণেরা গামছা ব্যবহার করিতেন এবং তেলও মাখিতেন। বৌদ্ধেরা তেল মাখিতেন ও গামছা ব্যবহার করিতেন কি না, কোন পুস্তকে দেখিতে পাই না। ব্রাহ্মণদের অভ্যঞ্জন অর্থাৎ স্নানের পূর্ব্বে মাখিবার অনেক জিনিষ ছিল। আমলকীবাটা তাহাদের মধ্যে একটা। তাঁহারা ঐ দ্রব্য একদিন তৈরী করিয়া দুই তিন দিন ব্যবহার করিতেন। কিন্তু অনেক ধর্ম্ম কর্ম্মের সময় তাঁহারা অভ্যঞ্জন স্নান করিতেন না। স্বামী বিদেশে গেলে স্ত্রীলোকেরা রুক্ষস্নান করিতেন।

বৌদ্ধ ভিক্ষুদের মঠে পাইখানা থাকিত। পাইখানার ভিতর কলসী-ভরা জল থাকিত ও একটা ছোট পাত্র (কুণ্ডি) থাকিত। পাইখানার ভিতর দেয়ালে একটা ডাণ্ডা গোঁজা থাকিত। ভিক্ষুরা সেইখানে কাপড় রাখিতেন। তাঁহারা সেখানে তিনটী মাটির গুলি লইয়া যাইতেন। কার্য্য শেষ হইলে দুইটা গুলির দ্বারা দুই বার শৌচ করিতেন। আর তৃতীয়টী দ্বারা বাঁ হাতটী ধুইয়া ফেলিতেন। তাহার পর বাহিরে আসিয়া সেখানে একখানা ইটের উপর পনেরটী গুলি সাজান থাকিত। সাতটি দ্বারা সাতবার বাঁ হাত ধুইতেন আর সাতটী দ্বারা সাতবার দুই হাত ধুইতেন। অবশিষ্টটির দ্বারা জলপাত্র, বাহু, তলপেট এবং পা ধুইয়া ফেলিতেন। তাহার পর তথা হইতে বাহির হইয়া আসিতেন। তত্তকরগুপ্ত তাঁহার 'আদিকর্ম্মরচনায়' বলিয়াছেন,—

"রত্নত্রয়শরণগতানাং বৌদ্ধানাং প্রত্যূষমারভ্য বর্চ্চোমূত্রকরণাদি যা যা শিক্ষোক্তা ভগবতা বিনয়াদিষু সামান্তেন সা সর্ব্বা উচ্যতে। তথা চ—

কুর্য্যাৎ কৃত্যাং গূঢ়াং প্রাতঃ বর্চ্চপ্রস্রাবকর্ম্মকম্ ।
ততোহপি বহুভিশ্চৈব মৃত্তিঃ প্রক্ষালয়েৎ গুদম্ ॥
বামে পাণৌ ততঃ সপ্ত বিহিতা শুদ্ধয়ে মৃদঃ ।
উভয়োরপি সপ্তৈব পৃথক্ পৃথগবস্থিতাঃ ॥
ইতি হস্তাদি যত্নেন ক্ষালয়েৎ বহুনাম্বুনা ।
শারীপুত্রাদিয়ং শিক্ষা দুষ্কৃতাত্বন্যথা ভবেৎ ॥”

তাহা হইলে বোধ হইতেছে যে, শারীপুত্রের সময় হইতেই ইৎসিং ও ততকরগুপ্তের সময় পর্য্যন্ত একই শিক্ষা চলিয়া আসিতেছিল। হিন্দুদের কিন্তু ব্যাপার অন্যরূপ। তাঁহাদের পাইখানার ব্যবস্থা ছিল না। নগরের প্রান্তে উপস্থিত হইয়া, সেখান হইতে তীর ছুঁড়িলে যেখানে গিয়া পড়ে, সেখানে তাঁহারা শৌচ করিতে যাইতেন। শৌচ কার্য্যটা জলের দ্বারা সাধিত হইত। তাঁহারা দুই হাতেই হাতমাটি করিতেন। কিন্তু যতক্ষণ তৈল ও গন্ধ দূর না হইত, ততক্ষণ হাতে মাটি করিতে ছাড়িতেন না। অন্ততঃ বারো বার হাতে মাটি করিতেন। এখনকার লোকের মতন মাটিতে বাঁহাত ঘষিয়াই কাজ সারিতেন না। স্মৃতিতে যদিও পাইখানার নাম পাওয়া যায় না, অশোক রাজার পাইখানা ছিল। তিনি সেখানেও রাজকার্য্য করিতেন। বল্লালসেনেরও পায়ুক্ষালন-মন্দির ও স্বেদাগার ছিল। প্রস্রাব করিয়া জল নেওয়া উভয় পক্ষেরই বিধি ছিল।

ব্রাহ্মণেরা ঘুম ভাঙ্গিলেই ঠাকুর দেবতার নাম করিয়া উঠেন, অনেকগুলি সংস্কৃত শ্লোক পাঠ করেন,—

লোকেশ চৈতন্যময়াধিদেব
শ্রীকান্ত বিষ্ণো ভবদাজ্ঞয়ৈব।
প্রাতঃ সমুত্থায় তব প্রিয়ার্থং
সংসারযাত্রামনুবর্ত্তয়িষ্যে।

বৌদ্ধেরা প্রাতঃকালে উঠিয়াই “বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি, সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি” ও এই সম্বন্ধীয় অনেকগুলি গাথা পাঠ করেন।

দিনের কাজে বৌদ্ধ ও হিন্দুদের যে ভেদ, তাহা দেখাইলাম। এখন উভয়ের সংস্কারগুলি দেখাইব। হিন্দুদের দশবিধ সংস্কার,—গর্ভাধান, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন, জাতকর্ম্ম, নামকরণ, নিষ্ক্রামণ, অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ, উপনয়ন ও বিবাহ। এখনকার নেপালী বৌদ্ধদের দুইটী মাত্র সংস্কার। একটী পাঁচ বছরে, তাহার নাম ভিক্ষু হওয়া। আর একটী ১৭ বৎসরে—তাহার নাম বজ্রাচার্য্য বা গুভাজু হওয়া। আমাদের সংস্কারের মানে যে, আমরা প্রথম যে কার্য্যটি করিব, সেটি মন্ত্রপূত করিয়া করিব। কোন সংস্কার করিতে হইলে গণপতি পূজন, গৌর্য্যাদি ষোড়শ মাতৃকা পূজা, বসুধারা, অযুষ্য-মন্ত্র জপ ও নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ করিয়া, কুশণ্ডিকা বা বহ্নিস্থাপন করিতে হয়। সেই মন্ত্রপূত বহ্নিকে সাক্ষী করিয়া তাঁহারা প্রথম কার্য্যটী করিয়া থাকেন। গর্ভাধানও তাই, পুংসবনও তাই, সীমন্তোন্নয়নও তাই, বরাবরই তাই। কার্য্যটী যখন করি, তখন মন্ত্র পাঠ করি।

গর্ভাধানের অর্থ বলিয়া দিতে হইবে না। পুংসবনের অর্থ এই যে, সাত মাস গর্ভের সময়—যখন গর্ভস্থ শিশুর পুরুষ বা স্ত্রীচিহ্ন প্রকট হইবার সময় হয়, সেই সময় স্বামী গৌর্য্যাদি পূজা করিয়া, প্রাতঃকালে গ্রামের ঈশান কোণে যে বটগাছ থাকে, তাহারই ঈশান কোণে কোন সুঁয়ার ঠিক নীচে দুটী ফল ধরিয়াছে দেখিয়া, ফলশুদ্ধ সেই সুঁয়াটি কাটিয়া, মাটিতে না ছোঁয়াইয়া, সেইটী বাড়ীতে আনেন,—আনিয়া এমন উঁচু জায়গায় রাখিয়া দেন, যেন মাটি না স্পর্শ করিতে পারে। তাহার পর কোন কোন জিঁয়াচ পোয়াতী আসিয়া সেটি বাঁটিয়া দিলে স্বামী, অগ্নির সমীপে স্ত্রীর পিছনে দাঁড়াইয়া, সেই বাটা বটের সুঁয়া প্রথমে তাহার ডান নাকে ও তৎপর তাহার বাঁ নাকে শোঁকান। সংস্কার, এই কাজ করিলেই পুত্রসন্তান হইবে। জাতকর্ম্মেও এইরূপ নাড়ীচ্ছেদের পূর্ব্বে বহ্নিস্থাপনাস্ত সমস্ত কার্য্য করিতে হয়। তাহার পর নাড়ীচ্ছেদ। কিন্তু ইহাতে প্রায়ই বিলম্ব হওয়া প্রযুক্ত নাড়ী মোটা হইয়া যায়, ছেদেও কষ্ট হয়—বালকেরও প্রাণনাশ হয়। তাই নাড়ীচ্ছেদের পর এ সব কার্য্য হয়। যখন ব্রাহ্মণেরা অগ্নিহোত্রী ছিলেন, অর্থাৎ বাড়ীতে অগ্নিশালা থাকিত এবং সেখানে গার্হপত্য, দক্ষিণ ও আহবনীয়, এই তিন প্রকার আগুন থাকিত, তখন এ সকল দুর্ভোগ ভুগিতে হইত না। গৌর্য্যাদি ষোড়শ মাতৃকার পূজা হইতে আরম্ভ করিয়া বহ্নিস্থাপন পর্য্যন্ত তাঁহাদের করাই থাকিত। সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র বাঁশের চেঁচাড়ী মন্ত্রপূত করিয়া, সেই অগ্নিতে তাতাইয়া অবিলম্বেই নাড়ীচ্ছেদ করা হইত। যতদিন ব্রাহ্মণেরা সাগ্নিক ছিলেন অর্থাৎ এক অগ্নি রক্ষা করিতেন, তাঁহাদেরও এ দুর্ভোগ ভুগিতে হইত না। এ সকল দুর্ভোগ শুধু নিরগ্নিক হইয়াছি বলিয়াই ভুগিতে হয়। নামকরণ, অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণও ঠিক ঐরূপ সংস্কার। বহ্নিস্থাপন পর্য্যন্ত করিয়া, সেই বহ্নির সম্মুখে বসিয়া, মন্ত্র পড়িয়া করিতে হয়। এক উপনয়নের মধ্যে আমরা চারিটা সংস্কার সারিয়া লই। উপনয়ন মানে ছেলেকে গুরুর কাছে লইয়া যাওয়া। গুরু তাহাকে প্রথমে সাবিত্রী উপদেশ দেন—দিন কতক পরে তাহার বেদারম্ভ হয়। বহুকাল পরে তাহার বেদপাঠ সমাপ্ত হইলে তাহার সমাবর্ত্তন হয় অর্থাৎ সে আবার ঘরে ফিরিয়া আসে। আমরা কিন্তু এই চারিটি সংস্কারকেই এক উপনয়ন নাম দিয়া ঘণ্টা দুএকের মধ্যে সারিয়া দিই। বিবাহও এইরূপই সংস্কার। বিবাহ শব্দের আসল মানে—বৌটীকে পিতৃগৃহ হইতে পতিগৃহে বহিয়া লইয়া যাওয়া। কন্যাদান, স্ত্রী আচার, কুশণ্ডিকা, লাজাহোম, অরুন্ধতী দর্শন—এ সকলগুলিই বিবাহটীকে সংস্কার করিবার জন্য, উহাকে মন্ত্রপূত করিয়া পবিত্র ভাবে গ্রহণ করিবার জন্য। নেপালী বৌদ্ধদের মধ্যে এত সব সংস্কার কিছুই নাই। উহাদের একটা সংস্কার আছে গর্ভপরিহার, অর্থাৎ সুপ্রসব হইবে, তাহার জন্য প্রার্থনা। তাহার পর ছেলে ৫।৬ বৎসরের হইলে, সে যে বিহারের ছেলে, সেই বিহারের যিনি সর্ব্বাপেক্ষা বয়সে বড় ভিক্ষু, তাঁহার কাছে লইয়া যাইতে হয়। সে বলে, আমি ভিক্ষু হইব। বুড়াটী বলেন, তুমি হইও না, বড় কষ্ট করিতে হয়—বড় বিধি নিষেধ মানিয়া চলিতে হয়, তুমি ও কাজ পারিবে না, তুমি ছেলে মানুষ। সে বলে, আমি নিশ্চয়ই করিব, নিশ্চয়ই পারিব, আমি শাক্যপুত্র—আমি পারিব না কেন? বুড়াটী তখন একখানি রূপার ক্ষুর বাহির করিয়া, তাহার মাথাটি মুড়াইয়া দেন, আপনার কাছে

রাখেন ও হবিষ্য খাওয়ান। পাঁচ সাত দিন হবিষ্য খাইবার পর সে বলে,—মহাশয়, আমি আর পারি না, আমি মার কাছে যাব। বুড়া তাহাকে আবার বুঝান, তোমার যাওয়া উচিত নয়। কিন্তু সে কিছুতেই মানে না। তখন তাহাকে একটু মদ ও শূকরের মাংস খাওয়াইয়া মায়ের কাছে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। এখান থেকেই সে ভিক্ষু হয়, ঠাকুর-ঘরে যেতে পারে, ঠাকুর ছুঁতে পারে, পুষ্পপাত্রে ফুল সাজাইতে পারে ও পূজার আয়োজন করিয়া দিতে পারে। ইহার পর তাহার আর এক সংস্কার আছে—সেটা সতের বছরের সময়। যদি সে সতর বছরের মধ্যে একেবারে স্ত্রী-সংসর্গ না করে, তাহা হইলে তাহাকে আবার মাথা মুড়াইয়া কতগুলি মন্ত্র পড়িতে হয়, তাহা হইলে সে বজ্রাচার্য্য বা গুভাজু হয়। সে তখন ঠাকুর-ঘরে পূজার অধিকারী হয়, তাহার পাঁচটী অভিষেক হয়,—মুকুটাভিষেক, ঘণ্টাভিষেক, মন্ত্রাভিষেক, সুরাভিষেক, পট্টাভিষেক। তখন সে পুরা বজ্রাচার্য্য হয় এবং সকল প্রকার ধর্ম্মকার্য্যেই তাহার অধিকার হয়। কিন্তু যদি সতের বছরের আগে স্ত্রীসংসর্গ করে, তাহা হইলে সে কখনও বজ্রাচার্য্য হইতে পারে না, তাহার বংশও ভিক্ষু থাকিয়া যায়। উহাদের বিবাহ সংস্কার নহে। বিবাহ মানে শক্তিগ্রহণ অর্থাৎ যোগমার্গে ও জ্ঞানমার্গে যাইবার জন্য শক্তি সঞ্চয় করা। মোটামুটি ভিক্ষুদের বিবাহ আগে একটা গাছের সঙ্গে হয় অথবা ফলের সঙ্গে হয়। তাহার পর সে যাহাকে শক্তি বলিয়া গ্রহণ করে, তাহারই সঙ্গে থাকে, স্ত্রীপুরুষের ন্যায় থাকে; ছেলেপুলে হয়, গৃহস্থালী করে। দুই প্রকার বিবাহের বা শক্তি-গ্রহণের প্রণালী আমি পাইয়াছি,—একটী ত ভদ্রসমাজে প্রকাশ করিবার মত নহে। বৌদ্ধেরা কিন্তু বলে—এ সব কেতাবী কথা, কাজের নয়; আমাদের আসল শক্তিগ্রহণ ওরূপ নয়।

এই ত গেল নেপালী ভিক্ষুদের কথা—ইহারা সব গৃহস্থ হইয়া গিয়াছে, একটীও আসল সন্ন্যাসী নাই। শেষ আসল ভিক্ষু একশত বৎসরের উপর হইল মরিয়া গিয়াছেন—তাঁহার পর সবই এক হইয়া গিয়াছে। ভিক্ষুর ছেলে ভিক্ষু হয়—বজ্রাচার্য্যের ছেলে বজ্রাচার্য্য হয়, কিন্তু বৌদ্ধদের আসল বজ্রাচার্য্য অনেক উচ্চে। যে কেহ বৌদ্ধ হইবে,—গৃহস্থই হউক, ভিক্ষুই হউক, তাহাকে প্রথম পঞ্চ শীল গ্রহণ করিতে হইত। আমি প্রাণিহিংসা করিব না, না দিলে পরের জিনিষ লইব না, ব্রহ্মচর্য্য খণ্ডন করিব না, মিথ্যাকথা বলিব না, সুরা, মৈরেয় ও মদ্য পান করিব না। যাহারা এই সকল শীল গ্রহণ করিয়া অভ্যস্ত হইয়া যাইত, তাহাদিগকে আরও তিনটী শীল দেওয়া হইত,—কটুবাক্য বলিব না, গান বাজনা করিব না, স্রক্‌চন্দনাদি ব্যবহার করিব না। গৃহস্থেরা কিন্তু ইহার অধিক শীল লইতে পারিবে না। ইহার অধিক আর দুইটী শীল শুধু ভিক্ষুদের জন্য—একটী উচ্চাসন ও মহাসন ত্যাগ ও একটী রজতকাঞ্চন ত্যাগ, স্থবিরবাদে অর্থাৎ দক্ষিণী বৌদ্ধদের শেষ ও চরম; কিন্তু উত্তর দেশের বৌদ্ধদের ইহার উপরও কিছু আছে। তাঁহারা শীলকে সম্বর বলেন—এই দশটা শীল তাঁহারা অষ্ট সম্বর করিয়া তুলিয়াছেন; নবম সম্বরের নাম বোধিসত্ত্বসম্বর।

তত্ত্বকরগুপ্ত রত্নত্রয় শরণের কথা বলিয়া বলিতেছেন,—"অনেনৈব রত্নত্রয়শরণেন বৌদ্ধ ইতি গীয়তে। ইদঞ্চৈতৎ রত্নত্রয়শরণং বৌদ্ধদর্শনস্য উপাসকাদিসর্ব্বসম্বরানাং বীজভূতম্। সম্বরা-

শৈক্ষতানি (?) কতিসংখ্যান্তে সম্বলা উচ্যন্তে বিভাষায়াম্। উপাসকাদিপোষধান্তা অষ্টৌ। বোধিসত্ত্বমহাযানে পূর্ব্বোক্তা এব অষ্টৌ বোধিসত্ত্বসম্বলো নবমঃ অগ্রনয়মহাযানে পূর্ব্বোক্তা এবং নব বজ্রব্রতসম্বরো দশমঃ তত্র উপাসক-উপাসিকা শ্রামণের ভিক্ষু শ্রামণেরী শিক্ষমাণা ভিক্ষুণী ত্রিসপ্তানাং স্ত্রীপুরুষাশ্রয়ভেদাৎ সপ্তসম্বরাঃ।”

তাহা হইলে বুঝা গেল, হীনযানী বৌদ্ধ অপেক্ষা মহাযানীদের আরও দুইটা সম্বল আছে। একটা বোধিসত্ত্বসম্বল, আর একটা বজ্রব্রতসম্বল। বোধিসত্ত্বসম্বল বলিতে গেলে নিশ্চয়ই বুদ্ধত্ব লাভ করিব, এরূপ দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। বজ্রব্রতসম্বল অর্থাৎ আমি শূন্য হইয়া গিয়াছি, এই ধারণা। বজ্র বলিতে গেলে শূন্যতাকেই বুঝায়।

বৌদ্ধ ও হিন্দুদের সংস্কারের কথা সব বলা হইল। এখন উহাঁদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার কথা। অগ্নিহোত্রী ব্রাহ্মণেরা উহাকে ইষ্টি বলিতেন। অগ্নিত্রয়সাধ্য যাগের নাম ইষ্টি। সাগ্নিকেরাও ইষ্টি করিতেন, কিন্তু তাঁহারা একাগ্নিতেই কার্য্য করিতেন। আমাদের এখন বহ্নি স্থাপন করিয়া, উহাকে মন্ত্রপূত করিয়া দাহ করিতে হয়। যতক্ষণ পর্য্যন্ত শবদাহ না হয়, ততক্ষণ সেই শব আত্মীয় স্বজন ভিন্ন কেহ স্পর্শ করিতে পারে না, অন্ততঃ আপনার জাতির লোক ভিন্ন অন্য কেহ স্পর্শ করিতে পারে না। শব স্পর্শ করিলেই অশৌচ হয়, যাহারা দহন বহন করে, তাহাদেরও অশৌচ হয়। চুল্লীটী ভাল করিয়া পরিষ্কার করা, যাহারা শবদাহ করে, তাহাদের প্রধান কর্ত্তব্য। যদি একখানি কয়লা চুল্লীতে পড়িয়া থাকে, তাহা হইলেও তাহাদের প্রত্যবায় হয়। সাধারণ লোকের সংস্কার, চুল্লীটি পরিষ্কার করিলে আর জন্মে লোকটী ফর্সা হয়, আর যদি একখানিও কয়লা পড়িয়া থাকে, তবে তাহার গায়ে তিল হয়। চুল্লী অপরিষ্কার রাখিলে সে লোকটা কাল হয়। দাহকারীদের আর একটা প্রধান কর্ত্তব্য, শবের যে অংশ পোড়ে না, সে অংশ গভীর জলে ফেলিয়া দেওয়া ও অস্থি সঞ্চয় করিয়া দূর জলে ফেলিয়া দেওয়া।

আমরা শবকে অশুচি মনে করি, অস্থিকেও অশুচি মনে করি। তাই হাড় ছুঁইলেই আমাদের স্নান করিতে হয়। বৌদ্ধেরা কিন্তু সেরূপ করেন না। শুধু হাড় নয়—আমরা নখ, চুল কাটা হইয়া গেলে তাহাকে অস্পৃশ্য মনে করি—তাহা ছুঁইলেও আমাদের অশৌচ হয়। বৌদ্ধেরা কিন্তু এই নখ, চুল ও হাড়কে পরম পবিত্র বলিয়া মনে করেন, তাহাকে চিরস্থায়ী করিবার জন্য পাথরের বাক্স বা কৌটায় পুরিয়া রাখেন এবং তাহার উপরে বড় বড় স্তূপ নির্ম্মাণ করেন, স্তূপের চারিদিকে প্রদক্ষিণ করেন, স্তূপের পূজা করেন, স্তূপের চারিদিকে দিওয়ালা দেন। এই জায়গায় বৌদ্ধ হিন্দুতে বড়ই তফাৎ। বৌদ্ধদের শব অনেক সময় ফেলিয়া দেয়, অনেক সময়ে শ্মশান-রক্ষকের নিকট পোড়াইবার জন্য কিছু পয়সা দিয়া আসে। কিন্তু বড়লোক মরিলে খুব জাঁক করিয়া, সে দেহ তৈলদ্রোণীতে পুরিয়া দাহ করে এবং হাড়গুলি পুঁতিয়া, তাহার উপর স্তূপ নির্ম্মাণ করে। বুদ্ধদেবের হাড়গুলি প্রথম আট ভাগ হইয়া যায় ও আট জায়গায় স্তূপ হয়। রাজা অশোক তাহাদের মধ্যে সাতটির ‘সলিলনিধান’ উঠাইয়া, তাহার চৌরাশী হাজার ভাগ করেন এবং তাহার উপর চৌরাশী হাজার স্তূপ নির্ম্মাণ করেন। নেপালে এখনও অনেকগুলি স্তূপ অশোক-

স্তূপ বলিয়া পরিচিত। সাহেবেরা বলেন,—ওগুলিকে অশোকের বলিতে দ্বিধা করা উচিত নয়। কারণ, উহাদের পরিমাণ অশোক-স্তূপের মত ও উহাদের মাল-মসলাও অশোক-স্তূপের মত। তাহার পর শ্রাদ্ধ। অগ্নিহোত্রীরা পিতৃপিণ্ড নামে যজ্ঞ করিতেন। উহা অগ্নিত্রয়সাধ্য। সাগ্নিক ও নিরগ্নিকেরা শ্রাদ্ধ করিয়া থাকেন। শ্রাদ্ধ মানে—মৃতের উদ্দেশে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক অন্ন, বস্ত্র ও পিণ্ডদান। ইহা সমস্তই বেদমন্ত্রে হইয়া থাকে। শ্রাদ্ধ নানা রকম আছে—প্রেতশ্রাদ্ধ, মাসিক শ্রাদ্ধ, সপিণ্ডীকরণ, পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ, অমাবস্যা শ্রাদ্ধ, নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ; একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ ইত্যাদি। ভূতের ভয়ে অনেকরূপ শ্রাদ্ধ করিতে হয়। সে শ্রাদ্ধ যে কেহ করিতে পারে—তাহার অধিকারী, অনধিকারী নাই। ইহার মধ্যে প্রধান ত্রিপিণ্ড শ্রাদ্ধ। যব, মাষ ও তিল,—এই তিনের ত্রিপিণ্ড করিতে হয়। তত্তকরগুপ্তের মতে বৌদ্ধেরাও নানারূপ শ্রাদ্ধ করে। তিনি বলেন, ভগবান্‌ গৃহস্থাশ্রমীদের জন্য শ্রাদ্ধেরও ব্যবস্থা করিয়াছেন। অতএব তাহার বিধি বলিতেছি। নিত্যশ্রাদ্ধের সময় বলিতে হয়। বোধিসত্বচর্য্যা গ্রহণ করিয়া বুদ্ধেরা যেমন পূর্ব্বে শ্রাদ্ধ করিয়াছিলেন, আমিও সেইরূপ করিব—"ওঁ অদ্য অমুক মাসে, অমুক তিথিতে অমুক গোত্রে পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ, তাঁহাদের পত্নীদের ও অতিথিদের জন্য বজ্রতণ্ডুল হইতে উৎপন্ন সঘৃত অন্ন আঃ হুং স্বাহা," এইটী তিনবার পাঠ করিয়া দিবেন। তাহার পর সেই বুদ্ধেরা যেমন সকল পুণ্য কর্ম্মের পরিণামস্বরূপ সম্যক্ সম্বোধি লাভ করিয়াছিলেন, আমিও সেইরূপ করিব। আমার এই পুণ্য মোক্ষের হেতু হইবে। পার্ব্বণশ্রাদ্ধ ও অপরপক্ষের শ্রাদ্ধেও এই বিধান। একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধে যাহার শ্রাদ্ধ, কেবল তাহারই নাম গোত্র উচ্চারণ করিবে, আর সকলই পূর্ব্বের মত। নান্দীমুখ শ্রাদ্ধও এইরূপে করা যায়। কোথায় হাঁটু পাতিতে হইবে, কোথায় হাত মুখ রাখিতে হইবে, কোথায় তিল কুশ গ্রহণ করিতে হইবে—এই সব নিজেই বিচার করিয়া লইতে হইবে।

ব্রাহ্মণভোজন ও সঙ্ঘভোজন

ব্রাহ্মণেরা ছোঁয়া লেপাটা বড়ই দোষ মনে করেন। পৈতা হওয়ার দিন হইতে ব্রাহ্মণের ছেলেরা ব্রাহ্মণ হয়। সেই দিন থেকে তাহারা কাহারও এঁটো খায় না এবং কেউ ছুঁলেও খায় না। সুতরাং ব্রাহ্মণভোজনে প্রত্যেক ব্রাহ্মণকে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র আসন দিতে হয় ও মাঝখানে একটু ফাঁকও রাখিতে হয়। জলপাত্র ডান দিকে দিতে হয়। যাতে ছোঁয়া লেপা না হয়, সে জন্য বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হয়।

ইৎসিং বলেন, সে কালে ভারতবর্ষে সঙ্ঘভোজনেও এরূপ করা হইত। সাত ইঞ্চি উঁচু পিড়ীর উপর বসিয়া, উঁবু হইয়া (আসনপীড়ি হইয়া বসা দোষ) বসিয়া তাঁহারা খাইতেন। দুখানা পিড়ীর মধ্যে অন্ততঃ এক ফুট জায়গা খালি থাকিত। ব্রাহ্মণভোজনে সকলের পাতে পরিবেষণ না হইলে ব্রাহ্মণেরা খাইতে পারিতেন না। এবং খাইতে বসিয়া মাঝে কেউ উঠিয়া যাইতেন না। কিন্তু সঙ্ঘের লোকেরা যাঁর পাতে যখন পরিবেষণ হইত, অমনি খাইতে পারিতেন, অন্য লোকের জন্য অপেক্ষা করিতে হইত না। ব্রাহ্মণেরা খাইতে বসিয়া জল খাইতে হইলে

ঘটী বাঁ হাতে ধরিয়া আলগোছে জল খান, অথবা ডান হাতে ধরিয়া চুমুক দিয়া খান। বৌদ্ধেরা বাঁ হাতে চুমুক দিয়া জল খাইতেন। ইৎসিং বলেন, তিনি বৌদ্ধদের সম্বন্ধে যাহা বলিতেছেন, সমস্তই বুদ্ধদেবের বহি হইতে বলিতেছেন। তা'হলে সঙ্ঘভোজনেও ব্রাহ্মণদের মত এত ছোঁয়া লেপা ছিল না। কিন্তু আমি ১৮৯৮ সালে এক সম্যক্ সম্ভোজনে উপস্থিত ছিলাম। নেপালের সমস্ত বিহারে যত সঙ্ঘ ছিল, সব সেখানে উপস্থিত ছিল—প্রায় ১৩ হাজার ভিক্ষু একত্র খাইতেছিলেন। তাঁহাদের কিন্তু সব ছোঁয়া লেপা। সারি সারি চাদর বিছাইয়া বসিয়াছেন। একের চাদরের উপর আর একজনের চাদর পড়িয়াছে। যত বড় মানুষের সারি, চাদরও তত বড়। চাদরে যা পড়িতেছে, খাওয়ার হইলে ভিক্ষুরা তাহা তখনই খাইতেছেন; ভাত, ব্যঞ্জন, লুচি, পরটা, মুলো সিদ্ধ, ডাল—সব সেখানে বসিয়াই খাইতেছেন,—কড়ি, পয়সা, চাল, সুপারি, এলাচ, লবঙ্গ প্রভৃতি যাহা বসিয়া খাবার জিনিষ নয়, সেগুলি পাতে রহিতেছে,—যাবার সময় সঙ্গে লইয়া যাইবেন। তাহা হইলে আর ছোঁয়া লেপার বাকি কি রহিল? আমাদের দেশে পালি পার্ব্বণে গঙ্গাতীরে দেখিয়াছি—ভিখারী বৈষ্ণবেরা ওরূপ করিয়া চাদর বিছাইয়া বসে, তাহাদের কিন্তু রান্না খাবার কেউ দেয় না; দেয়—চাল, ডাল, কড়ি, পয়সা, ফল। ইহাদিগকে যেমন সকলেই কিছু কিছু দেয়, সম্যক্ সম্ভোজনে কিন্তু ঠিক সেরূপ নহে। দানপতি (আমরা ইহাঁকে কৃতী বলি) সকলকেই পরিতোষ করিয়া দিবেন, একজনকেও ফাঁক্ রাখিতে পারিবেন না। অন্যান্য বৌদ্ধেরা—তাঁহারা গৃহস্থই হউন, ভিক্ষুই হউন বা শুভাজুই হউন, সকলেই দান করিবার জন্য কিছু কিছু লইয়া আসিবেন। একজনে হয় ত এক মণ চাউল লইয়া আসিয়াছেন; তাহাতে যত জনকে দেওয়া হয়, দেওয়া হইল। তার পর তিনি চলিয়া গেলেন। একজন হয় ত সুপারি লইয়া আসিয়াছেন। পাঁচ হাজারটী সুপারি পাঁচ হাজার লোককে দিলেন। বাকি ৭ হাজারকে দিতে পারিলেন না—তিনি চলিয়া গেলেন। সম্যক্ সম্ভোজনের অধ্যক্ষকে জিজ্ঞাসা করিলাম, এক একজন লোক কি পাইল? তিনি বলিলেন, রান্না জিনিষ ত তাহারা খাইয়া ফেলিয়াছে। তাহার উপর নগদে ও জিনিষে প্রত্যেকে সাড়ে দশ আনা করিয়া পাইয়াছে।

আমি এ পর্য্যন্ত হিন্দু ও বৌদ্ধদের যে তুলনামূলক সমালোচনা করিলাম, ইহার উদ্দেশ্য, এ দুয়ে কতটুকু তফাৎ, তাহার কিছু সন্ধান দেওয়া। পূর্ণ সমালোচনা অত্যন্ত দুঃসাধ্য। কারণ, আচার-ব্যবহার সব দেশে সমান নয়—এই আড়াই হাজার বৎসরের মধ্যে কত জায়গায় যে কত বদল হইয়াছে, তাহার ঠিকানা নাই। হিন্দু বলিতে গেলেও অসংখ্য জাতি, অসংখ্য ধর্ম্ম বুঝায়। বৌদ্ধ বলিতে গেলেও তাই। তবে মোটামুটি কথা এই, বৌদ্ধেরা গুরু মানে, গুরুকে দেবতার চেয়ে বড় ব'লে মানে, গুরুপদ পরমপদ ব'লে মনে করে। গুরুকে তন-মন-ধন কিছুই দিতে দ্বিধা করে না, আর সম্পূর্ণরূপে গুরুর মত হইতে চায়, গুরুই শূন্য, গুরুই পরমার্থ। শূন্য যেমন শূন্যে মিশাইয়া যায়, গুরুও তেমনি শূন্যে মিশাইয়া গিয়াছেন। আমরাও তেমনি গুরুতে—শূন্যে মিশাইয়া যাইব। এরূপ মত—আমরা এখন যাঁহাদিগকে হিন্দু বলি, তাঁহাদের মধ্যেও অনেক আছে।

ভতকরগুপ্ত বলিয়াছেন,—"গুরুর্বুদ্ধো গুরুর্ধর্ম্মো গুরুঃ সংঘঃ প্রকীর্ত্তিতঃ। স্বয়ং তথাগতির্যস্মাৎ গুরুরেবাত্র কারণম্॥ সংবুদ্ধেভ্যো যথাদত্তে ফলং তথা। তেনৈব সূত্রতন্ত্রেষু গুরুপূজা প্রকাশ্যতে। প্রদত্তে পুনরন্যেভ্যঃ ফলং পাত্রানুরূপকম্। বিনয়েষ্বপি সূত্রেষু তন্ত্রেষ্বপি জগৌ মুনিঃ॥"

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী

প্রাণিবিজ্ঞান-বিষয়ক পরিভাষা*

(১) কোষবিজ্ঞান (Cytology)

Achromatic spindle, Achromatic figure—ভাজনতুরী, তুরীমণ্ডল, তুর্য্যাবস্থা।
Achromatin, linin—ধারণ পদার্থ।
Acrosome—মুকুট।
Amitosis—সরল ভাজন।
Amphiaster, diaster—দ্বিতারকাবস্থা।
Amphinucleolus—মিশ্রগুলিকা, মিশ্রবিন্দু।
Anaphase—তন্তুচলনাবস্থা।
Archoplasm—তুরীতন্তু পদার্থ
Aster—অংশুখণ্ড, অংশুমণ্ডল।
Bivalent chromosome—যুগ্মজ রঞ্জনতন্তু।
Bud variation—মৌকুর ভাবান্তর।
Cell—কোষ।
Cell membrane, cell wall—কোষাবরণ।
Central fusion nucleus—মধ্যস্থ মিলিত কোষসার।
Central spindle fibres—মধ্য তুরীতন্তু।
Centriole—আকর্ষণ কেন্দ্র।
Centrosome—আকর্ষণ গোলক।
Centrosphere, attraction sphere—আকর্ষণীবেষ্ট।
Chondriocont, plastocont—দৃঢ় তন্তু।
Chondriomite—দৃঢ় মালিকা।
Chondriosome, plastosome—দৃঢ়বস্তু।
Chromatin—রঞ্জনবস্তু।
Chromidia—রঞ্জন কণিকা, সার কণিকা।
Chromidiogamy—কণিকাসঙ্গম।
Chromomere—তন্তুপর্ব্ব।
Chromosome—রঞ্জনতন্তু।
Cytaster—ভেদন কেন্দ্র।
Cytoplasm—কোষবস্তু।
Daughter plate—ভেদজ পট্ট।
Diarinesis—ভিন্নতন্তবস্থা।
Diplotene stage—দ্বিতন্তবস্থা।
Equatorial plate—বিদার পট্ট।
Gametogenesis—জনন-কোষোৎপাদন।
Germinal vesicle—ডিম্বকোষসার।
Idiochromatin—জননরঞ্জনবস্তু।
Idioplasm—কুলবহ বস্তু, তেজঃ বস্তু।
Idiosome—স্বতন্ত্র গুলিকা।
Karyogamy—কোষসার সঙ্গম।
Karyolymph—সাররস।
Karyomere—সারখণ্ড।
Karyosome—রঞ্জন পিণ্ড, রঞ্জন গুলিকা।
Kinetonucleus—চালন কোষসার।
Leptotene stage—সূক্ষ্মতন্তবস্থা।
Macrogomete—ডিম্বকোষ।
Macronucleus—বৃহৎ কোষসার।
Mantle fibres—আকর্ষণ তন্তু।
Meiosis—সংখ্যার্দ্ধীভবন।
Metaphase—তন্তুভেদাবস্থা।
Metaplastic bodies—জাতবস্তু।
Microgamete, spermatozoon—শুক্র-কোষ, পুংবীজাণু।

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ত্রিংশ বার্ষিক দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

Micronucleus —অণুকোষসার।
Mitochondria, Plastachrondria—দৃঢ়কণা।
Mitosis, Karyokinesis—জটিল কোষভেদ, জটিল কোষভাজন।
Monaster—এক তারকাবস্থা।
Multipolar mitosis—বহুমেরুক কোষ-ভাজন।
Nuclear membrane—কোষসারাবরণ।
Nucleolus—সারচিহ্ন, সারগুলিকা।
Oogonia – আদ্যডিম্বকোষ।
Nucleus—কোষসার।
Oocyte—আর্ত্তবকোষ। Ovum, macro-gamete—ডিম্বকোষ।
Pachytene stage,—স্থূলতন্ত্বস্থা।
Parasynclesis, parasynapsis—পার্শ্ব-মিলন।
Parthenogenesis—অসঙ্গমোৎপত্তি।
Plasmosome—রসগুলিকা।
Plastin—যোজন বস্তু।
Plastochondria = mitochondria.
Plastocont = chondriocont.
Plastosome = chondriosome.
Polar body—মেরুকণা।
Piochromosome—আদ্যতন্তু।
Pronucleus—পুরঃকোষসার।
Prophase—তন্তুগঠনাবস্থা।
Protoplasm—জীববস্তু।
Segregation—পৃথগ্‌ভবন।
Spermatid—আদ্যশুক্র-কোষ।
Spermatocyte—শুক্রকোষ।
Spermatogonium—আদ্যজননশুক্রকোষ।
Spindle fibres তুরীতন্তু।
Spireme—তন্তুজাল।
Strepsitene stage – জড়িততন্ত্বস্থা।
Structure, reticular—জাল গঠন।
„ fibrillar – তন্তুময় গঠন।
„ granular—কণাময় গঠন।
„ alveolar—কোষ্ঠময় গঠন।
Syndesis—ক্ষণিক বা সাময়িক মিলন।
Syngamy—সঙ্গম।
Synizesis—রঞ্জনসঙ্কোচ, একত্রীভবন।
Telophase—পুনর্গঠনাবস্থা।
Trophochromatin পোষণ রঞ্জনবস্তু।
Trophonucleus—পোষণ কোষসার।
Zygotene stage—তন্তুমিলনাবস্থা।

শ্রীএকেন্দ্রনাথ দাস ঘোষ

—o—

হিন্দু রাজনীতি-শাস্ত্রে মণ্ডলের সংস্থান ও গুরুত্ব*

প্রাচীন ভারতের রাষ্ট্রনীতিবিষয়ক নিবন্ধ-লেখকগণ পরস্পর সন্নিহিত কতকগুলি রাজ্যের সমষ্টিকে মণ্ডল নামে অভিহিত করিয়াছেন। আমরা এই প্রবন্ধে প্রধানতঃ অর্থশাস্ত্রে বর্ণিত মণ্ডলের স্বরূপ ও গুরুত্বের বিষয় আলোচনা করিয়া, প্রসঙ্গক্রমে প্রচলিত কয়েকটী মতের অযৌক্তিকতা প্রতিপাদন করিব। পুরাণ, মহাভারত, মনুসংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থে মণ্ডলের বিবরণ থাকিলেও তাহা এতই সংক্ষিপ্ত যে, তদ্দ্বারা এত দিন উহার প্রকৃত গুরুত্ব বুঝা যাইত না। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র প্রকাশের পর এখন আমরা বুঝিতে পারিতেছি, এই মণ্ডলের কল্পনা প্রাচীন যুগের রাজা ও রাজনৈতিকগণের পক্ষে কত দূর উপকারী হইয়াছিল।

প্রত্যেক রাজ্যেরই পার্শ্ববর্ত্তী রাজ্যগুলির সহিত মৈত্রী বা শত্রুতা, কোনরূপ সম্বন্ধ থাকা স্বাভাবিক। সান্নিধ্যবশতঃ নানা কারণে রাজ্যগুলির একটিকে অপরটির সম্পর্কে আসিতে হয় এবং অবস্থা বুঝিয়া বিভিন্ন রাজ্য সম্বন্ধে বিভিন্নরূপ নীতির আশ্রয় লওয়া আবশ্যক হইয়া পড়ে। কি অবস্থায় কোন্ রাজ্য সম্বন্ধে কিরূপ নীতি অবলম্বিত হইতে পারে, তাহা বিচার করিবার সুবিধার জন্য অতি প্রাচীন কাল হইতেই হিন্দু রাজনীতিবিশারদগণ মণ্ডলের কল্পনা করিয়াছেন।

মণ্ডলের উদ্দেশ্য।

তাঁহারা অভিজ্ঞতার ফলে বুঝিয়াছিলেন, প্রতিবেশী রাজ্যগুলির মধ্যে যে সকল রাজনৈতিক সমস্যার উদ্ভব হওয়ার সম্ভাবনা, তাহা সমাধানের জন্য সাধারণতঃ ১২টী রাজ্যের কথা চিন্তা করিলেই পর্য্যাপ্ত হইতে পারে। এই জন্য প্রচলিত মতে নিকটবর্ত্তী ১২টী রাজ্যের সমষ্টিকে একটী মণ্ডল বলিয়া গণ্য করা হয়। এই স্থলে মনে রাখা আবশ্যক যে, মণ্ডল একটি কল্পিত বস্তু মাত্র। অবস্থার বৈচিত্র্য অনুসারে বার অপেক্ষা ন্যূন বা অধিকসংখ্যক রাজ্য লইয়াও মণ্ডল সৃষ্ট হইতে পারিত। এই জন্যই কামন্দকীয় নীতিসারে (৮, ২৮-২৮) এ সম্বন্ধে বিভিন্ন মতের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

অর্থশাস্ত্রকর্ত্তারা মণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত রাজ্যগুলির সংস্থান অনুসারে এক একটি নাম নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সুবিধার জন্য একজন রাজাকে কেন্দ্রস্বরূপ ধরিয়া লইয়া, তাহার নামকরণ করা হইয়াছে 'বিজিগীষু'। এই বিজিগীষুর সম্মুখ দিকে অবস্থিত পর পর পাঁচজন রাজার নাম 'অরি', 'মিত্র', 'অরিমিত্র', 'মিত্রমিত্র', ও 'মিত্রারিমিত্র' এবং পশ্চাৎদিকে অবস্থিত চারিজন রাজার নাম যথাক্রমে 'পার্ষ্ণিগ্রাহ', 'আক্রন্দ', 'পার্ষ্ণিগ্রাহাসার' ও 'আক্রন্দাসার'। ইহা ছাড়া 'বিজিগীষু'র পার্শ্ববর্ত্তী আরও দুইজন বলবান্ রাজাকে যথাক্রমে 'মধ্যম' ও 'উদাসীন' সংজ্ঞায় অভিহিত করা হয়। সর্ব্বসমেত এই বারজন রাজার রাজ্য লইয়া একটি মণ্ডল পরিকল্পিত হইয়াছে।

মণ্ডল-কল্পনা।

---

* রাধানগরে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের পঞ্চদশ অধিবেশনের ইতিহাস-শাখায় পঠিত।

'বিজিগীষু' এই নামটির ব্যুৎপত্তির দিকে অত্যধিক দৃষ্টি রাখিলে ইহার প্রকৃত অর্থ বুঝিবার সুবিধা হয় না। যে রাজা যুদ্ধে 'জয় ইচ্ছা করেন', তিনিই 'বিজিগীষু'—এইরূপ ভাবিলে নিতান্ত ভুল করা হইবে। প্রকৃতপক্ষে যে রাজাকে কেন্দ্র করিয়া মণ্ডলের কল্পনা করা হয়, রাজনীতিশাস্ত্রে তাহারই নাম দেওয়া হইয়াছে 'বিজিগীষু'। এইরূপ না হইলে যুদ্ধের সময় ব্যতীত অন্য সময়ে আর মণ্ডলের অস্তিত্ব স্বীকার করা যাইত না; অথচ শাস্ত্রে দেখা যায়, শান্তির সময়েও মণ্ডলের শক্তি বিচার করিয়া কার্য্য করাইতে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। সাধারণতঃ দুইটী অব্যবহিত প্রদেশের অধিপতির মধ্যে নানা কারণে প্রায়ই বাদ-বিসম্বাদ ঘটিয়া থাকে। এই হেতু অব্যবহিত সান্নিধ্যকেই একের প্রতি অন্যের শত্রুতার কারণরূপে ধরিয়া লইয়া, বিজিগীষুর ঠিক পরবর্ত্তী রাজাকে 'অরি' নাম দেওয়া হইয়াছে। এই নিয়মে 'অরির' পরবর্ত্তী রাজা সান্নিধ্যহেতু তাহার অরি হওয়ার কথা, সুতরাং তাহাকে বিজিগীষুর 'মিত্র' বলা হয়। এইরূপে মিত্রের পরবর্ত্তী রাজা 'অরিমিত্র', তৎপরবর্ত্তী 'মিত্রমিত্র' এবং তাহার পরে 'মিত্রারি-মিত্রের' স্থান কল্পিত হইয়া থাকে। এই পাঁচজন রাজার রাজ্য বিজিগীষুর সম্মুখভাগে অবস্থিত। পশ্চাৎদিকেও চারিটী রাজ্যের স্থান ধরিয়া লওয়া হয়। প্রথম রাজা 'বিজিগীষু'র সন্নিহিত, সুতরাং শত্রু; কিন্তু সম্মুখে অবস্থিত অরির সহিত পার্থক্য রাখিবার জন্য ইহার নাম করা হইয়াছে 'পার্ষ্ণিগ্রাহ'। পার্ষ্ণি অর্থাৎ পশ্চাৎদিক্ হইতে আক্রমণ করার সম্ভাবনা আছে বলিয়াই ইহার এইরূপ নাম। পূর্ব্বোক্ত নিয়মে পার্ষ্ণি-গ্রাহের পরবর্ত্তী রাজা অবশ্যই তাহার শত্রু, সুতরাং 'বিজিগীষু'র মিত্র। পার্ষ্ণিগ্রাহের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য বিজিগীষু ইহাকে 'আক্রন্দন' অর্থাৎ আহ্বান করেন, অতএব ইহার নাম 'আক্রন্দ'। ইহার পরবর্ত্তী রাজা পার্ষ্ণিগ্রাহের মিত্র এবং তৎপরবর্ত্তী আক্রন্দের মিত্র। ইহারা বিপদের সময় নিজ নিজ বন্ধুর প্রতি 'আসার' অর্থাৎ সাহায্য প্রদানের জন্য দ্রুত গমন করে বলিয়া ইহাদের নাম যথাক্রমে 'পার্ষ্ণিগ্রাহাসার' এবং 'আক্রন্দাসার'। এই সকল স্থলে সমীপবর্ত্তিতাকেই শত্রুতার কারণ ধরিয়া, অব্যবহিত প্রদেশের অধিপতিকে অরি এবং তৎপরবর্ত্তীকে মিত্র স্থির করা হইয়াছে; কিন্তু ইহা স্বাভাবিক হইলেও অব্যভিচারী নিয়ম নহে। সোমদেব সূরি তাঁহার নীতিবাক্যামৃতে ষাড়্‌গুণ্যসমুদ্দেশ প্রকরণে বলিয়াছেন,—"কার্য্যং হি মিত্রত্বামিত্রত্বয়োঃ কারণং, ন পুনর্বিপ্রকর্ষসন্নিকর্ষৌ।" অনেক সময়ে কার্য্যনিবন্ধন শত্রুতা বা মিত্রতা জন্মে। দূরত্ব বা সান্নিধ্য উহার কারণ হইতে পারে না। কৌটিল্যের মতানুসারেও সান্নিধ্য ব্যতীত অন্য কারণে শত্রুতা জন্মিতে পারে (৭ অধিকরণ)। কামন্দকীয় নীতিসারেও (৮, ১৪) একই বস্তু প্রাপ্তির জন্য আগ্রহশীল ব্যক্তিগণকে পরস্পরের শত্রু বলা হইয়াছে। সুতরাং সকল সময়ে সান্নিধ্যই শত্রুতার কারণ হয় না। এই স্থলে ইহাও বলা আবশ্যক যে, বিজিগীষুর সম্মুখভাগ বা পশ্চাদ্‌ভাগ একটা কল্পনা মাত্র। ইহা দ্বারা এই মাত্র বুঝা যায় যে,—যে দিকে অরির অবস্থিতিস্থান থাকিবে, সেইটাকেই সম্মুখ বলিয়া ধরিতে হইবে, এবং তাহার বিপরীত দিক্ হইবে পশ্চাদ্‌ভাগ।

'অরি', 'বিজিগীষু' প্রভৃতির স্থান ও নাম নির্দ্দেশ।

এখন মণ্ডলের মধ্যে 'অরি' ও 'বিজিগীষু' এই দুইজন প্রধান প্রতিপক্ষ এবং তাহাদের প্রত্যেকের চারিজন করিয়া সহায়, এই দশজন রাজার পরিচয় পাওয়া গেল। অবশিষ্ট দুই জন—'মধ্যম' ও 'উদাসীন' ভিন্ন-লক্ষণাক্রান্ত। ইহাদের সম্বন্ধে বড় একটা ভ্রান্ত ধারণা চলিয়া আসিতেছে। এই নাম দুইটি এমন ভ্রান্তিজনক যে, প্রসিদ্ধ পণ্ডিতদিগের গ্রন্থেও ইহাদের ঠিক স্বরূপ নির্ণীত হয় নাই। তাঁহারা 'মধ্যম'কে বিবাদের মীমাংসাকারী মধ্যস্থরূপে বর্ণনা করিয়াছেন এবং "উদাসীন"কে নিরপেক্ষ রাজা বলিয়া ভাবিয়াছেন। বাস্তবিক তাহা নহে। মণ্ডলস্থিত অপর রাজারা সকলেই সময়বিশেষে বিবাদের মীমাংসা করিয়া দিতে পারে অথবা নিরপেক্ষ থাকিতে পারে। প্রকৃতপক্ষে যে রাজা 'অরি' ও 'বিজিগীষু' অপেক্ষা অধিক বলশালী, কিন্তু উভয়ের মিলিত বল অপেক্ষা অল্পশক্তিসম্পন্ন, তাহাকেই শাস্ত্রকারগণ 'মধ্যম' আখ্যা দিয়াছেন (অর্থশাস্ত্র ৬, ২, কামন্দক ৮, ২১ মূল এবং শঙ্করাচার্য্যকৃত টীকা)। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, মণ্ডলের মধ্যে অপেক্ষাকৃত বলবান্ রাজার নাম 'মধ্যম'। 'উদাসীন' আবার তদপেক্ষাও বলবান্। যে রাজা 'অরি', 'বিজিগীষু' ও 'মধ্যম' অপেক্ষা অধিক সামর্থ্য ধারণ করে, কিন্তু উহারা তিনজন মিলিত হইলে সমকক্ষ হইতে পারে না, তাহার নাম 'উদাসীন'। 'মধ্যম' মণ্ডলের মধ্যে মধ্যম শক্তিসম্পন্ন; 'উদাসীন' ঊর্দ্ধে আসীন। অর্থাৎ সর্ব্বাপেক্ষা বলশালী। 'মধ্যম' বা 'উদাসীন' কারণবশতঃ 'বিজিগীষু'র শত্রু বা মিত্র হইতে পারে। অথবা যুদ্ধকালে নিরপেক্ষও থাকিতে পারে। ইহাদের স্বরূপ নির্ণয়ে শত্রুতা, মিত্রতা বা নিরপেক্ষতা ঠিক বিচার্য্য বিষয় নহে; বলবত্তাই ইহাদের লক্ষণ। অর্থশাস্ত্রের 'বিজিগীষু'র অতি নিকটেই কোন এক দিকে 'মধ্যমে'র স্থান এবং 'অরি', 'বিজিগীষু' ও 'মধ্যমে'র পার্শ্বে 'উদাসীনে'র স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। 'মধ্যম', 'উদাসীন,' 'অরি' এবং 'বিজিগীষু' এই চারি জন মণ্ডলের প্রধান অবয়ব। অপর রাজাদিগকে আবশ্যকমত 'অরি' বা 'বিজিগীষু' কোন এক জনের পক্ষভুক্ত বলিয়া ধরা হয়।

মধ্যম ও উদাসীন সম্বন্ধে প্রচলিত মতের খণ্ডন।

পূর্ব্বেই দেখা গিয়াছে, প্রতিবেশী রাজ্যগুলির মধ্যে যে সকল রাজনৈতিক সম্পর্ক উদ্ভূত হইতে পারে, তৎসম্বন্ধে কর্ত্তব্য নিরূপণই মণ্ডল কল্পনার প্রধান উদ্দেশ্য। রাজ্যের সাতটি অবয়ব,—রাজা, মন্ত্রী, দেশ ও তাহার অধিবাসী, দুর্গ, কোশ, সৈন্য এবং সহায়। এই সপ্তাঙ্গের শক্তির উপর প্রত্যেক রাজ্যের সুখ-সমৃদ্ধি নির্ভর করে। মণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেক রাজাকে স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্র সম্বন্ধীয় সপ্তাঙ্গের বলাবল নির্দ্ধারণ করিয়া, অবস্থাবিশেষে সন্ধি, বিগ্রহ, যান, আসন, দ্বৈধীভাব ও সংশ্রয়, এই ষড়্‌গুণের মধ্যে কোন একটির অথবা দুইটি গুণের মিশ্রণে উৎপন্ন উপায়গুলির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। এইগুলিই রাজ্যের রক্ষণ ও পরিবর্দ্ধনের উপায়স্বরূপ। সকল কয়টির গুণাগুণ বিচার করিয়া, যেটি দ্বারা অধিক পরিমাণে অনিষ্ট নিবৃত্তি বা ইষ্টলাভ হইতে পারে, বিবেচনাপূর্ব্বক সেটি অবলম্বন করাই রাজনীতি।

সপ্তাঙ্গ ও ষড়্‌গুণ।

যুদ্ধাবসানে শত্রুর সহিত অথবা শান্তিপূর্ণ সময়েও কোন ব্যক্তির সহিত পণে আবদ্ধ হইয়া

মৈত্রী-স্থাপনের নাম সন্ধি। "অপকারো বিগ্রহঃ" অর্থাৎ কোনরূপ অনিষ্টাচরণ করিয়া বৈরভাব প্রকাশ করাকে বিগ্রহ বলে। কৌটিল্য (৭, ২) বিগ্রহের অনেকগুলি দোষ দেখাইয়াছেন এবং সন্ধি দ্বারা কাজ চলিলে বিগ্রহ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। বিশেষভাবে শক্তিসঞ্চয়ের পর উপযুক্ত কালে সৈন্য সামন্ত লইয়া যুদ্ধযাত্রার নাম "যান"।

উপযুক্ত সামর্থ্যের অভাব বুঝিলে যুদ্ধযাত্রা না করিয়া, নিজ রাজ্যের আভ্যন্তরীণ উন্নতি সাধন এবং কোন উপায়ে শত্রুর অনিষ্ট সাধনের নাম 'আসন'। 'আসনে' অবস্থিত রাজা শত্রুর বাণিজ্যাদি বিষয়ে বিঘ্ন উৎপাদন করিয়া, তাহাকে দুর্ব্বল করিয়া, নিজে শত্রু অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী হইতে চেষ্টা করিয়া থাকে। এই যান ও আসন, উভয়ই বিগ্রহের একটা প্রকার মাত্র। কামন্দক (১১, ৩৫, ৩৬) বলিয়াছেন,—"যেহেতু যান ও আসন দ্বারা শত্রুর অপকারই করা হয়, অতএব এই দুইটি বিগ্রহেরই রূপ।" একের সহিত সন্ধি করিয়া অপরের সহিত যুদ্ধ করার নাম 'দ্বৈধীভাব'। শত্রু সংহারে অপরের সাহায্য গ্রহণ আবশ্যক হইলে এই দ্বৈধীভাবের আশ্রয় লইতে হয়। যখন যান, আসন, বিগ্রহ বা দ্বৈধীভাব, কোনটিই অবলম্বনের সামর্থ্য থাকে না এবং শত্রুও যখন সন্ধি করিতে প্রস্তুত না হয়, তখন অপর একজন বলবান্ রাজার শরণাপন্ন হইতে হয়; ইহাকেই বলে 'সংশ্রয়'। বিভিন্নাবস্থায় অবলম্বনীয় এই মূল নীতি কয়টি ছাড়া বিশেষ বিশেষ প্রয়োজন মত "বিগৃহ্যযান," 'সন্ধায়যান', 'বিগৃহ্যাসন" ও 'সন্ধায়াসন' প্রভৃতি মিশ্রিত উপায়গুলি অবলম্বন করা আবশ্যক হইতে পারে।

মণ্ডল সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা।

অর্থশাস্ত্রে মণ্ডলের স্বরূপ ও মণ্ডলস্থ রাজাদের অবলম্বনীয় ষড়্‌গুণ সম্বন্ধে বিশদভাবে উপদেশ আছে। কেহ কেহ এ সম্বন্ধে কৌটিল্যের উক্তিগুলির আপাত-সুলভ অর্থ গ্রহণ করায় প্রাচীন হিন্দু-রাজনীতি সম্বন্ধে অনেক ভ্রান্ত ধারণার উৎপত্তি হইয়াছে। প্রথমতঃ কৌটিল্য ১২টি রাজ্যের সমবায়ে মণ্ডলের কল্পনা করিয়াছেন দেখিয়াই ঐতিহাসিক ভিন্সেণ্ট স্মিথ তাঁহার "প্রাচীন ভারতে" (১৩৮ পৃঃ) লিখিয়াছেন যে, অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য সম্বন্ধেই কৌটিল্যের মণ্ডল-ব্যবস্থা প্রযুক্ত হইতে পারে। সুতরাং এ দেশে মৌর্য্য-সাম্রাজ্যের ন্যায় কোন বৃহৎ রাজ্য প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে অর্থশাস্ত্র রচিত হইয়াছিল; কারণ, তাহা না হইলে, ঐ পুস্তকে এতগুলি রাজ্যের একত্র সমাবেশের কল্পনা থাকিতে পারিত না। অতএব তাঁহার মতে অর্থশাস্ত্র রচনার সময়ে ভারতবর্ষ অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল। অধ্যাপক ভিণ্টারনিট্‌স্‌ও কলিকাতা রিভিউ পত্রে (১৯২৪, এপ্রিল; পৃঃ ২৭) এই মতেরই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন। কিন্তু মণ্ডলান্তর্গত রাজ্যগুলির সংখ্যা দেখিয়াই ঐরূপ মনে করা সঙ্গত নহে। একটি মণ্ডল কতখানি স্থান লইয়া বিস্তৃত থাকিতে পারে, কৌটিল্য তাহার পরিমাণ নির্দ্দেশ করেন নাই। তাঁহার নির্দ্দেশ অনুসারে ফ্রান্স, জার্ম্মাণ ও রুসিয়ার মত বড় বড় রাজাকেও একই মণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত ধরা যাইতে পারে। বিশেষতঃ বার (১২)* এই সংখ্যাটি এই স্থলে সম্ভাবিত সংখ্যা মাত্র। প্রকৃতপক্ষে কার্য্যকালে 'বিজিগীষু'র সহিত যে কয় জন রাজার শত্রুতা বা মিত্রতা ঘটিয়া থাকে, কেবল সেই কয়জনই

সেই সময়ে আলোচনার বিষয়ীভূত হয়। অতএব অনেকগুলি রাজার নাম দেখিয়াই মণ্ডলস্থ রাজ্যগুলির ক্ষুদ্রত্ব নির্দ্ধারণ করা অযৌক্তিক।

ঐ পুস্তকেরই আর এক স্থলে (১৩৯ পৃঃ) ভিন্সেণ্ট স্মিথ লিখিয়াছেন,—"ভারতবর্ষের প্রতিবেশী রাজ্যগুলির পক্ষে যুদ্ধবিগ্রহ ভিন্ন কখনই শান্তিতে বাস করা সম্ভবপর ছিল না। কারণ, 'বলশালী হইলে যুদ্ধ করিবে', 'সামর্থ্য থাকিলেই সন্ধির নিয়ম ভঙ্গ করিবে' এবং 'কোন রাজ্য অব্যবহিত হইলেই তাহার অধিপতিকে শত্রুরূপে গ্রহণ করিতে হইবে'—ইহাই হইল ভারতীয় রাজনীতি-শাস্ত্রের উপদেশ।" কিন্তু এই উক্তিগুলি একে একে মূলের সহিত মিলাইয়া পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে, অর্থশাস্ত্রের বিভিন্ন অংশ হইতে বিচ্ছিন্নভাবে গৃহীত বাক্যগুলির পূর্ব্বাপর সামঞ্জস্যহীন অনুবাদের দ্বারা ঐতিহাসিকপ্রবর এইরূপ ভ্রান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। প্রথমতঃ—'অভ্যুচ্চীয়মানো বিগৃহ্লীয়াৎ' (৭, ১), 'হীনেন বিগৃহ্লীয়াৎ' (৭, ৩) এই সকল বাক্যের দ্বারা কৌটিল্য বল সঞ্চয় হইলেই যুদ্ধ করিতে উপদেশ দেন নাই কিংবা নিজের অপেক্ষা দুর্ব্বল রাজা পাইলেই তাহার অনিষ্ট করিতে বলেন নাই। যখন অন্যান্য কারণে যুদ্ধ অনিবার্য্য হইয়া উঠিবে, তখন উপযুক্ত বল সঞ্চয় করিয়া, অপেক্ষাকৃত অল্পশক্তিসম্পন্ন রাজার সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে, ইহাই কৌটিল্যের উপরিউক্ত বাক্যের তাৎপর্য্য। কারণ, তিনি অন্যত্র (৭, ২) বিগ্রহকে ক্ষয়, ব্যয়, প্রবাস ও প্রত্যবায়ের কারণরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এবং সন্ধি ও বিগ্রহের মধ্যে বিগ্রহকে পরিত্যাজ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কামন্দকীয় নীতিসারে (১০, ৩—৫) বিগ্রহের কুড়িটি কারণ নির্দ্দিষ্ট আছে। ইহা হইতেও বুঝা যায় যে, কেবল বল সঞ্চয় হইলেই যুদ্ধ করাটা নীতিশাস্ত্রকারের অভিপ্রেত নহে। উপায়ান্তর থাকা সত্ত্বেও যিনি যুদ্ধ করিবার মন্ত্রণা দেন, তাঁহাকে নীতিবাক্যামৃতে (যুদ্ধোদ্দেশ প্রকরণে) নিন্দা করা হইয়াছে। সুতরাং বিনা কারণে যুদ্ধায়োজন ভারতীয় রাজনীতি-শাস্ত্রের অনুমোদিত, এমন কথা কিছুতেই বলা যায় না। দ্বিতীয়তঃ প্রবল ব্যক্তির পক্ষে দুর্ব্বলের সহিত সন্ধির নিয়ম প্রতিপালনে অনিচ্ছা থাকা সম্ভব হইলেও, ভারতবর্ষে সচরাচর এমন ঘটনা ঘটিত বলিয়া কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। সন্ধিমোক্ষপ্রকরণের প্রথমেই (৭, ১৭) কৌটিল্য বলিয়াছেন,—"সত্যং বা শপথো বা পরব্রেহ চ স্থাবরঃ সন্ধিঃ" অর্থাৎ সাধুতা বা শপথের উপর প্রতিষ্ঠিত সন্ধি কখনই ভগ্ন করা চলে না। এইরূপে সন্ধিভঙ্গ সম্বন্ধে কৌটিল্য নিজের অভিমত প্রকাশের পর আশঙ্কা করিয়াছেন যে, প্রবল ব্যক্তিরা বলগর্ব্বে সন্ধির নিয়ম নাও মানিতে পারে। কিন্তু ইহা বড়ই ক্ষোভের বিষয় যে, এই উক্তিটিকেই স্মিথ সাহেব ভারতবর্ষে সন্ধি-ভঙ্গ ঘটনার প্রমাণস্বরূপ উদ্ধৃত করিয়াছেন। তৃতীয়তঃ সমীপবর্ত্তিতাই শত্রুতার স্বাভাবিক কারণরূপে বর্ণিত হওয়ায় পরস্পরের মধ্যে সর্ব্বদা যুদ্ধ-বিগ্রহের অস্তিত্ব অনুমান করা হইয়াছে। কিন্তু এরূপ অনুমান আদৌ যুক্তিযুক্ত নহে। পূর্ব্বেই আমরা বলিয়াছি যে, প্রতিবেশী রাজ্যগুলির মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হওয়া খুবই স্বাভাবিক। আধুনিক কালেও আমরা সে বিষয়ে প্রমাণ পাইতেছি। কিন্তু তাহা হইতে এমন সিদ্ধান্ত করা যায় না যে, ঐ রাজ্যগুলি পরস্পর সর্ব্বদা যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত থাকিবে। বিশেষতঃ উচ্ছৃঙ্খলভাবে

ষাড়্গুণ্য সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা।

যুদ্ধ করার পক্ষে সে কালেও অনেক বাধা ছিল। মণ্ডলস্থ অপর রাজগণের বিরাগভাজন হওয়ার ভয়ে প্রত্যেক রাজাকেই কথঞ্চিৎ নিয়মিতভাবে চলিতে হইত। কেবল শক্তি থাকিলেই কাহাকে উৎপীড়ন করা চলিত না। কৌটিল্য বলিয়াছেন (৭, ১৩), যে ব্যক্তি ধার্ম্মিককে পীড়া দেয়, সে মিত্রগণেরও অপ্রিয় হইয়া থাকে এবং (৭, ১৬) যে ব্যক্তি যুদ্ধে বিপন্ন আশ্রয়প্রার্থীর প্রতি অত্যাচার করে, অসন্তুষ্ট মণ্ডল তাহার উচ্ছেদের জন্য চেষ্টিত হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে, কোন রাজা অন্যায় আচরণ করিলে মণ্ডলস্থিত অপর রাজগণ তাহাতে বাধা দিত এবং ঐ ভয়েই তাহাকে তাদৃশ আচরণ হইতে বিরত থাকিতে হইত। এরূপ অবস্থায় মণ্ডলের গঠন-প্রণালী হইতেই সিদ্ধান্ত করা যায় না যে, মণ্ডলস্থ রাজ্যগুলি সর্ব্বদা যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকিত।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা

খুলনা জেলার মাঝির ভাষা*

নিম্নে খুলনা জেলার মাঝিদিগের ব্যবহৃত কথাগুলি দেওয়া গেল। বাঙ্গলার মাঝিমাল্লারা যে ভাষায় কথা বলে,—যে সকল পারিভাষিক শব্দ ব্যবহার করে, তাহাদিগকেও ভাষায় স্থায়ী আসন দান না করিলে আমাদের মাতৃভাষা কিছুতেই পূর্ণাঙ্গ লাভ করিতে পারিবে না।

এ স্থলে ইহাও বলা উচিত যে, খুলনা জেলার মাঝিমাল্লারা অনেকেই ফরিদপুর বা তৎসন্নিহিত স্থান হইতে আগত। উচ্চারণের পার্থক্য ব্যতীত স্থানীয় মাল্লাদিগের সহিত সামান্য একটু ভাষাগত পার্থক্যও তাহাদের আছে। কিন্তু সে পার্থক্য বড় বেশী নহে। স্থানীয় হিন্দু ও মুসলমান মাঝিদিগের ভিতরও একটু ভাষাগত স্বাতন্ত্র্য আছে। কিন্তু ইহাও সামান্য মাত্র।

মাঝিদের ভাষার উচ্চারণও যথাসম্ভব তাহারা যেরূপ ভাবে উচ্চারণ করিয়া থাকে, সেইরূপ ভাবেই লিখিত হইল। পূর্ব্ব ও পশ্চিমবঙ্গের মধ্যস্থলে অবস্থিত খুলনার উচ্চারণ কতকটা পূর্ব্ববঙ্গের মত, আবার কতকটা পশ্চিমবঙ্গের মত। আবার অনেক স্থলে তাহার উচ্চারণে একটা স্বাতন্ত্র্যও আছে। যথা,—কেডা (কে), যা'বানে (যা'বখন), ধানডুন, চালডুন্ (এগুলি পূর্ব্ববঙ্গের অনুরূপ ; 'ডুন্' ত সম্পূর্ণ পূর্ব্ববঙ্গীয়) ; কিন্তু খা'চ্ছিল, যা'চ্ছিল, সকল সময় ঠিক পশ্চিমবঙ্গের মতন, যদিও 'টান্'টা ভিন্ন। আবার 'ভাত'কে খুলনাবাসী ঠিক পূর্ব্ববঙ্গীয়ের মত 'বাত'ও বলে না বা পশ্চিমবঙ্গের মত 'ভাত'ও বলে না। তাহার 'ভ'এর উচ্চারণ অনেকটা 'ব' ও 'ভ'এর মাঝামাঝি। এরূপ দৃষ্টান্ত আরও আছে।

শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের উচ্চারণ অনেকটা অবশ্য পশ্চিমবঙ্গের অনুরূপ ; কিন্তু তাহা কৃত্রিম,—অনুকরণজাত। চন্দ্রবিন্দুর উচ্চারণ করিতে তাঁহারাও এখন অভ্যস্ত হন নাই।

শব্দ	প্রতিশব্দ
নাও বা লাও	নৌকা। যথা :—এ নাওখান কা'র ?
দাড়্	দাঁড়।
বোঠে	বৈঠা। যথা :—বোঠে না বাতি পারিস্ ত হাটুয়ে নায় আসিস্ কেন ?
হাল	হাল।
চোড়্ বা লগি	একটা লম্বা ও সরু বংশদণ্ড। তীরের নিকট অল্প জলে নৌকা চালাইতে হইলে ইহার সাহায্য লওয়া হয়। যথা :—তাড়াতাড়ি যা'তি চাও ত লগি খোচাও (বা লগি ঠেল।)
বাদাম	পাল। যথা :—এমন বাতাসে বাদাম না খাটাবি ত কবে খাটাবি ?
মস্তুল	মাস্তুল।
ছৈ বা ছাপ্পড়	নৌকার উপরের ছাউনি। যথা :—আমার এ নতুন ছৈ, বাবু, এক ফুটও জল পড়্বে না।
ঝুকোর	জানালা।
পাটাতন	নৌকার ভিতরকার তক্তার আচ্ছাদন।
খোল	নৌকার 'ফ্রেম' ও তক্তার আচ্ছাদনের মধ্যের শূন্য জায়গা।

---

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ত্রিংশ বার্ষিক, দশম মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

শব্দ	প্রতিশব্দ

ডয়া খোল—নৌকার খোলের ঠিক মাঝখানটা, অর্থাৎ ফ্রেমের ভিতর দিকের মধ্যস্থল।

গোলোই—নৌকার ঠিক অগ্রভাগের ত্রিভুজাকৃতি কাষ্ঠখণ্ড। যথা:—গোলোইতি পা দিয়ে ওঠ্‌কেন (উঠিবেন) না, বাবু।

শড়া—দাঁড় নৌকার সহিত বাঁধিয়া রাখিবার জন্য তাহার মধ্যস্থলে যে মোটা দড়িটার বাঁধন দেওয়া হয়, সেই দড়িটা।

দাড়ের পাতা—জলের ভিতরে দাঁড়ের যে চেপ্টা তক্তাখানি থাকে। যথা,—পাতায় জল পায় না, কেমন দাড় বা'স ?

টাবুরে নাও—ছোট নৌকা, সাধারণতঃ একজন মাঝিতেই চালায়।

ডিঙ্গি নাও—আরও ছোট নৌকা; সাধারণতঃ মৎস্যব্যবসায়ীরা ইহাতে করিয়া মাছ লইয়া হাটে হাটে বিক্রয় করিয়া বেড়ায়।

ডোঙ্গা—সাধারণতঃ তালগাছের কাণ্ডে নির্ম্মিত হয়। আকারও নৌকার মত নহে।

পাতাম নাও—যে নৌকার তক্তাগুলি পাশাপাশি রাখিয়া, এক-প্রকার চেপ্টা পেরেক দ্বারা আবদ্ধ।

খিলেম নাও—ইহার একখানা তক্তার মুখের এক পাশের খানিকটা চাঁচিয়া ফেলিয়া, অন্য তক্তাটীও সেইরূপ করিয়া, কাঠের খিল দিয়া আবদ্ধ।

তেকা'ঠে নাও, পাচকা'ঠে নাও—গঠনের বিশেষত্ব অনুযায়ী।

ছ্যাওট—জল সেচনের পাত্র।

(নৌকা) ভিড়োনো—নৌকা তীরে লাগান। যথা—এই ঘাটে নাও ভিড়োও, মাঝি।

শব্দ	প্রতিশব্দ

গুণ—গুণের দড়ি। যথা:—গুণ টানার সময় দেখ্‌তি (দেখ্‌তে) হয় যে, গাছে বাধে, কি কিসি (কিসে) বাধে ?

পান্‌সী—বড় নৌকা।

ছিপ্ বা হাটুরে নাও—সরু অথচ খুব লম্বা নৌকা; খুব দ্রুতগামী। ইহাতে চর্ড়িয়া ব্যবসায়ীরা হাট করিয়া থাকে।

খেয়া—খেয়া নৌকা।

ভাওয়ালে বা বোট—ধনীদিগের ব্যবহারোপযোগী নৌকা।

বজরা—প্রকাণ্ড বড় নৌকা; ইহাতে করিয়া ব্যবসায়ীরা মাল-পত্র চালান করিয়া থাকে।

পাড়ি দেয়া—এড়োএড়ি ভাবে নদী পার হওয়া।

চল্‌তি নাও—চলন্ত নৌকা।

গাঙ—নদী।

জোয়ার—জোয়ার।

ভাটি—ভাঁটা।

উজোন—উজান।

গোণ—অনুকূল স্রোত।

উজোনো—স্রোতের প্রতিকূলে যাওয়া।

ভাটোনো—ভাঁটার টানে ভাসিয়া যাওয়া। যথা,—নাও ভাটোলো যে।

বান—বন্যা। যথা,—এবার গাঙে বান ডাহিছে।

একটানা—বর্ষাকালে নদীর স্রোত একমুখেই বহিয়া থাকে, তাহাকেই একটানা কহে। যথা:—সমস্ত বর্ষাতা গাঙে একটানা থাকে।

তোড়—স্রোতের প্রাবল্য।

কূল বা কেনারা—নদীর তীর।

ভাঙ্গন—কূল নদীতে ভাঙ্গিয়া যাওয়া। যথা:—এবার পশ্চিম দিকে ভাঙ্গন ধরিছে।

শব্দ	প্রতিশব্দ

কানাল—গভীর স্রোত; সাধারণতঃ ভাঙ্গনের দিকে।

বাক—নদীর বাঁক।

তিরমুনি—ত্রিমোহানা।

গোলা—ঘূর্ণাবর্ত্ত।

ভ্যাম্‌তা—নদীর মোড়।

খোচ—ছোট ছোট বাঁক।

ঠোটা—অনেকটা অন্তরীপের মত; যে স্থানের তীরভূমি অনেকটা ত্রিভুজের আকৃতিতে নদীর ভিতর দিকে আসিয়া পড়িয়াছে।

চর—নদীগর্ভোত্থিত তীরভূমি।

লোণা—লবণাক্ত।

রায়ভাটি বা সারভাটি—শেষ ভাঁটা; যখন স্রোতের বেগ অত্যন্ত অধিক হয়।

ভা'ল ফিরোনো—নৌকার মুখ ফিরাইয়া গতি পরিবর্ত্তন করা।

ভক্—বৃষ্টি (সাধারণতঃ মুসলমানদিগের ভাষা)।

তুভোন্—তুফান।

ম্যাঘ—মেঘ।

ঝড়—ঝড়।

শব্দ	প্রতিশব্দ

।—ভাড়া। [ভাড়া পাওয়াকে মাঝিরা সাধারণতঃ ভাড়া বাঁধা কহে। যথা,—ভাড়া বাঁধ্‌তে পারিছিস্ ভাই ?]

মুহোড় বাতাস—প্রতিকূল বাতাস।

পিঠেম বাতাস—অনুকূল বাতাস।

মাঝি—যে হাল ধরে।

মাল্লা—দাঁড়ি বা অন্যান্য সকলে।

চড়ুনদার—পুরুষ যাত্রী।

শোয়ারি—স্ত্রী-যাত্রী

বাঁধ্‌লা—খালের বা নদীর মুখের বাঁধ।

পয়ান—খালের মুখে যে বাঁধ থাকে, তাহার স্থানে স্থানে বর্ষাকালে খালের ভিতর ঢুকিবার পথ থাকে। তাহার নাম পয়ান।

কাচি চর—নূতন মাটি পড়িয়া সম্প্রতি যে চর গঠিত হইয়াছে বা হইতেছে; কাঁচা চর।

খোলা—পলি। যথা,—এবার বানে প্রায় এক হাত খোলা ফেলিছে।

মোট মাটারি—যাত্রীর জিনিষ পত্র।

বা'র দেওয়া—নৌকাকে নদীর ভিতর (কূল হইতে) বাহির করিয়া আনা।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

নাথধর্ম্মে সৃষ্টিতত্ত্ব

নাথধর্ম্মের বহু তথ্যপূর্ণ 'অনাদিপুরাণ' বা অনাদিচরিত্র, 'হাড়মালা গ্রন্থ', 'যোগিতন্ত্রকলা' প্রভৃতি কয়েকখানি 'কলমীপুথি' আমাদের হস্তগত হইয়াছে। প্রথম দুইখানি বহি 'ষাইবাম', 'ভজিলু', 'ব্রম্ম', 'হৈআ' প্রভৃতি শিশু বাঙ্গালা ভাষার অলঙ্কারে ভূষিত। 'যোগিতন্ত্রকলা'র ভাষা সংস্কৃত, তবে এ সংস্কৃতের ব্যাকরণ রচনা করিতে পাণিনিও একটু প্রমাদে পড়িবেন। বহিগুলি কখন্ ও কাহার দ্বারা লিখিত, বলা যায় না; তবে প্রত্যেক বহির শেষে লেখা আছে, ঐগুলি অন্য বহির নকল এবং পুথিলেখক "যদ্দৃষ্টং তল্লিখিতং" বলিয়া রচনাতে কোনও ভুল ত্রুটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছেন। 'যোগিতন্ত্রকলা' নিতান্ত আধুনিক বলিয়া মনে হয়। উহাতে নাথযোগিগণের আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে বহু কথা লিখিত আছে।

সৃষ্টির পূর্ব্বে কি ছিল, এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রুতি ও বাইবেলে যাহা লিখিত আছে, নাথধর্ম্ম ইহার চেয়ে বিশেষ অধিক কিছু বলে নাই। প্রথমে শুধু 'নৈরাকার রাত্রি' ভিন্ন আর কিছুই ছিল না।

তখন— "নাই আদ্য অনাদ্য না ছিল ধর্ম্মেশ্বর।
না ছিল বর্ম্মা বিষ্ণু শিব গজেশ্বর॥
না ছিল চন্দ্র সূর্য্য শর্গে ইন্দ্রশর।
না ছিল আকাশ পাতাল ধরণী পবন॥
না ছিল অগ্নি পানি না ছিল দুর্ব্বাসন।
না ছিল দরিয়া সাগর কুলাকুল॥ †

কিন্তু সেই 'নৈরাকারে'র মধ্যে একজন ছিলেন, তাঁর আদি অন্ত, 'রূপ রেখ' নাই, তিনি "উদয় না হইছে না জাইব অস্ত।" কিন্তু তিনি সমস্ত স্থান ব্যাপিয়া আছেন, তিনি পরম গুণবান্, তিনি সকলের কর্ত্তা, সকলের দাতা এবং 'সমাই'কের পালক। তিনি 'সর্ব্বসৃষ্টিকর্ত্তা' ও 'সর্ব্বসংহারক'। কিন্তু তিনি কে? তাঁর নাম কি? "শেই অলেকনাথ আছয়ে গুশ্বর।"

শ্রুতিতে ঈশ্বর ইচ্ছা করিলেন,—সৃষ্টি হউক, আর সৃষ্টি হইয়া গেল। বাইবেলে পরমপিতা বলিলেন,—আলো হউক, আর আলো হইয়া গেল। অনাদিপুরাণেও—

"হেনকালে অলেকনাথ কল্পিলেক মন।
সত্যজুগ সৃজিতে মনে হইল য়েইখন॥"

---

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ৩১শ বার্ষিক, ১ম মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

† আমার প্রথম ইচ্ছা ছিল, বানানগুলি যত দূর সম্ভব, সংশোধিত করিয়া দিব। কিন্তু তাহাতে আমার অনেক সাহিত্যিক বন্ধু আপত্তি করেন। তাঁহারা বলেন, মূলে যেরূপ লেখা আছে, তাহাই যথাযথভাবে প্রকাশ করা উচিত।—লেখক।

শ্রুতিতে 'নৈরাকার রাত্রি'র গভীর অন্ধকার দূরীকরণার্থ প্রথমে আলো, আর বাইবেলে প্রথম জল এবং পরে আলো সৃষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু নাথধর্ম্মে প্রথমে সত্যযুগ সৃজন করিয়া অলেকনাথের সৃষ্টি করার পক্ষে কি সুবিধা হইল, অনাদিপুরাণ সে বিষয়ে কিছু বলেন নাই। তারপর অলেকনাথ "ইচ্ছা হনে 'অনাদ্য' সৃজিলা আচম্বিতে।" তাঁহার ইচ্ছা, 'অনাদ্যে'র উপর সৃষ্টি নির্ম্মাণের ভার অর্পণ করিবেন। অনাদ্যকে সৃজন করিয়া অলেকনাথ "নৈরাকার রাত্রি হনে দিবস নিকালিলা" ও "সাত দিবসের নাম নির্ণয় করিলা।" প্রথম বারের নাম সোমবার, সেই দিন অনাদির জন্ম হইয়াছিল। 'অনাদ্য' বা 'অনাদিধর্ম্মনাথ' সৃষ্ট হইয়াই 'বলে মুই মুই।' ইহাতে অলেকনাথ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। তিনি বলিলেন,—

"মুই মুই করি কর্ব্ব বড় দাপ।
অখনে সৃজিছি তরে আমি তর বাপ॥"

এই অভিযোগের বিরুদ্ধে অনাদিরও বলিবার অনেক ছিল,—

"অনাদি বলয়ে প্রভু সৃজিলা আমারে।
কিরূপে আছয়ে কথা না দেখি তুমারে॥
হেটে চাইলু স্থল নাই উপরে নাই কেঅ।
ধরিবারে লক্ষ নাই পুজিবারে দেয়॥"

'হাড়মালা' গ্রন্থেও ঠিক একইরূপ কথা আছে। তবে সেখানে 'অলেকনাথ' নয়, তিনি 'নিরঞ্জন গোঁসাই'। তিনি প্রথমে সত্যযুগ সৃজন করিবার প্রয়োজন দেখেন নাই। তিনি প্রথমেই—

"মনেতে ভাবিয়া দেব চাহে চারিভিতে।
হেনকালে অনাদি জন্মিলা আচম্বিতে॥" *

সে যাহা হউক, অনাদির উত্তরে অলেকনাথ বা নিরঞ্জন গোঁসাই সন্তুষ্ট হন নাই। তিনি কোথায় থাকেন, বলিয়া দিলেন—"শূন্যরূপে থাকি আমি শূন্যে অধিষ্ঠান।" (হাড়মালা)। কিন্তু কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া অহঙ্কার করার সমর্থন তিনি করিতে পারিলেন না। তিনি যারপর নাই ক্রুদ্ধ হইয়া গিয়াছেন। অহঙ্কারের ক্ষমা নাই, তিনি অনাদিকে শাপ দিয়া ফেলিলেন;—

"শিদ্ধি না হইল পিণ্ড পড়িব তুমার॥
শৃষ্টি শৃজিবাঅ তুমি বড় দুক্ষ পাইআ।
তাকে শংহারিব আমি শিবরূপ শৃজিআ॥
শিবরূপে য়েকজন করিমু শৃজন।
আদিরূপ শক্তি দিআ করিমু সংহারণ॥"

* হিন্দুস্থানী নাথ যোগিগণের নিকট নিম্নলিখিতরূপ সৃষ্টির ইতিহাস শুনিতে পাওয়া যায়,—'জলাময় রহে সব মহী একসংসারা, স্থাবর জঙ্গম মহী একাকারা, আদি মহাপুরুষকো জন্ম, মহাজন্ম ভবগোস্বামী আপে নিরঞ্জন। মহাকায় শরীর জলমে ভস্তস, ফিরে গোস্বামী তিন অর্বুদ বৎসর, এসা সময়মে প্রভুকো মুখমে উঠে হাইতি, তিসমে জনম লিয়ে উলুপক্ষী মোহ ভাই। ধ্যান ভাঙ্গনেছে নিরঞ্জন আঁখ মেলকো চাহিয়ে, সম্মুখমে উলুপক্ষী দেখনেকো পাইয়ে।' ইত্যাদি।

হাড়মালা গ্রন্থে নিরঞ্জন গোঁসাই 'শিবরূপ শৃজিআ' সংহার করেন নাই, সংহার করিবার জন্য তিনি 'কাল' সৃজন করিয়াছেন। অলেকনাথ শাপ দিয়া অনাদিকে "আপে জুগ আপে জোগি আপে আপ ধ্যাই" প্রভৃতি তত্ত্বকথা বলিয়া অন্তর্হিত হইলে, অনাদি তপ আরম্ভ করিলেন এবং কি দিয়া তিনি সৃষ্ট হইয়াছেন, জানিবার জন্য অলেকনাথকে অনুনয় করিতে লাগিলেন। অলেকনাথ পুনর্ব্বার আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে সৃষ্টিতত্ত্ব বুঝাইয়া দিয়াছিলেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে 'ব্রহ্মনাম ব্রহ্মস্তোত্র'ও শুনাইয়াছিলেন। অনাদিনাথ—

"য়েতেক শুনিয়া বলইন নাথের চরণে।
শূর্ণ্যেতে রহিল বসিয়ে তোমারো স্থানে॥
শূণ্যে শৃজিলায় প্রভু তুমার গোচর।"

এই কথা শুনিয়া অলেকনাথ মুখ হইতে অমৃত ছাড়িলেন আর সেই অমৃত হইতে স্থল সৃষ্ট হইল। অনাদিনাথ সেই স্থলের উপর আসন করিয়া বসিলেন। তারপর অলেকনাথ নিজের দেহের শক্তি হইতে 'কাকেতুকা' দেবীকে সৃজন করিলেন। কাকেতুকা দেবী অনাদির 'পদান্তর' সহ্য করিতে না পারিয়া মরিয়া গেলেন। তখন অলেকনাথ এই অবস্থা দেখিয়া, মনে মনে কল্পনা করিয়া 'অজেয়োর্ব্বল (?) হবে' গঙ্গার সৃষ্টি করিলেন ও অনাদির জটার মধ্যে তাহাকে স্থাপন করিয়া, অন্তরীক্ষ হইতে ডাকিয়া অনাদিকে বলিলেন,—

"আদি দেবি শৃজিছি তুমার লাগি শক্তি।
গঙ্গা দেবি শৃজিছি আদির অঙ্গে গতি॥
আদিয়ে অনাদ্যিয়ে শৃষ্টি নির্ম্মিছি।
দুইয়ে মিলি শৃষ্টি কর আপনার ইছি॥"

সৃষ্টি করার ভার অনাদির উপর অর্পণ করিয়া অলেকনাথ চলিয়া গেলেন। আমরা আরও দেখিতে পাইব, সৃষ্টিকার্য্যে অনাদি যখন একটু গণ্ডগোলে পড়িয়াছেন, তখনই অলেকনাথ আসিয়া তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছেন। এরূপ সৃষ্টিকার্য্য আপাততঃ নষ্টিক (Gnostic) দর্শনের মতানুযায়ী বোধ হইতেছে। *

অলেকনাথের কৃপায় কাকেতুকাদেবী ওরফে আদিদেবী জীবিতা হইলেন, এবং আদি অনাদি মিলিয়া সৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিলেন। প্রথমে আকাশ সৃষ্ট হইল, আকাশে ইন্দ্র রাজা হইলেন। তারপর চন্দ্র সূর্য্য সৃষ্ট হইল, সূর্য্যে লালবর্ণ দেওয়া হইল। তারপর বাসুকি ও পাতাল সৃজন করা হইল, বাসুকিকে পাতালে স্থান দেওয়া হইল এবং তাহার 'ফটের উপর

* "—Some lesser God had made the world,
But had not force to shape it as he would,
Till the High God behold it from beyond
And enter it and make it beautiful"—Tennyson.

তিন কুল (ত্রিকোণ ?)' পৃথিবী স্থাপন করা হইল। বিভিন্ন উপাদানে শ্বেতবর্ণ ও রক্তবর্ণ দুই প্রকার তারা সৃজন করা হইল।

"তবে ধর্ম্মে মুষ্টি বশাইআ চাইলা।
মুষ্টিতে ব্রহ্মা বিষ্ণু দুই মুর্ত্তি দেখিলা॥
তবে অনাদ্যে হস্তের মুষ্টি ফিরাইলা।
উর্দ্ধমুখ মহাদ্যেব তথায় দেখিলা॥
হস্ত হনে তিন পুত্র থইলা তিন স্থানে।"

"হাড়মালা"য় কিন্তু নিরঞ্জন গোঁসাই অনাদিকে শাপ দিয়া অন্তর্হিত হইলেই "শিবশক্তি বিদ্যমান" হইলেন ও হরি ব্রহ্মা তারপর সৃষ্ট হইলেন।

শ্রীযুক্ত তমোনাশ বাবু নাথধর্ম্মের শিবকে বৈদিক যুগের রুদ্র বা পৌরাণিক যুগের মহাযোগী শিব হইতে পৃথক্ ও কম ক্ষমতাশালী দেখিয়াছেন। আমরা কিন্তু নাথধর্ম্মের শিবকে বৈদিক বা পৌরাণিক যুগের শিব অপেক্ষা পৃথক্ দেখিলেও কম ক্ষমতাশালী দেখিতেছি না। অলেকনাথ অনাদিকে বলিতেছেন,—

"আমার অং (অঙ্গ ?) শিব অং জানিয় আপনে।
*　　　*　　　*　　　*
শিব অং সিদ্ধি অং যেই অং তুমি।
তুমার নাম রাখিলাম অনাদ্যি ধর্ম্মনাথ।
শিবর নাম রাখিলাম্ ঈশ্বর আদিনাথ॥"

আমরা আরও দেখিতে পাইব, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের মধ্যে শিবই খুব চালাক চতুর, বুদ্ধিমান্ ও ক্ষমতাশালী। তিনিই পিতার প্রিয়পুত্র ও পিতার আশীর্ব্বাদে তিনি ব্রহ্মা বিষ্ণুর গুরু হইয়াছিলেন।

অনাদিনাথ তিন পুত্রকে তিন স্থানে রাখিয়াছেন, আর তাহাদের খোঁজ নেন নাই। তাহারা তিনজন "চক্ষে না দেখে, কর্ণে না শুনে," এমতাবস্থায় "অস্থলভিতর" পড়িয়া রহিয়াছে। অনাদিনাথ আদিদেবীর সহিত পুত্রগণকে পরীক্ষা করিবার জন্য তাহাদের প্রত্যেকের কাছে গমন করিলেন। প্রথমে ব্রহ্মচারীর বেশে ব্রহ্মার কাছে গিয়া বলিলেন, তিনি পাঁচ দিনের উপবাসী, এবং 'অপুড়া পৃথিবী (?) দেয় ভুজনের ঠাই।" ব্রহ্মা ভীষণ ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন, তিনি চক্ষেও দেখেন না, কর্ণেও শুনেন না, তিনি "অপুড়া পৃথিবী" কোথায় পাইবেন ? তাঁহার যদি চক্ষু কর্ণ থাকিত, তবে তিনি ব্রহ্মাগ্নি দিয়া ব্রহ্মচারীকে ভস্ম করিয়া ফেলিতেন। বৈষ্ণব-বেশে বিষ্ণুর কাছে গিয়া অনাদিনাথ একই প্রার্থনা করেন এবং প্রায় একইরূপ উত্তর পান। অতঃপর "মহাযুগেশ্বর"-বেশে শিবের নিকট গিয়া প্রার্থনা করিতেই,—

"য়েত শুনিআ শিব যুক্তি করে মনে।
পিতা পরে কেয় নাই লয়ে মর মনে॥"

এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি পিতাকে যথাবিহিত সম্মানপুরঃসর নিবেদন করিলেন,—

"তিন জটা আছে আমার শিরের উপর।
বন্দন ভুজন তথা করহ শর্ত্তর॥"

পুত্রের ব্যবহারে অনাদিনাথ সন্তুষ্ট হইলেন এবং তাহাকে দৃষ্টিশক্তি লাভ করিবার গুপ্ত মন্ত্র ও কৌশল শিখাইয়া দিয়া গেলেন। শিব দৃষ্টিশক্তি ও শ্রবণ-শক্তি লাভ করিয়া, বিষ্ণু ও ব্রহ্মাকে ঐ সকল কৌশল শিখাইয়া দিলেন। তাঁহারা শিবকে গুরু ভজিয়া, অনাদি ধর্ম্মনাথের কৃপায় দৃষ্টিশক্তি ও শ্রবণ-শক্তি লাভ করিলেন, এবং অনাদি ধর্ম্মনাথ'কে 'আদেশ'* জানাইলেন।

তারপর অনাদিধর্ম্ম আদিদেবীর 'তনু' হইতে লক্ষ্মী, সাবিত্রী ও গৌরীদেবীকে সৃজন করিলেন এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবকে লইয়া "কুটেশ্বরে" গমন করিলেন। সেখানে অনাদিনাথের আদেশে শিব, আদিদেবীর মড়া তনুর কেশে কাঠ, মাথার খুলিতে ভাণ্ড ও দেহরস জলরূপে ব্যবহার করিয়া, নিজের শরীর হইতে "অগ্নি পানি নিকালিয়া", "চন্দ্রের গোলিতে" অন্ন পাক করেন এবং সমস্ত দেবগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া ভোজন করান। সমস্ত দেবগণের মধ্যে যিনি প্রধান, তাঁহাকে "শ্রীপত্রে" অন্ন দেওয়া হইল। শ্রীপত্রের অধিকারী নিজে অনাদিধর্ম্মনাথ। ভোজনান্তে শিব বলিলেন,—এখন অন্ন ভোজনান্তে সমস্ত দেবগণ সন্তুষ্ট হইয়াছেন, কিন্তু "পুনি কিরূপে হৈব অন্নের শ্রীজন।" তখন "অনাহেতু ভীমনাথে মারিলেক ছিটা," আর অন্ন সৃষ্ট হইয়া, পৃথিবীতে পড়িয়া, গাছ হইয়া উঠিল এবং তাহাতে ধান ধরিল। কিন্তু সে ধানে চাউল নাই, তখন—

"ধর্ম্মের আজ্ঞায়ে দেবি দুগ্ধ ছিটি দিলা।
চুচার মধ্যে দুগ্ধ ক্ষির বসিলা॥"

এখন অনাদিধর্ম্মনাথ, ব্রহ্মা বিষ্ণুকে একে একে গঙ্গা গৌরী বিবাহ করিতে আদেশ করিলেন, এবং তাঁহাদিগকে সৃষ্টির ঈশ্বর করিবেন ও ব্রহ্মজ্ঞান দিয়া অমর করিবেন বলিলেন। কিন্তু তাঁহারা সে আদেশ মানিলেন না। কারণ, গঙ্গা গৌরী তাঁহাদের "শাতমায়"। অতঃপর শিবকে গঙ্গা গৌরী বিবাহ করিতে আদেশ করা হইল। শিব 'ধর্ম্মের আজ্ঞা লঙ্ঘিতে না পারি,' 'শাধি ব্রহ্মজ্ঞান' গৌরীকে 'কোলে' ও গঙ্গাকে 'শিরে' লইলেন। সন্তুষ্ট হইয়া অনাদি বর দিলেন, "অন্তকালে ব্রহ্মা বিষ্ণু ভজিবা তুমাতে।" অতঃপর শিবের বীর্য্য হইতে 'কুলনাথে'র জন্ম ও গৌরীর বীর্য্য হইতে 'বিন্দুবতী'র জন্ম হইল। ধ্যানে আজ্ঞা পাইয়া শিব, কুলনাথের সহিত বিন্দুবতীর বিবাহ দিলেন, এবং কুলনাথ'কে যোগধর্ম্ম শিক্ষা দিয়া "শিব গোত্র, নাথ পৌদ্যাত" দিলেন।†

---

* 'আদেশ' শব্দ দণ্ডবৎ অর্থে পূর্ব্বে ব্যবহৃত হইত। বিশ পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বেও নাথযোগিগণের কোনও উৎসবাদিতে, বহু লোক জড় হইলে, যিনি সভার লোক মিলিত হওয়ার পরে আসিতেন, তিনি সভার লোকজনকে মাটিতে পড়িয়া দণ্ডবৎ কিম্বা নমস্কারাদি না করিয়া "সমাইর (=সবার) পদে আদেশ" বলিয়া সভার আসন গ্রহণ করিতেন।

† যোগিতন্ত্রকলামতে শিব বা অনাদি মোহিনীকে বিবাহ করেন, এবং আদ্যনাথের সঙ্গে বিন্দুবতীর বিবাহ হয়। এই বিবাহে ব্রহ্মা মন্ত্রপাঠক, শিব যাজক।

তারপর অনাদিধর্ম্ম, বিষ্ণুকে লক্ষ্মী ও ব্রহ্মাকে সাবিত্রী সমর্পণ করিয়া, অলক্ষিতে দক্ষিণ-সাগরে চলিয়া গেলেন এবং সেখানে আসনে বসিয়া, মনে মনে কল্পনা করিয়া এক অক্ষয় বটবৃক্ষ, এক গৃধিনী, 'জন্মেজয় রাজা' (যমরাজা ?) ও চিত্রগুপ্ত সৃজন করিলেন এবং বিভিন্ন অঙ্গের ঘর্ম্ম হইতে পবন, চন্দনবৃক্ষ প্রভৃতি সৃজন করিলেন। অক্ষয় বটবৃক্ষ হইতে তিন যুগের নিদর্শন-স্বরূপ তিন তাল জন্মিল; সত্যযুগের তালের উপর গৃধিনী বসিল। যমরাজকে বটবৃক্ষের নীচে বসাইয়া জম্বুদ্বীপের রাজা করিয়া দিলেন। পাপ পুণ্য বুঝিবার ভার চিত্রগুপ্তকে অর্পণ করিলেন এবং গৃধিনীকে চারি যুগের সাক্ষিস্বরূপ সে স্থানে স্থাপন করিলেন। তারপর তাঁহার জটার মল হইতে যে 'হরমুল বৃক্ষ' উৎপন্ন হইল, তাহার ফল ভক্ষণ করিয়া, ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবকে সৃষ্টি স্থিতি সংহারের ভার দিয়া, অনাদিধর্ম্মনাথ অনন্ত-শয্যায় শয়ন করিলেন।

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব—পিতার অন্বেষণ করিতে করিতে দক্ষিণ-সমুদ্রের নিকট গিয়া, গৃধিনীর নিকট হইতে সমস্ত কথা জানিতে পারিলেন এবং তিন ভাই সাগরের কূলে বসিয়া ধ্যান আরম্ভ করিলেন। তখন অনাদি, মৃত গরুর রূপ ধরিয়া ব্রহ্মা বিষ্ণুর নিকট ভাসিতে ভাসিতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন ব্রহ্মা বিষ্ণু উভয়েই ঘৃণাভরে ধ্যান হইতে উঠিয়া পলায়ন করিলেন। মৃত গরু যখন শিবের নিকট উপস্থিত হইল, তখন শিব চিন্তা করিলেন, এরূপ প্রাণী এখনও পর্য্যন্ত সৃষ্ট হয় নাই, ইহা নিশ্চয়ই পরমপিতার লীলা—এই ভাবিয়া জলে সাঁতার দিয়া গিয়া তিনি সেই গো-মূর্ত্তিকে ধরিলেন। ব্রহ্মা বিষ্ণু ইহা দেখিয়া, শিবকে নিন্দা করিয়া চলিয়া গেলেন। অনাদিধর্ম্ম, তখন তিন ভাই কিরূপে তাঁহার সংকার করিবেন, তাহা বলিয়া দিলেন—ব্রহ্মা বিষ্ণুর আচার "ভাশা পুড়াগাড়া" এবং শিব গর্ত্ত খুঁড়িয়া, আসনে বসাইয়া সমাধি করিবেন। শিব পিতাকে সমাধিস্থ করিয়া, ব্রহ্মা বিষ্ণুকে সেখানে লইয়া আসিলেন, তাঁহারা এখন পিতার দেহ দেখিতে পাইলেন, এবং শিবের নিকট হইতে শুনিয়া, পিতৃ আদেশমত তাঁহার সংকার করিলেন।

অনাদিকে যখন দাহ করা হইল, তখন তাঁহার নাভি ভস্মীভূত হয় নাই। উহা জলে ভাসাইয়া দেওয়া হয় এবং রাঘব উহা ভক্ষণ করে। তারপর—

"রাঘবের পেট ফাটি মীন নিকলিলা।
নাভি হনে মিননাথ জন্ম হইলা॥" *

---

* মীননাথের জন্ম সম্বন্ধে অন্যত্র অন্যরূপ উল্লেখ আছে। গণ্ডযোগে এক ব্রাহ্মণের এক পুত্র জন্মে। পুত্র মা-খেকো হবে, এই আশঙ্কায় ব্রাহ্মণ তাহাকে জলে নিক্ষেপ করেন এবং রাঘব তাহাকে ভক্ষণ করে। যখন মহাদেব পার্ব্বতীর—

"তুমি কেনে তব গোসাঞি আমি কেনে মরি।
হেন তত্ত্ব কহ দেব জোগে জোগে তরি॥"—গোরক্ষবিজয়

এইরূপ প্রশ্নের উত্তর দিবার জন্য ক্ষীরোদসাগরে মনোহর টঙ্গিতে বসিয়া পার্ব্বতীকে যোগশাস্ত্রের গূঢ়তত্ত্ব বলিতেছিলেন, তখন—

"মাৎস্যরূপ ধরি তথা মীনমোচন্দর।
টঙ্গির নাবাতে রহে যোগাল সুন্দর॥"—গোরক্ষবিজয়। (পর পৃষ্ঠে)

অনাদির পেট ফাটিয়া চৌরঙ্গী* সিদ্ধার জন্ম হইল। অগ্নির জালের তেজ হইতে জালন্ধুড়ি-সিদ্ধা, কর্ণ হইতে কর্ণফাটি বা কানিফা, চর্ম্ম হইতে চর্ম্মনাথ, ধূম্র হইতে ধূম্রনাথ, পা হইতে পাগলনাথ, নাভিস্থল হইতে নারদ প্রভৃতি অষ্টসিদ্ধা ও নবনাথের জন্ম হইল এবং—

"শ্রীগুলি ফুটি নিকলিছইন শ্রীনাথ।
অনন্তকুটি সিদ্ধার গুরু শ্রীগোরকনাথ ॥"

অনাদির চক্ষু ফুটিয়া পৃথিবীতে পড়িল এবং তাহা হইতে রুদ্রাক্ষবৃক্ষের জন্ম হইল। যোগিতন্ত্র-কলামতে অনাদির মস্তক হইতে গোরক্ষনাথের জন্ম হয় † এবং তাঁহার মুখ হইতে দাহননাথ, হৃদয় হইতে মেঘনাথ, নাভি হইতে পিণকনাথ, জঙ্ঘা হইতে উদ্ধারনাথ, জানু হইতে পাগলানাথ, বাহু হইতে ভৃকটিনাথ, গুহ্য হইতে সত্যনাথ এবং চরণ হইতে বিন্দুনাথের উৎপত্তি হয়। তাঁহার হাড় হইতে হাড়িপা ও চর্ম্ম হইতে চৌরঙ্গী সিদ্ধার জন্ম হয়।

গোরক্ষনাথের জন্ম অনাদির অঙ্গ হইতে হইলেও তিনি অন্যান্য সিদ্ধার মত নহেন, তিনি অলেকনাথের স্বরূপ। অলেকনাথ অনাদিকে বলিতেছেন,—

"যেই কালে তুমার অং (অঙ্গ ?) আমি ছুড়ি জাইবা।
তুমার শৃগুলি ফুটি আমি নিকলিবা ॥
আমার নাম গুরু গোরক ধরিবা।
গুরু গোরক নামে শংষার তরাইবা।"

পিতার অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া, শ্রাদ্ধাদি করিবার জন্য ব্রহ্মা বিষ্ণু কুটেশ্বরে চলিয়া গেলেন এবং শিব শ্মশানে বসিয়া তপ আরম্ভ করিলেন। তপে সন্তুষ্ট হইয়া তখন অলেকনাথের স্বরূপ গোরক্ষনাথ সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন এবং শিবকে ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, অথর্ব্ববেদ, "নিলবেদ" ও "শোসম্বেদে"র ‡ তত্ত্ব বলিয়া দিয়া তাঁহাকে শ্মশানের মাটি খুঁড়িতে আদেশ করিলেন।

এবং পার্ব্বতী যখন নিদ্রালসা হইয়া অন্যমনস্ক হইয়াছিলেন, তখন ঐ বালক রাঘবের পেট হইতে "হুঁ হুঁ" বলিয়া শিবের কথার উত্তর দিতেছিল। তখন মহাদেব তাহাকে ধরিয়া ফেলেন এবং রাঘবের পেট চিরিয়া বাহির করেন।

* চৌরঙ্গী—হাড়িপা কালুপার সমসাময়িক একজন সিদ্ধা। বিশ্বকোষকারকের মতে এই সিদ্ধার নাম হইতে কলিকাতার চৌরঙ্গী রোডের নাম হইয়াছে। এইরূপ প্রবাদ আছে যে, এই নাথসিদ্ধা কলিকাতার কালীঘাটের কালীর স্থাপক ও পূজক ছিলেন। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের সন্নিকটে কোথায় নাকি তাঁহার আশ্রম ছিল।

† একখানি কলমী পদ্মাপুরাণে আছে—"মাথা ফুটি বাহির হইলা শ্রীগোলকনাথ।" গোলক স্থানে খুব সম্ভব গোরক্ষ হওয়া উচিত ছিল।

‡ আমরা এতকাল চারি বেদের কথাই জানিতাম। কিন্তু যোগিতন্ত্রকলা ও অনাদিপুরাণে নিলবেদ ও শোসম্বেদ নামে আরও দুইখানা বেদের উল্লেখ পাই। বহু অনুসন্ধান করিয়াও এই বিষয় অন্য কোনও বিবরণ সংগ্রহ করিতে পারিলাম না। যোগিতন্ত্রকলা ও বেদমালা নামক আর একখানা ক্ষুদ্র পুঁথিতে নিম্নলিখিত বিবরণ পাইলাম,—

মাটি খুঁড়িয়া শিব যে সমস্ত বস্তু পাইলেন, তদ্দ্বারা গোরক্ষনাথ শিবকে নানারূপ অঙ্গ-ভূষণ প্রস্তুত করিয়া দিলেন। অনাদ্যের রুধিরে গৈরিক বসন, নাভির দ্বারা কর্ণের কুণ্ডল, নাসিকা দ্বারা নাদ, মেরুদণ্ড দ্বারা হস্তের "দ্বাদশ" প্রস্তুত করিয়া দিলেন। তারপর শ্মশানের ভস্মে সর্ব্বাঙ্গ ভূষিত করিয়া, শিবের গলায় বাসুকিকে পৈতারূপে স্থাপন করিলেন এবং তাঁহার মস্তকে নিজ মস্তকের লাল টুপী * পরাইয়া দিলেন এবং রুদ্রাক্ষের মালা কণ্ঠে তুলিয়া দিলেন। গোরক্ষনাথ শ্মশানের ভস্ম হইতে "ভস্ম্যা" (বৃষ ?) সৃজন করিলেন এবং শিব সেই বৃষে চড়িয়া কুটেশ্বরে গমন করিলেন।

প্রথমে ত্রিরাত্র শ্রাদ্ধ হইল। এই শ্রাদ্ধে গোরক্ষনাথ অলক্ষিতে থাকিয়া পৌরোহিত্য করিয়াছিলেন। তারপর একাদশ দিবসে পুনর্ব্বার শ্রাদ্ধ হয়। এই শ্রাদ্ধেও গোরক্ষনাথ স্মরণমাত্রে "শ্রীকবিলাশ" হইতে আসিয়া পৌরোহিত্য করিয়াছিলেন এবং ইন্দ্র, যম প্রভৃতি সমস্ত দেবগণ, চৌরঙ্গী প্রভৃতি অষ্ট সিদ্ধা, রাগ রাগিণী, বাসুকি, গৃধিনী পক্ষী প্রভৃতিকে আনিয়া শ্রাদ্ধে উপস্থিত করিয়াছিলেন। গোরক্ষনাথকে শিব ভিন্ন অন্য কেহ দেখিতে পাইতেন না। শ্রাদ্ধ হইতেছে, কিন্তু পুরোহিত নাই দেখিয়া ব্রহ্মা বিষ্ণু, শিবকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—

"বাপের জজ্ঞ করিতে ব্রাহ্মণ কেবা যেতে।"

শিব তদুত্তরে বলিয়াছিলেন,—

"শ্রীগুরু গোরকনাথ পুরইত যেথাতে ॥
হস্ত পদ নাই তার বিন্দু হংশ কলা।
আছয়ে জগত ভরি শমাইর দরশনে খেলা ॥
বাপের জজ্ঞেতে নাথ পুরইত হৈলা।
তাহানে কেয় দেখিতে না পাইলা ॥
কিঞ্চিৎ ধ্যানে শুন আমার সাক্ষাতে।
যেতেক মর্ম্মভেদ কইলাম তুমাতে ॥"

"সামবেদ যজুর্ব্বেদ অথর্ব্ববেদ ঋগ্বেদ আর।
নিল অনিল বেদ ষষ্ঠম বেদ সার ॥"—যোগিতব্রকলা।
"পঞ্চমুখী ব্রহ্মা এক মুখ কাটিয়াছে রুদ্র।
সেই মুখ হইতে হুলখনা বেদ উৎপন্ন ॥"—বেদমালা।

এই দুই অদ্ভুতপ্রকৃতির নামবিশিষ্ট বেদদ্বয়ের বিবরণ যদি কেহ কোথাও পাইয়া প্রকাশ করেন, তাহা হইলে বাধিত হইব।—লেখক।

* নাদপৈতা আজকালও নাথযোগিগণ ধারণ করেন, এবং স্থানে স্থানে অধুনাও অনেকে লাল টুপী ও কুণ্ডল ব্যবহার করিয়া থাকেন। ফরাসী পর্য্যটক de la valle র ভ্রমণ-কাহিনীতেও যোগীদিগের এই লালটুপী ও কুণ্ডলের উল্লেখ পাওয়া যায়।

"He (Yogiraj) had a golden bead hanging from his ear as big as a musket-bullet ; nd had a little red 'cap like those worn by Italian-galley slaves." (J. Tal-boys Wheeler's A Short History of India, Burma and Nepal.) 116-117.

সে যাহা হউক, শ্রাদ্ধ হইয়া গেল, পিণ্ডের অন্ন শিব নিজ হস্তে রন্ধন করিয়াছিলেন। নিমন্ত্রিত গণকে ভোজন করাইবার জন্ত "ভাণ্ডেরার" সামগ্রী আনান হইল এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, সাবিত্রী লক্ষ্মী, গঙ্গা ও ভগবতীকে আদেশ করিলেন,—

"তুমি চাইরে মিলি রন্দন করউকা ইহাতে।"

অন্ন ব্যঞ্জন রন্ধন করা হইল, পুরোহিতকে এই অন্ন ব্যঞ্জনের অর্ঘ্য দেওয়া হইল। অতঃপ নিমন্ত্রিতগণকে তৃপ্তির সহিত ভোজন করান হইল এবং তারপর সকলে স্ব স্ব স্থানে স্ব স্ব কশে প্রস্থান করিলেন।

অনাদিপুরাণ প্রভৃতিতে বর্ণিত নাথধর্ম্মে সৃষ্টিতত্ত্ব ও সৃষ্টির ইতিহাস এই। এখন সৃষ্টি ত হইল। সৃষ্টির একদিন ধ্বংস হইবে, কিছুই থাকিবে না। তখন—

"পৃথিবী মিশাইব আবে, আব মিশাইল রবিতে।
রবি মিশাইল বায়ে বায় মিশাই আকাশেতে॥
কলসী ভাঙ্গিলে জেন মীশাইব আকাশ।
আকাশ ভাঙ্গিলে জাইব মহা আকাশে॥
রবি ভাঙ্গিলে জাইব তেন অভিপ্রায়ে।
শরূপ মিশাইব জেন নাথগুরুর পায়ে॥"

শ্রীরাজমোহন নাথ

---o---

"নাথধর্ম্মে সৃষ্টিতত্ত্ব" প্রবন্ধের আলোচনা *

ডাঃ শ্রীযুক্ত বেণীমাধব বড়ুয়া এম্ এ, ডি লিট মহাশয় বলিলেন,—

প্রবন্ধ-লেখক শ্রীযুক্ত রাজমোহন নাথ অনাদি-পুরাণ, হাড়মালাগ্রন্থ ও যোগিতন্ত্রকলা নামক তিনখানি গ্রন্থের হস্তলিখিত পুথি অবলম্বন করিয়া, নাথধর্ম্মের সৃষ্টিতত্ত্ব নিরাকরণ করিতে গিয়াছেন। এই গ্রন্থগুলির মধ্যে একখানি সংস্কৃতে ও অপর দুইখানি বাঙ্গালায় লিখিত হইয়াছে। ইহাদের রচনাকাল জানা যায় না। প্রত্যেক পুথির 'নিমগন' বা সমাপ্তি অংশে 'যদ্দৃষ্টং তল্লিখিতং' উক্তি আছে দেখিয়া মনে করিতে হয়, ইহা আজকালের, নিতান্ত আধুনিক সময়ের রচনা নহে। ইহাও নিশ্চিত যে, ইহা অতিশয় পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের রচনাও নহে। আমার বিশ্বাস, এই গ্রন্থগুলির মধ্যে সৃষ্টিতত্ত্ব বা cosmology বলিতে আমাদের যাহা বুঝা উচিত, ঠিক তাহা নাই; তন্মধ্যে কতকগুলি প্রাচীন সৃষ্টিতত্ত্ব, পৌরাণিক কাহিনী, উপকথা বা রূপকচ্ছলে সরল, সহজবোধ্য ও সাধারণ ভাষায় বর্ণিত আছে মাত্র। এই পৌরাণিক আধ্যাত্মিক কাহিনীর মূল অনুসন্ধান করিলে সর্ব্বাগ্রে ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলের নাসদীয় সূক্তই আমাদের মনে পড়ে। বিশ্বসৃষ্টির পূর্ব্বে আকাশ-বাতাস, মর্ত্ত্য-পাতাল, স্থাবর-জঙ্গমাদি বলিতে আমরা সাধারণতঃ যাহা বুঝি, তাহা আদৌ ছিল না। চতুর্দ্দিক্ অন্ধকারে আবৃত ছিল। অগাধ জলরাশি বা নিরাকারা বিশ্ব-প্রকৃতির মধ্যে একমাত্র অলেখ প্রভু নিরঞ্জনই ছিলেন। তিনি জ্যোতির্ম্ময় ও আলোকস্বরূপ। তাঁহার দয়াতেই বিশ্বভুবনের সৃষ্টি হয়, জল স্থলের আবির্ভাব হয়, স্থাবর জঙ্গম উৎপন্ন হয়, মনুষ্য ও মনুষ্যসভ্যতার উৎপত্তি ও অভ্যুদয় হয়। আপাতদৃষ্টিতে নাসদীয় সূক্ত নাথসৃষ্টি-কাহিনীর প্রধান অবলম্বন হইলেও বস্তুতঃ ইহার মধ্যে অঘমর্ষণ, হিরণ্যগর্ভ, অনিল, ব্রহ্মণস্পতি, হিরণ্যগর্ভ ও বিশ্বকর্ম্মাদি সূক্তের উপদেশও বিদ্যমান আছে। শুধু তাহাই নহে, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক এবং উপনিষদাদি গ্রন্থের সৃষ্টিকথার প্রভাবও তন্মধ্যে যথেষ্ট আছে। আলোচ্য প্রবন্ধের উপসংহারে মোক্ষপ্রাপ্ত ব্যক্তির পরিণাম বর্ণনা-প্রসঙ্গে লেখক যে পদগুলি উদ্ধৃত করিয়াছেন, তন্মধ্যে স্পষ্ট উক্ত আছে—পৃথিবী জলে, জল রবি বা অগ্নিতে, অগ্নি বায়ুতে, বায়ু আকাশে এবং আকাশ মহাকাশে লীন হয়। একমাত্র অলেখ নিরঞ্জনই অবশিষ্ট থাকেন। সিদ্ধ নাথগুরুগণ মানব হইলেও তাঁহারা এবং প্রভু নিরঞ্জন স্বরূপতঃ একই।

প্রোক্ত নাথ সিদ্ধপুরুষদিগের মধ্যে গোরক্ষনাথই সকলের শীর্ষস্থানীয় শিরোমণি। প্রবন্ধের অবলম্বিত পুথির মধ্যে তাঁহাকে 'অনন্ত কুটি সিদ্ধার গুরু'রূপে প্রশংসা করা হইয়াছে। এই প্রশংসা নিরর্থক নহে। গোরক্ষনাথের আবির্ভাবকালে, পূর্ব্বে ও পরে আর্য্যাবর্ত্তে—বিশেষতঃ পূর্ব্বাঞ্চলে বহু নাথগুরু ও নাথপন্থী ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বামাচারী ছিলেন, কেহ

* ১৫ই জ্যৈষ্ঠ. ১৩৩১ তারিখে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের প্রথম মাসিক অধিবেশনে এই প্রবন্ধ পাঠের পর যে সকল আলোচনা হয়, তাহাই দেওয়া হইল :—সম্পাদক।

কেহ বামাচার হইতে বিরত ছিলেন। তাঁহারা সকলেই হঠযোগী ছিলেন। শিবপদ সকলেরই প্রার্থিত বস্তু ছিল। দৈহিক ক্রিয়া ও ইন্দ্রিয়গ্রামকে প্রাণায়ামাদি দ্বারা নিরুদ্ধ করিয়া অলেখ নিরঞ্জন আত্মার স্বরূপ দর্শন করাই তাঁহাদের সাধনার চরম লক্ষ্য ছিল। ন্যাসের স্থান অনুসারে নাথসিদ্ধগণ হাড়পা, কাণফা প্রভৃতি নামে বিশিষ্টতা লাভ করেন। গোরক্ষনাথের দৃষ্টি ব্রহ্মরন্ধ্রেই স্থাপিত ছিল। তিনি কামিনীকাঞ্চনমুক্ত ও অলৌকিক শক্তিশালী পুরুষ ছিলেন। তিনি নাথ-ধর্ম্মের প্রভূত সংস্কার সাধনও করিয়াছিলেন। কদলীরাজ্যে কামিনী-কাঞ্চন-মোহে মীননাথের পতন হইয়াছিল সত্য। কিন্তু মীননাথ নিজে মিথুনবিরোধী ছিলেন। কাজেই তাঁহার পক্ষে গোরক্ষনাথের গুরু হওয়ার অধিকার ছিল। আমার বিশ্বাস, গোরক্ষনাথের নামের ছায়ায় সকল নাথধর্ম্ম ও নাথ-সম্প্রদায়ের সমাবেশ হইয়া থাকিবে। পরে একই ভাবে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের নামের ছায়ায় বিভিন্ন-পন্থী বৈষ্ণবসম্প্রদায় সম্মিলিত হইয়াছিলেন। তথাপি চক্ষু থাকিলে আমরা দেখিতে পাইব যে, এই সম্মিলন, সমাবেশ বা সমন্বয়ের অন্তরালে পূর্ব্ববিভিন্নতা এবং বৈশিষ্ট্যগুলিও বিদ্যমান আছে। নাথ-সৃষ্টিকাহিনীর ভিত্তি বৌদ্ধ সাহিত্য-দর্শন নহে। বৈদিক সাহিত্যে বা বেদান্তই ইহার মূলে নিহিত আছে। বুদ্ধের আবির্ভাবের দুই তিন শতাব্দী পূর্ব্ব হইতে আর্য্যাবর্ত্তের পূর্ব্বাঞ্চল শৈব-জাতীয় বহু শ্রমণ ব্রাহ্মণ-সম্প্রদায়ের লীলাক্ষেত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। প্রাচীন বেদান্ত ও বৌদ্ধমতে ও বৌদ্ধমতের ভিত্তির উপর পরে বহু সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম ও সাধন-পন্থার সমাবেশ ও সংঘর্ষ হইয়াছিল। তন্মধ্যে অধিকাংশই এক ভাবে না এক ভাবে বৈদিক পরা বিদ্যার সহিত সংশ্লিষ্ট। তাঁহারা যাজক ব্রাহ্মণদিগের পৌরোহিত্য স্বীকার করিতেন না। ইহার আভাস আমরা বক্ষ্যমাণ পুথি-গুলিতে দেখিতে পাই। পিতৃযজ্ঞে বা পিতার শ্রাদ্ধকার্য্যে পুত্র ব্যতীত অন্য পুরোহিতের প্রয়োজন কি আছে? পুত্র ভিন্ন পিতার প্রতি অধিক শ্রদ্ধাবান্ আর কে হইতে পারে? গোরক্ষনাথের ধর্ম্মাদর্শমতে নাথসৃষ্টিকাহিনীতে পুরুষের সহিত প্রকৃতির সংযোগ থাকিতে পারে না; বাস্তবিক পক্ষে ইহার মধ্যে প্রকৃতিকে অলেখ নিরঞ্জনের পশ্চাতেই রাখা হইয়াছে। কিন্তু যখন কালক্রমে গৃহস্থগণ নাথধর্ম্মভুক্ত হইয়া পড়েন এবং পূর্ণভাবে নাথসমাজ বা church গঠিত হয়, তখন তাঁহাদের জীবনাদর্শের অনুযায়ী প্রকৃতি পুরুষ সংযোগাত্মক সাংখ্যভাবের অবতারণা করিতে হইয়াছে। সম্ভবতঃ এই সমাজ গঠন নাথধর্ম্মের আবির্ভাবের বহু বৎসর পরেই সম্ভব হইয়াছিল।

শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয় বলিলেন,—

ডাক্তার শ্রীযুক্ত বেণীমাধব বড়ুয়া মহাশয় "নাথধর্ম্মে সৃষ্টিতত্ত্বের" সহিত ঋগ্বেদের সৃষ্টিতত্ত্বের সাদৃশ্য দেখাইয়া নাথধর্ম্মের প্রাচীনত্ব প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু ঋগ্বেদের সৃষ্টিতত্ত্ব, বিশেষতঃ পুরুষসূক্ত, প্রাচীন বলিয়া প্রতিপন্ন হয় নাই; সুতরাং ঋগ্বেদমূলক হইলে নাথধর্ম্মের সৃষ্টিতত্ত্ব অধিক পুরাতন হইতে পারে না। নাথধর্ম্ম বেদমূলক না হওয়াই সম্ভব। বেলুচিস্তানে, থাদারে ও পাতীতে এবং সিন্ধুদেশে, সেহ্বানে ও সক্করে মুসলমান নাথপন্থী আছে। সিন্ধুদেশে সনাতনপন্থী, শিখ ও হিন্দু নাথপন্থী আছে। ইহারা অনন্ত জ্যোতির উপাসনা করে এবং প্রদীপ

দিবারাত্রি জালাইয়া রাখে। রাজপুতানার আলোয়ার রাজ্যের সেরিকা, ভর্ত্তরি ও ইন্দোর রাজ্যের ছদাখেড়ি নামক স্থানে নাথপন্থীদের আশ্রমে এইরূপ অনন্ত জ্যোতিঃ বা প্রদীপ দিবারাত্রি জালাইয়া রাখা হয়। রাজপুতানা, মধ্যভারত ও গুজরাটের নাথপন্থীদের মধ্যে অগ্নি বা অনন্ত জ্যোতির উপাসনাই প্রবল। বেলুচিস্তান, সিন্ধু, রাজপুতানা, মধ্যভারত ও গুজরাটের নাথধর্ম্মে সাকার অগ্নির উপাসনার যে সাদৃশ্য আছে, তাহা বাঙ্গালার নাথপন্থীদের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় না। পূর্ব্বদেশের অর্থাৎ বাঙ্গালার নাথধর্ম্ম শৈবধর্ম্মের প্রাবল্যের যুগে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ইহা নাথগুরু গোরক্ষনাথের নব প্রতিষ্ঠান। বাঙ্গালা দেশের নাথপন্থীরা অনন্ত জ্যোতিঃ প্রজ্বালিত রাখে না। এই বিষয়ে পশ্চিম-ভারতের নাথধর্ম্মের সহিত পূর্ব্বভারতের বা বাঙ্গালার নাথধর্ম্মের সাদৃশ্য দেখা যায় না। পশ্চিম-ভারতের নাথধর্ম্মের সৃষ্টিতত্ত্ব অন্যরূপ; তাহাতে নিরঞ্জন কর্ত্তৃক অন্ধকার বা শূন্য হইতে অগ্নির বা আলোকের উৎপত্তির কথা আছে। সে উপাখ্যান পূর্ব্বদেশে শুনিতে পাওয়া যায় না। পশ্চিম-ভারতের নাথপন্থীরা বলে যে, উজ্জয়িনীর রাজা বিক্রমাদিত্যের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ভর্ত্তৃহরি নাথসম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। সেই জন্য পশ্চিম-ভারতের নাথসম্প্রদায়ের গুরুগণ ভর্ত্তৃহরি বা ভর্ত্তরি নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। নাথধর্ম্ম বৈদিক ধর্ম্ম অপেক্ষা প্রাচীন বলিয়াই বোধ হয়। কিন্তু পূর্ব্বভারতের নাথধর্ম্ম গোরক্ষনাথ কর্ত্তৃক সংস্কৃত, ইহা আদিম নাথধর্ম্ম নহে।

শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলিলেন,—

আজ নাথধর্ম্ম সম্বন্ধে কতকগুলি নূতন কথা শুনিতে পাইলাম। শ্রীযুক্ত রাখালবাবু মুসলমান নাথপন্থীদের কথা বলিয়াছেন। মুসলমান নাথপন্থীদের কথা আমি পূর্ব্বে কিছুই জানিতাম না। আজ নূতন জিনিষ শেখা গেল। 'প্রবাসী'তে আমি নাথধর্ম্ম সম্বন্ধে কয়েকবার আলোচনা করিয়াছি। সেই উপলক্ষে অন্যান্য স্থানের ন্যায় যোধপুরেও নাথধর্ম্ম সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়াছিলাম। সেখানকার 'দরবার লাইব্রেরী'তে 'গোরখবোধ' নামে একখানি পুথি দেখিতে পাই। তাহার সৃষ্টিতত্ত্বের সঙ্গে হাড়মালার সৃষ্টিতত্ত্ব মোটেই মেলে না। ইহার কারণ বোধ হয় এই যে, গোরক্ষনাথ যে একজনই ছিলেন, তাহা নহে। শঙ্করাচার্য্যের স্থলাভিষিক্ত শিষ্যেরা যেমন শঙ্করাচার্য্য নামে পরিচিত হইয়া আসিতেছেন, সেইরূপ বোধ হয়, গোরক্ষের পরবর্ত্তী অনেক নাথসাধুও গোরক্ষনাথ নামে পরিচিত হইতেন। একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। মহারাষ্ট্র দেশে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার মারাঠী ভাষায় লিখিত ভাষ্য সমেত একখানি গ্রন্থ রচিত হয়—নাম 'জ্ঞানেশ্বরী'। গ্রন্থকারের নাম জ্ঞানেশ্বর, গ্রন্থের রচনা ১২৯০ খৃষ্টাব্দ। এই পুস্তকে গোরক্ষনাথের নাম আছে, আরও লেখা আছে যে, জ্ঞানেশ্বর গোরক্ষনাথ হইতে শিষ্যপরম্পরায় চতুর্থ স্থান অধিকার করেন। সুতরাং এ হিসাবে গোরক্ষনাথ দ্বাদশ শতকে আসিয়া পড়িতেছেন। নানক গোরখের তর্ক ব্যাপারও খুব প্রসিদ্ধ। এ ছাড়া গোরখনাথের সময় সম্বন্ধে বহু মতই প্রচলিত। এইরূপ নানা ব্যাপার দেখিয়া আমি সিদ্ধান্ত করিয়াছি যে, গোরক্ষনাথ একজন নন।

ইহাদের সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক গ্রন্থ আছে। দত্তগোরখসংবাদ, জ্ঞানসিদ্ধান্তযোগ, বিবেক-মার্ত্তণ্ড, নবনাথভক্তিসার—আরও অনেক বই আছে। এগুলি লইয়া বিশেষ সাবধানতার সহিত ইহাদের সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে কথা বলিতে হইবে।

নাথেরা হঠযোগী। হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্ম্মের সহিত মিশিয়া ইহাদের ধর্ম্ম অনেক পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। ইহাদের গ্রন্থে বা মতে বৈদিক, বৌদ্ধ বা নানকপন্থী প্রভৃতি মতবাদ দেখিলেই যে সিদ্ধান্ত করিতে হইবে যে, তাহাদের ধর্ম্ম বেদমূলক, বৌদ্ধমত-মূলক, তাহা নহে। এরূপ করিলে বরং আমরা ভুলই করিব। আমি নির্ব্বিবাদে বিলাতী মত অনুসরণ করিয়া বলিতে চাই না যে, পুরুষসূক্ত অপ্রাচীন। নাথধর্ম্ম বৈদিক ধর্ম্ম অপেক্ষা প্রাচীন, এ কথাও স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি। রাখালবাবু বলিয়াছেন যে, নাথধর্ম্মের উৎপত্তি পশ্চিমে। কিন্তু বাঙ্গালায় যে নাথধর্ম্মের উৎপত্তি হয় নাই, ইহাও বলা যায় না। মীননাথ ও মৎস্যেন্দ্রনাথ, উভয়ে বিভিন্ন ব্যক্তি এবং মৎস্যেন্দ্রনাথ একেবারে বাঙ্গালার লোক। মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয় মৎস্যেন্দ্র-নাথের 'কৌলজ্ঞানবিনির্ণয়' গ্রন্থ হইতে স্পষ্টই প্রতিপন্ন করিয়া দিয়াছেন যে, মৎস্যেন্দ্রনাথ বরিশালের চৈঁদোর লোক। জাতিতে কৈবর্ত্ত।

নাথেদের সৃষ্টিতত্ত্ব আলোচনা করিয়া, এইটাই যে নাথেদের সৃষ্টিতত্ত্ব, এরূপ বলিবার উপায় নাই। কালস্রোতে, স্থান ও গুরুভেদে নাথেদের সৃষ্টিতত্ত্ব নানাভাবে আলোচিত হইয়াছে। বিভিন্ন পুথি পাঠ করিয়া তাহার নির্ণয় করা দরকার।

সভাপতি শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম্ এ, বি এল্ মহাশয় বলিলেন,—

প্রথমে মনে হইয়াছিল যে, হয় ত অদ্যকার এই প্রবন্ধে একটি নীরস বিষয়ের আলোচনা হইবে। কিন্তু পরে দেখা গেল যে, আমরা আশাতীত আনন্দ উপভোগ করিয়াছি। তজ্জন্য প্রবন্ধপাঠক ডাঃ বড়ুয়া মহাশয় এবং আলোচনাকারী শ্রীযুক্ত রাখাল বাবু ও শ্রীযুক্ত অমূল্য বাবুকে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। ডাঃ বড়ুয়া মহাশয় এবং শ্রীযুক্ত রাখাল বাবুকে আমি অনুরোধ করি, তাঁহারা এ বিষয়ের আরও বিস্তৃত আলোচনা করিয়া পরিষদের কোন আগামী অধিবেশনে আমাদিগকে শুনাইবেন। প্রবন্ধোক্ত পুথির সঙ্গে হয় ত পশ্চিম দেশের নাথধর্ম্মের বৈসাদৃশ্য থাকিতে পারে, কিন্তু অদ্যকার আলোচিত সৃষ্টিতত্ত্ব যে বেদের সহিত সাদৃশ্যযুক্ত, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। নাসদীয় সূক্ত ছাড়া বেদের অন্যত্রও সৃষ্টির কথা আছে এবং তাহার সহিতও ইহার সাদৃশ্য আছে। বেদে "অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং" বলিয়া যে ব্রহ্মের নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তাঁহার সহিত নাথধর্ম্মের "নিরঞ্জনে"র ত কোনই পার্থক্য দেখা যায় না। পরন্তু বেদে ব্রহ্মের "নিরঞ্জন" সংজ্ঞাটিও অপরিচিত নহে। তার পর গোরক্ষ-নাথকে নাথগুরু বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহাও হিন্দুধর্ম্মের সহিত মেলে। পাতঞ্জলে ঈশ্বরকে "সঃ পূর্ব্বেষামপি গুরুঃ" বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে।

শ্রীচৈতন্যের জগন্নাথদশক *

শ্রীচৈতন্যদেবের রচিত জগন্নাথদশক, ইদানীং কেহ দেখিয়াছেন বা উহার অস্তিত্ব জানেন বা ইহা কখন মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া জানি না। সন ১২৭৪ সালে ৯৬নং আহীরিটোলা ঠিকানায় শ্রীনৃত্যলাল শীল দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত 'নিত্যকর্ম্ম' পুস্তকের ৫—৬ পৃষ্ঠায় "শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রমুখপদ্মবিনির্গত শ্রীজগন্নাথাষ্টকং" দেখিতে পাই। উহা অত্যন্ত অশুদ্ধ। উহার প্রথম শ্লোক অবিকল উদ্ধৃত হইল,—

"কদাচিৎ কালিন্দীতটে বিপিনসঙ্গীততরল
মদাভি দশনকমল স্বাদু মধুপং।
মাপস্তু ব্রহ্মাম ভবতি গণেশার্চ্চিতপদঃ
জগন্নাথস্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে॥"

১৩২৮ চৈত্র সংখ্যার "সুবর্ণবণিক্‌সমাচারে" দেখিলাম, "কবি বিশ্বম্ভর পানি ও জগন্নাথ-মঙ্গল" প্রবন্ধ-লেখক ডাক্তার শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা মহাশয় বলিতেছেন,—জগন্নাথমঙ্গলের সন ১৩০১ সালের সংস্করণে গ্রন্থশেষে "জগন্নাথের স্তব" নূতন সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে। "জগন্নাথের স্তবটি সেই সর্ব্বজনপরিচিত শ্রীচৈতন্যচন্দ্রমুখপদ্মবিনির্গত শ্রীজগন্নাথাষ্টক।"

তবেই দেখা গেল, ১২৭৪ বঙ্গাব্দে জগন্নাথ অষ্টক প্রথম মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। কিন্তু উহা অত্যন্ত অশুদ্ধ, উহা হইতে প্রকৃত পাঠের উদ্ধার হইবার সম্ভাবনা নাই। সন ১৩০১ সালে যে জগন্নাথ অষ্টক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা আমি দেখি নাই; সুতরাং জানি না, উহা পূর্ব্বোক্ত অষ্টকের শোধিত সংস্করণ কি না। আমি বহু বৎসর পূর্ব্বে আমার গৃহস্থিত পুথিসমূহের মধ্যে তিনখানি প্রাচীন পাতড়া পাই। ঐ তিনখানিতেই তিনটি জগন্নাথদশক লিখিত, জগন্নাথ অষ্টক নহে। তিনখানি পাতড়ার জগন্নাথদশকের পাঠের মেলন করিয়া উহার পাঠোদ্ধার করিয়াছিলাম। আমি বিবেচনা করি, মহাপ্রভু পুরীতে অবস্থানকালে এই জগন্নাথদশক রচনা করিয়া, ইহা দ্বারা জগন্নাথ দেবের স্তব করিয়াছিলেন। উত্তরকালে জগন্নাথদশকের দুইটি শ্লোক নৃত্য বাবুর আদর্শ পাতড়ায় নষ্ট হওয়ায় তৎপ্রকাশিত "নিত্যকর্ম্মে" জগন্নাথদশক, জগন্নাথ অষ্টকের রূপ ধারণ করিয়াছে। আমি যে জগন্নাথদশকের উদ্ধার করিয়াছিলাম, তাহা এই,—

"শ্রী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ॥
কদাচিৎ কালিন্দীতটবিপিনসংসর্গিভবনে
মুদাভীরীনারীবদনকমলস্বাদুমধুপঃ।
রমাশম্ভুব্রহ্মাসুরপতিগণেশার্চ্চিতপদো
জগন্নাথস্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে॥ ১॥

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ২৮শ বার্ষিক দশম মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

করে সব্যে বেণুং শিরসি শিখিপিচ্ছং কটিতটে
দুকূলং নেত্রান্তে সহচরকটাক্ষঞ্চ বিদধন্।
সদা শ্রীমদ্বৃন্দাবনবিপিনলীলাপরিচয়ো
জগন্নাথস্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে॥ ২ ॥

মহাম্ভোধেস্তীরে কনকরুচিরে নীলশিখরে
বসন্ প্রাসাদান্তঃ সহজবলভদ্রেণ বলিনা।
সুভদ্রামধ্যস্থঃ সকলসুরসেবাবসরদো
জগন্নাথস্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে॥ ৩॥

কৃপাপারাবারঃ সজলজলদশ্রেণিরুচিরো
রমাবাণীসেব্যস্ফুরদমলপঙ্কেরুহপদঃ।
সুরেন্দ্রৈরারাধ্যঃ শ্রুতিগণসুখোদ্গীতচরিতো
জগন্নাথস্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে॥ ৪॥

পরং ব্রহ্মাপীড়ঃ কমলবদনোৎফুল্লনয়নো
নিবাসী নীলাদ্রৌ নিহিতচরণোঽনন্তশিরসি।
রসানন্দে রাধাসরসবপুরালিঙ্গনসুখী
জগন্নাথস্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে॥ ৫॥

রথারূঢ়ো গচ্ছন্ পথি মিলিতভূদেবপটলৈ-
স্তুতঃ প্রাদুর্ভাবং প্রতিপদমুপাকর্ণ্য সদয়ঃ।
দয়াসিন্ধুর্বন্ধুঃ সকলজগতাং মুগ্ধসদয়ো
জগন্নাথস্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে॥ ৬॥

বরত্বং সংসারং হততমমসারং সুরপতে
বৃথাভোগাসক্তং সততমপরং দৈবতপথি।
অহং যাচে নিত্যং পরমমচলং নিশ্চিতমিদং
জগন্নাথস্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে॥ ৭॥

নচ প্রাপ্যং রাজ্যং নচ কনকমাহো ন বিভবং
ন যাচেঽহং রম্যাং নিখিলবরকাম্যাং বরবধূং।
সদাকালং কামং প্রমথপতিনোদ্গীতচরিতো
জগন্নাথস্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে॥ ৮॥

ঘনশ্যামাকারঃ সুরমধুরধামা ভবপিতা
মহেন্দ্রাদের্যাদ্যো বররমণরাধার্পিততনুঃ।
লসৎশ্রীবৎসাঙ্কস্তরুণতুলসীমাল্যসুভগো
জগন্নাথস্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে॥ ৯॥

সদানন্দাকারো জগতি জগতাং কিল্বিষহরো
জগন্মূলাধারো জলধিতনয়াসেবিতপদঃ।
জরামৃত্যুধ্বংসী জলদপটলশ্যামলরুচিঃ
জগন্নাথস্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে॥ ১০॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচন্দ্রমাবিরচিতং শ্রীজগন্নাথ-দশকং সমাপ্তং॥

শ্রীশিবচন্দ্র শীল

ভারতীয় সূদবিদ্যা *

আর্য্য ঋষিগণের রচিত গ্রন্থাদি পাঠ করিলে দেখা যায়, পুরাকালে কি দর্শন, কি চিকিৎসা-শাস্ত্র, কি কৃষিশিল্প, কি সূদবিদ্যা বা সূপকারবিদ্যা, সকলেরই চরম উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ বর্ত্তমান প্রবন্ধে সূদবিদ্যা অর্থাৎ পাকপ্রণালীর কিরূপ উন্নতি সাধিত হইয়াছিল, তাহার আলোচনা করিব।

সূদবিদ্যা বা সূপকারবিদ্যা (পাকপ্রণালী) চতুঃষষ্টি কলার অন্যতম। শাস্ত্রে দেখা যায়, উক্ত সূদবিদ্যায় পুণ্যশ্লোক নলরাজাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তৎপরে কুন্তীপুত্র দ্বিতীয় পাণ্ডব মহাবীর ভীমসেন। উক্ত দুই সূদবিদ্যাচার্য্যই পাকপ্রক্রিয়া সাধনার্থ বিভিন্ন গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, অপেক্ষাকৃত অতি প্রাচীন ভীমকৃত পাকশাস্ত্র কুত্রাপি আছে বলিয়া জানা যায় নাই। কিন্তু তদপেক্ষায় প্রাচীনতর মহারাজ নলকৃত পাকশাস্ত্র বিশেষ অনুসন্ধানে পাওয়া গিয়াছে। অদ্য সেই মহারাজ নলকৃত "পাকদর্পণ" হইতে "মাংসৌদন" (পলাউ) পাকের প্রক্রিয়া প্রদর্শন করিতেছি। যাবতীয় সূপকার অপেক্ষা মহারাজ নলের এমনই পাক বিষয়ে বৈচিত্র্য ছিল যে, তাঁহার পাচিত ব্যঞ্জনের স্বাদ অন্যের পাচিত ব্যঞ্জনের সহিত সম্পূর্ণ পৃথক্ হইত।

বনবাসিনী দময়ন্তীকে নিদ্রিতাবস্থায় পরিত্যাগ করিয়া নলরাজা নিরুদ্দেশ হইলে পর, দময়ন্তী বিদর্ভ নগরে পিত্রালয়ে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। বহুতর চেষ্টায়ও নলের অনুসন্ধান না পাইয়া, অনন্যোপায় হইয়া দময়ন্তীর পিতা ভীম ভূপতি, মহাপতিব্রতা দময়ন্তীর পুনঃ স্বয়ম্বরের ছল করিয়া সমস্ত রাজন্যগণকে বিদর্ভ নগরে সমবেত করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে নলরাজা ঋতুপর্ণ রাজার সারথি-রূপে "বাহুক" নাম ধারণ ও বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া উপস্থিত ছিলেন। দময়ন্তী প্রচ্ছন্নভাবে সখী কেশিনী দ্বারা নলের পাচিত মাংসৌদন আনাইয়া, তাহার সদ্গন্ধ ঘ্রাণ করিয়া ও সুরস আস্বাদন করিয়া, এই মাংসপাচককেই নল বলিয়া নিঃসন্দেহরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। নলের এমনই পাক-নৈপুণ্য ছিল। যথা,—

"পুনর্গচ্ছ প্রমত্তস্য বাহুকস্যোপসংস্কৃতং। মহানসাৎ শৃতং মাংসমানয়স্বেহ ভামিনি॥
সা গত্বা বাহুকস্যাগ্রে তন্মাংসমপকৃষ্য চ। অত্যুষ্ণমেব ত্বরিতা তৎক্ষণাৎ প্রিয়কারিণী॥
দময়ন্ত্যৈ ততঃ প্রাদাৎ কেশিনী কুরুনন্দন। সোচিতা নলসিদ্ধস্য মাংসস্য বহুশঃ পুরা।
প্রাশ্য মত্বা নলং সূদং প্রাক্রোশদ্ভৃশ-দুঃখিতা॥" (মহাভারত, বন—৭৫।২০—২৩)।

অর্থ—হে কেশিনি! তুমি পুনর্ব্বার তথায় যাইয়া প্রমাদগ্রস্ত বাহুকের পাচিত মাংস সেই রন্ধনশালা হইতে আনয়ন কর। দময়ন্তীর এরূপ আগ্রহ দেখিয়া কেশিনী পুনর্ব্বার ঐ পাকশালায় যাইয়া, সেই উষ্ণ মাংস অপহরণ করিয়া, দ্রুতগতিতে আনিয়া দময়ন্তীকে প্রদান করিল। পূর্ব্বে দময়ন্তী বহুবারই নলপক্ব মাংসের আস্বাদ বিশেষরূপ অবগত ছিলেন। এখন আবার সেই মাংস ভোজন করিয়া, অবিকল সেই আস্বাদ অনুভব করিয়া, ঋতুপর্ণ রাজার সারথি বাহুককেই নল স্থির করিয়া, অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন।

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ২৭শ বার্ষিক ১ম মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

এতদ্দ্বারা ইহাই সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, নল রাজার সদৃশ পাকবিদ্যায় পরিনিষ্ঠিত আর দ্বিতীয় কেহ ছিল না। অতএব অদ্য নল রাজার কৃত "পাকদর্পণ" গ্রন্থ হইতে প্রথমতঃ মাংস পাকের প্রণালী জ্ঞাপন করিতেছি।

মাংসৌদন (পলাউ)

"ছাগমেষশকুন্তাদি-প্রাণিনাং পললং বুধঃ।
সমাদায় পুনস্তস্য ত্বগন্ত্রাণি সমুৎসৃজেৎ॥
তেষামেকতমং মাংসং ক্ষালয়েদ্বারিণা ততঃ।
অস্থিভিঃ সহ সংছিদ্য নিক্ষিপেত্তস্য ভাজনে॥"

অর্থ—পাঁঠা, মেড়া অথবা অপরাপর পক্ষী প্রভৃতি যে কোন প্রাণীর চর্ম্ম এবং আঁত পরিত্যাগ করিয়া, তাহার মাংস লইয়া প্রক্ষালন করিবে। পরে অস্থির সহিত খণ্ড খণ্ড করিয়া পাত্রে রাখিবে।

উৎক্রামোদকের লক্ষণ

"অনাপলং ততো ভাণ্ডে তণ্ডুলস্তোদকং শুভে।
নিধায় শুদ্ধমুদকং সমং কৃত্বাপয়েৎ সুধীঃ॥
তপ্তে পয়সি তন্মাংসং নিক্ষিপেৎ ক্ষালিতং পুনঃ।
পুনশ্চ নিক্ষিপেত্তত্র কুস্তীং কুস্তম্বরীং বুধঃ।
তপ্তে মাংসে পুনঃ সম্যক্‌শোধয়েৎ চিক্কনং বিনা॥
শীতলঞ্চ পুনঃ কৃত্বা কুসুমৈরধিবাসয়েৎ।
ন্যসেচ্চ মৃগনাভিঞ্চ কর্পূরং হিমবারিচ॥
মুহূর্ত্তমেকং সংস্থাপ্য প্রসূনানি পরিত্যজেৎ।"
এতদুৎক্রামমুদকমাহুঃ সূদবিশারদাঃ॥

অর্থ—উৎক্রাম-জলের লক্ষণ—পরিষ্কার পাত্রে তুষ কঙ্করাদি না থাকে, এইরূপ তণ্ডুলের (চেলেনির) জল রাখিবে এবং যে পরিমাণ তণ্ডুলের জল, সেই পরিমাণে বিশুদ্ধ জল ঐ তণ্ডুল-জলের সহিত মিশাইবে। তৎপরে ঐ জল উষ্ণ করিয়া পূর্ব্বের প্রক্ষালিত মাংস ঢালিয়া দিবে। পুনর্ব্বার তাহাতে কুস্তী (কটফল) ও ধ'নের চূর্ণ নিক্ষেপ করিবে। তৎপরে মাংস চিক্কন সুসিদ্ধ না হইতে (পাকস্ত ত্রিবিধো মন্দশ্চিক্কনঃ খরচিক্কনঃ, বাগ্‌ভট-কল্পে), ঈষত্তপ্ত আভাসিদ্ধ হইলে উত্তমরূপে ঐ জল ঢালিয়া লইবে। তৎপরে ঐ মাংসগালিত জল শীতল হইলে তাহাতে ফেলিয়া সুবাসিত করিবে। দণ্ড দুই কাল রাখিয়া ঐ পুষ্পগুলি উঠাইয়া ফেলিবে। এইরূপ প্রক্রিয়ায় সাধিত জলকে উৎক্রাম জল কহে। ইহা পাকাচার্য্যদিগের পরিভাষা।

উৎক্রাম শব্দের যোগার্থ

"সর্ব্বোদকাতিক্রমণাৎ উৎকৃষ্টত্বাদিদং পয়ঃ।
রসসর্ব্বস্বরূপত্বাদুৎক্রামমিতি কথ্যতে॥"

অর্থ—নিজের উৎকর্ষগুণে এই জল সকল জলকে অতিক্রম করিয়াছে এবং রসের সর্ব্বস্ব সারভূত, এই জন্য ইহাকে উৎক্রাম জল কহে।

"ত্রিভাগপুরিতাং স্থালীং তজ্জলৈশ্চ প্রমাণবিৎ।
স্থাপয়েচ্চ তথা চুল্যাং তপ্তে পয়সি বহ্নিনা॥
চতুর্থাংশান্ ক্ষিপেৎ সম্যক্ ক্ষালিতান্ গৌরতণ্ডুলান্।
ঈষৎ পাকে তু সঞ্জাতে সুশুভে শালিতণ্ডুলে॥
আদায় পক্বপললমপক্বমথবামিষং।
জলে বিলীনে তস্তক্তমঙ্গারেষু সমাবিশেৎ॥
ক্ষীরঞ্চ নারিকেলস্য নবং সর্পিস্তথৈবচ।
ন্যসেত্তত্রৈব রম্যাণি কেতকীকুসুমানি চ॥
নিক্ষিপেৎ সকলাংস্তত্র পর্পটপ্রমুখোত্তমান্।
গন্ধৈঃ কর্পূরকস্তূরীসম্ভবৈশ্চাধিবাসয়েৎ॥
তন্মুখং ছাদয়েৎ সম্যক্ বিধানেন বিচক্ষণঃ।
লিম্পেত্তদগন্ধরক্ষার্থং তদ্রন্ধ্রং কনিকৈক্রবং॥
আবর্ত্তনং পুনঃ কুর্য্যাদঙ্গারেষ্বেব তান্ পুনঃ।
যাবতা মৃদুভাবং স্যাৎ তাবত্তত্র প্রযোজয়েৎ॥
এবমামিষসম্ভূতং দাপয়েদন্নমীদৃশং।
ইদং রুচিকরং বৃষ্যং পথ্যং লঘু বল-প্রদং॥
ধাতুবৃদ্ধিকরত্বাচ্চ ব্রণদোষান্ প্রশাম্যতি॥"

অর্থ—পূর্ব্বপ্রস্তুত উৎক্রাম জল দ্বারা পাকপাত্রের তিন ভাগ পূর্ণ করিবে। উননের উপরে চাপাইয়া জল উষ্ণ হইলে পরে উৎকৃষ্ট শুভ্র তণ্ডুল ধৌত করিয়া অবশিষ্ট চতুর্থ ভাগ পূর্ণ করিবে। তৎপরে যখন দেখিবে, ঐ তণ্ডুল ঈষৎ সিদ্ধ হইয়াছে, তখন পূর্ব্বোক্ত অর্দ্ধপক্ক মাংস অথবা কাঁচা মাংস ঐ পাকপাত্রে ঢালিয়া দিবে। সমস্ত জল যখন শুকাইয়া যাইবে, তখন ঐ অন্নপাত্র জলন্ত অঙ্গারের উপর রাখিয়া, নারিকেলের দুগ্ধ, সদ্যোঘৃত এবং উত্তম কেতকীপুষ্প তাহাতে মিশাইবে এবং পাপর ভাজা প্রভৃতি পিষ্টককে খণ্ড খণ্ড করিয়া তাহাতে মিশাইবে এবং কর্পূর, মৃগনাভি ইত্যাদি গন্ধ দ্রব্য সংযোগে সুবাসিত করিবে। এই সময়ে শরা দ্বারা পাকপাত্রের মুখ বন্ধ করিয়া, ময়দা দ্বারা তাহার ফাঁক বন্ধ করিয়া দিবে। পুনর্ব্বার জলদঙ্গারের উপরে ঐ মাংসপাত্র চাপাইয়া এমন ভাবে অনুমান করিয়া সিদ্ধ করিবে, যাহাতে সেই মাংসৌদন অতীব কোমল হয়। এইরূপে পলাউ অতীব সুস্বাদু, বীর্য্যবর্দ্ধক, হিতকারী, লঘুপাক, বলবর্দ্ধক, সপ্ত ধাতুর পোষক এবং ব্রণ রোগনাশক জানিবে। মাংসপ্রিয় ধনিগণ একবার এইরূপ প্রণালীতে মাংস পাক করিয়া পরীক্ষা করিতে পারেন।

শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাভূষণ

বাঙ্গালা[1] ভাষায় অনুজ্ঞা

বাঙ্গালা ভাষায় সম্ভ্রমার্থে[2] অনুজ্ঞার মধ্যম পুরুষে দু'টি রূপ হয়,—

১। তুমি কর। ২। তুমি করিও।

প্রথমটীতে বর্ত্তমান কাল বুঝায়, দ্বিতীয়টীতে ভবিষ্যৎ সূচনা করে। দুইটী দৃষ্টান্ত দিতেছি—

১। যাহা জান, সত্য করিয়া **বল** (বর্ত্তমান অনুজ্ঞা),

২। সদা সত্য কথা **বলিও** (ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা)।

তুচ্ছার্থ মধ্যম পুরুষে ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞার রূপ নিত্য-বর্ত্তমান (লট্) কালের রূপের সমান। কিন্তু বর্ত্তমান অনুজ্ঞার রূপ নিত্য-বর্ত্তমান কালের রূপ হইতে বিভিন্ন। যেমন—

১। তুই তাহাকে **বলিস্** যে, আমি ভাল আছি। (ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা)

২। তুই তাহাকে **বল্** যে, আমি ভাল আছি। (বর্ত্তমান অনুজ্ঞা)

৩। তুই কি **বলিস্**? (নিত্য-বর্ত্তমান)

ওদিকে কিন্তু সম্ভ্রমার্থ মধ্যমপুরুষে বর্ত্তমান অনুজ্ঞা ও নিত্য-বর্ত্তমানের রূপ একই। যেমন—

১। তুমি সত্য **বল** (বর্ত্তমান অনুজ্ঞা)

২। তুমি কি **বল**? (নিত্য-বর্ত্তমান)

বুঝাইবার জন্য একটী চিত্র দিতেছি:—

	তুমি **করিও**	ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা
নিত্য-বর্ত্তমান	তুই **করিস্**	ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা
নিত্য-বর্ত্তমান	তুমি **কর**	বর্ত্তমান অনুজ্ঞা
	তুই **কর**	বর্ত্তমান অনুজ্ঞা

'না' অর্থ বুঝাইতে কিন্তু আমরা ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞার রূপই ব্যবহার করি। যেমন—

যাহা জানিস্, সত্য করিয়া বল্, মিথ্যা **বলিস্** না।

যাহা জান, সত্য করিয়া বল, মিথ্যা **বলিও** না।

অনুজ্ঞার মান্যার্থ মধ্যম ও প্রথম পুরুষে—আপনি বা তিনি **করুন**। তুচ্ছার্থ প্রথম পুরুষে—সে **করুক**।

এই রূপগুলি বর্ত্তমান কালের রূপ হইতে পৃথক্। পূর্ব্ববঙ্গে 'করুন' স্থানে নিত্য-বর্ত্তমানের 'করেন' দেখিতে পাওয়া যায়। আধুনিক বাঙ্গালা ভাষায় উত্তমপুরুষের অনুজ্ঞায় বর্ত্তমান হইতে

১। ব্যুৎপত্তি বা প্রাচীন রূপ অনুসরণে বানান হইবে বাঙ্গালা (প্রাচীন বা° বঙ্গাল, ১৪ শতকের পারসীতে বঙ্গালহ্), উচ্চারণ অনুসারে বাংলা। "বাঙ্গলা" না ব্যুৎপত্তি-সম্মত, না উচ্চারণগত।

২। তুমি সম্ভ্রমার্থ, আপনি মান্যার্থ ও তুই তুচ্ছার্থ মধ্যম পুরুষ। আমি এই সংজ্ঞাগুলি হেমচন্দ্র বড়ুয়ার অসমীয়া ব্যাকরণ হইতে গ্রহণ করিয়াছি।

পৃথক্ কোন রূপ নাই। এখানে একটা কথা পরিষ্কার করিয়া রাখা ভাল। ভাষাতত্ত্বের হিসাবে 'তুই', 'তুমি' বাস্তবিক যথাক্রমে উত্তমপুরুষের একবচন ও বহুবচন। ইংরেজি thee, you এর কিংবা জর্ম্মান্ deu, Sie এর সঙ্গে তুই, তুমির বচন ও প্রয়োগের তুলনা করা যাইতে পারে।

তুই—<তই, (বৌদ্ধ গান)
{তইআ (সপ্তশতকে)}
<তই, তুই, তুএ (প্রাকৃত ; তৃতীয়ায়)
<তয়া, ত্বয়া (পালি ; তৃতীয়ায়)
<ত্বয়া (সংস্কৃত ; তৃতীয়ায়)

অন্য সমজাত (cognate) ভাষার সঙ্গে তুলনায় দেখি—হিন্দী মৈথিলী 'তূ', মারাঠী 'তূঁ', গুজরাটী 'তুঁ', পঞ্জাবী 'তুঁ', শিন্ধী 'তুঁ', নেপালী 'ত'—এ সমস্তই প্রথমার একবচনে। অবশ্য আসামী ভাষার 'তই' ও উড়িয়ার 'তু' বাঙ্গালা 'তুই' পদেরই মত তুচ্ছার্থ মধ্যমপুরুষ একবচন, এবং আসামী 'তুমি' ও উড়িয়া 'তুম্ভে' বাঙ্গালা 'তুমি' পদেরই মত সম্ভ্রমার্থ মধ্যমপুরুষ একবচন। কিন্তু ভাষাতত্ত্বের দিক্ হইতে বাং তুমি <তুহ্মি (মধ্যবাঙ্গালায়) <তুম্হে (বৌদ্ধগান) <তুম্হে (অপভ্রংশ, প্রাকৃত, পালি, বহুবচনে)। নব্য-হিন্দু-আর্য্য (Neo-Indo-Aryan) ভাষার সহিত তুলনায় মারাঠী 'তুম্হী', গুজরাটী 'তমে', নেপালী 'তিমি', বেদিয়া (Gypsy) 'তুমেন', পাঞ্জাবী 'তুসীঁ', সিন্ধী 'তবহীঁ'—মধ্যম পুরুষের বহুবচনে।

যদি বাঙ্গালা, অপভ্রংশ, প্রাকৃত, পালি ও সংস্কৃতে চর্-ধাতুর বর্ত্তমান কালের অনুজ্ঞার মধ্যম পুরুষের রূপ করা যায়, তবে আমরা দেখিব—

বাং চর্ <প্রা., পা., সং., চর
বাং চর <প্রাচীন বাং., প্রা., চরহ
<পালি চরথ=সং চরত

বাঙ্গালার নিত্য-বর্ত্তমান (লট্) ও অনুজ্ঞার (লোট) সম্ভ্রমার্থ মধ্যম পুরুষের গোলযোগ পালি-যুগের। পালি চরথ, প্রাকৃত চরহ=সং চরত, চরথ উভয়ই।

নব্য-হিন্দু-আর্য্য ভাষাসমূহের সহিত তুলনা করিলে—বাঙ্গালা 'চর্', আসামী, উড়িয়া, হিন্দী, মারাঠী, গুজরাটী, পাঞ্জাবী, নেপালী চর্, সিন্ধী চরি, চরু। বাং, চর, উ. চর, পুরবিয়া চরহ, চর, আস. চরঁা (চন্দ্রবিন্দু প্রক্ষিপ্ত), নে. চরো, চরে, মা. চরা, হি. পা. গুজ. সিন্ধী চরো (<অপভ্রংশ চরহ)। মারাঠী ও আসামী ভিন্ন এই সমস্ত ভাষার নিত্যবর্ত্তমান ও অনুজ্ঞার মধ্যমপুরুষ বহুবচনের রূপ একই।

এক্ষণে ১ম পুরুষের কথা। বাং সে <অর্দ্ধমাগধী সে (১মা ও ৩য়া) <সং তেন (৩য়া); বাং তিনি <সং তানি (যেমন দিদী <দাদী, তিসী <তসী <অতসী) : তুলনায়—বাং সে, উড়িয়া, মৈথিলী সে, আসামী সি, ভোজপুরী সে ; হিন্দী, পঞ্জাবী, সিন্ধী ব্রজবুলি সো—সমস্তই একবচন। বাং 'তিনি' মৈথিলী তনি, ভোজপুরী তৈন্হ, ব্রজ. তিনি, পঞ্জাবী তিনী, সিন্ধী

তিনি, নেপালী তিনুহ। এই সমস্তই কর্ত্তা ভিন্ন অন্য কারকের বহুবচনের শব্দরূপের মূল (stem of oblique cases)।

বাং চরুক <প্রাচীন বাং চরউক <প্রা, চরউ+ক স্বার্থে <সং চরতু।

বাং চরুন <প্রাচীন বাং চরন্তু <প্রা· পা. সং. চরন্তু।

অন্য ভাষার সহিত তুলনা করিলে—বাং চরুক, প্রাচীন বাঙ্গালা চরু, চরউ, চরুক, চরউক, আসামী চরক ; মৈথিলী চরু, চরৌক ; উড়িয়া চরু ; মারাঠী চরো, চরু ; নেপালী চরোস্। স্বার্থে "ক" বাং. আ. ও মৈ. ভাষায় দেখা যাইতেছে।

বাং চরুন, প্রাচীন বাঙ্গালা চরন্তু (আসামী চরোক), মৈথিলী চরৌহ্নি, উড়িয়া চরন্তু, মারাঠী চরোৎ, চরূৎ, নেপালী চরুন্।

বাং, আ. উ. নে. ভিন্ন নব্য-হিন্দু-আর্য্য ভাষায় প্রথম পুরুষের নিত্য-বর্ত্তমান ও অনুজ্ঞার রূপ একই। স্বার্থে "ক" মধ্য-বাঙ্গালায় নিত্য-বর্ত্তমান, বর্ত্তমান অনুজ্ঞা, অতীত ও ভবিষ্যৎ কালের তুচ্ছার্থ প্রথম পুরুষে বিকল্পে ব্যবহৃত হইত ; যেমন সে চরে, চরেক, চরু, চরুক, চরিল, চরিলেক, চরিব, চরিবেক। আধুনিক বাঙ্গালার অনুজ্ঞা হইলে "ক" স্থায়ী হইয়াছে।

ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞার উৎপত্তি কোথা হইতে ? প্রথমে নব্য-হিন্দু-আর্য্য ভাষাসমূহের সহিত তুলনা করিয়া দেখা যাউক। আসামী ও উড়িয়ায় এই ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞার তুল্যরূপ কোন পদ আছে কি না, জানি না। কিন্তু পূরবিয়া হিন্দীতে (Hoernler Eastern Hindi) বাঙ্গালার তুল্যরূপ পাওয়া যায়। যেমন—'চরিহ'।[১] বাঙ্গালার ন্যায় তাহাতেও বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ দুই অনুজ্ঞাই ব্যবহৃত হয়। প্রাচীন সিন্ধী ভাষায় এবং কখন কখন নব্য-সিন্ধী ভাষায় 'চরিহে' এইরূপ অনুজ্ঞার মধ্যম পুরুষে বহুবচনের রূপ পাওয়া যায়। এইরূপ হিন্দী চরিয়ো, প. চরীও।

এক্ষণে ব্যুৎপত্তি হিসাবে, বাং চরিও <চরিহ (প্রাচীন বাং বৌদ্ধগান, কৃষ্ণকীর্ত্তন ইত্যাদি <* চরিহহ <চরিহিহ (অপভ্রংশ, প্রাকৃত) <চরিষ্যথ (সং)।

বাঙ্গালার ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞার তুচ্ছ মধ্যমপুরুষের রূপ নিত্য-বর্ত্তমানের তুল্য হইলেও তাহাদের উৎপত্তি বিভিন্ন বলিয়া বোধ হয়। চরিস্ (অনুজ্ঞা) * চরিসি <চরিহসি (বৌদ্ধগান) <চরিহিসি (প্রাকৃত) <চরিষ্যসি (সং)।

চরিস্ (নিত্য-বর্ত্তমান) <চরসি—(প্রাচীন বাঙ্গালা, বৌদ্ধগান, প্রাকৃত, পালি ও সংস্কৃত)।

বৌদ্ধগানে এই ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞার প্রয়োগ পাওয়া যায়।

১। 498. The pres. imper. may optionally add the following suff. in the 2nd person ; viz., sing. ইহে and plur. ইহ, e. g., পঢ়িহে *read thou*, পঢ়িহ *read you*. This is a respectful form of the imper. implying request or prayer rather than command, and may be called a *precative*. Sometimes it is used in the sense of a simple future. (Hoernle's Com. Gram. of Gaudian Languages, p. 339).

সদ্‌গুরু বোহে করিহ সো নিচ্চল। (ভুসুকু) ৩১ পৃঃ।
জই তুম্মে ভুসুকু অহেই জাইবেঁ মারিহসি পঞ্চজনা
নলণীবন পইসন্তে হোহিসি একুমণা॥ (ভুসুকু) ৪০ পৃঃ।

সংস্কৃত ল্‌ট্‌ হইতে উদ্ভূত মধ্যম পুরুষের ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞার পদ ছাড়া প্রাচীন বাঙ্গালায় প্রথম পুরুষ ও উত্তম পুরুষের পদও দেখা যায়।

	একবচন	বহুবচন
প্রথম পুরুষ—	চরিহে, চরিএ	×
মধ্যম পুরুষ—	*চরিসি	চরিহ
উত্তম পুরুষ—	চরিমো	চরিউ, চরিউ

এইগুলির প্রয়োগের দৃষ্টান্ত, প্রথম পুরুষে, শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন হইতে—

কেহো যবেঁ বেকত **করিহে** এহা কাজ।
আহ্মার থাঁথার তবেঁ তোহ্মে পাইবেঁ লাজ॥ ২৫১ পৃঃ
ধরী তোহ্মে আহ্মার বচনে।
নিষধ রাধাক যতনে॥
আর বার হেন না **করিহে**।
পুরুষের আখি **নিবারিহে**॥ ২৬২ পৃঃ
কান্দিআঁ জাণায়িবোঁ কাঁশে॥
পাছে কাহাঞি মোকে না **দিহে** দোষে॥ ১০০ পৃঃ
যবে কাহ্ন না **মিলিহে** করমের ফলে।
হাতে তুলিআ মো খাইবোঁ গরলে॥ ৩৩৬ পৃঃ
যবেঁ তোরে **মারিহে** পরাণে।
তবেঁ তোকে রাখিব কোণ জনে। ৬৫ পৃঃ
সুণী কি **বুলিহে** বাপ নান্দে।
বাঁশী হারাইলোঁ মো নিন্দে॥ ৩১৪ পৃঃ
শুণীএ যবেঁ সে আইহন বীর।
করেতেঁ তোহ্মা করিব চীর॥ ৪০ পৃঃ
সখি সব নিষধ যতনে।
কেহো তার না **কহিএ** মরণে। ২৫৭ পৃঃ

কৃত্তিবাসের রামায়ণ (বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ সংস্করণ) হইতে—

আইসুক ভৃগুরাম তবেসি প্রাণ **জাইহে**।—উত্তরকাণ্ড, ১১৭ কলম

উত্তমপুরুষে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন হইতে—

কেমনে **বঞ্চিঙমো** মোঞে একসরী কুঞ্জে। ৩৮৭ পৃঃ
আগু হউ রাধা পাঁছে **লইউ** আহ্মে ভার। ১৮৩ পৃঃ
এথাঁ আণ সহ্মে আহ্মে দেখী।
আমৃতে **সিঞ্চিউ**[1] দুই আক্ষী॥ ১৯৯ পৃঃ
যুগতী **করিউ** এবেঁ সুন বড়ায়ি ল
তোর মোর এক মনে। ১২০ পৃঃ
চল রাধা পথ এড়ি **যাইউ** বনে বন। ১২১ পৃঃ
আনহ সকল সখিজন
মেলী **করিউ** যুগতী। ১৪১ পৃঃ
সঙ্কা পার কর **যাইউ** মথুরার হাটে। ১৫৫ পৃঃ
আইস তোর সঙ্গে **জাইউ** বৃন্দাবন। ৩৫৪ পৃঃ

কৃত্তিবাসের রামায়ণ হইতে—

বিস্তারিয়া কহ মুনি **শুনিউ** কথন। উত্তরকাণ্ড, ৫৬ কলম।

চরিএ <চরিহে <* চরিহএ <চরিহই (অপভ্রংশ) <চরিহিই (প্রাকৃত) <চরিষ্যতি (সং)। তুলনায় প্রাচীন-হি. চরিহই, চরিহহি, ব্রজভাষা চরিহৈ, পূরবিয়া-হি. চরী (<*চরিঈ <*চরিহী)[2]। চরিএ পদটী বড় গোলমেলে। মধ্য বাঙ্গালায় ইহার তিন প্রকার প্রয়োগ পাওয়া যায়। (১) বর্ত্তমানে উত্তমপুরুষের বহুবচনে। আহ্মি চরিএ=সং অস্মাভিঃ চর্য্যতে। (২) বর্ত্তমান কর্ম্মবাচ্যে চরিএ=সং চর্য্যতে। (৩) ভবিষ্যতে প্রথম পুরুষে চরিএ=চরিহে=সং চরিষ্যতি। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে বিকল্পে হ লোপের দৃষ্টান্ত যথা,—বারহ, বার; গোহারী, গোআরী; খাহ=খাঅ। চরিমু, চরিহিমু, চরিমো <চরিহিমো, (প্রাকৃত) <চরিষ্যাম (সং)। চরিউ, চরিউ <* চরিহু <চরীসু (অপভ্রংশ) <চরিস্সং (প্রাকৃত) <চরিষ্যামি (সংস্কৃত)।

ব্যুৎপত্তি হইতে দেখা যাইতেছে, 'চরিউ' ও 'চরিমো' এই উভয়ের মধ্যে বচন পরিবর্ত্তন হইয়াছে। তুলনায় বাং চরিউ, চরিউ, ব্রজভাষা চরিহৌ (একবচন), মাড়োয়ারী চরহূ (একবচন)[3]; বাং চরিমু, চরিমো, আসামী চরিম (এক ও বহুবচন), উড়িয়া চরিমি (একবচন), (<প্রাকৃত চরিহিমি)। উড়িয়ার চরিবি পদের বিকারে চরিমি নহে, যেমন Hoernle প্রভৃতি মনে করেন (Hoernle, ৩৬৫ পৃঃ ; Hallam এর Oriya Grammar, ৪৮১ পৃঃ)। সাহিত্যের ভাষা হইতে নির্ব্বাসিত হইলেও প্রাদেশিক ভাবে 'চরিমু' ও 'চরিমো' পদের প্রয়োগ আছে। যেমন দিনাজপুরে চরিম্; মালদহে চরমু, রাজবংশী (রঙ্গপুর) চরিম, চরিমু, চরিমো; ঢাকার চরুম; সিলহটে চরমু; চাক্মায় চরিম্; বরিশালে চরমু।

১। মূলে সিঞ্চউ ছাপার ভুল। টীকায় সিঞ্চিউ দেওয়া হইয়াছে।
২। Gaudian Grammar, ৩৫৩ পৃঃ। ৩। ঐ, ৩৫৮ পৃঃ।

এক সময়ে পশ্চিমবঙ্গ সমেত সমস্ত বাঙ্গালা দেশের সাহিত্যে 'চরিমু' পদের বহুল ব্যবহার ছিল ;—

দৈত্য বলে ঝাট আন মহেশের শূল।
সেনা সনে রাবণায় করিমু নির্মূল॥ (কৃত্তিবাস, উত্তরকাণ্ড, ১০৪ পৃঃ)
শাপ অগ্নি দিমু আজি কোন জনে তরি।
শাপ অগ্নিতে পোড়াইব অযোধ্যা নগরী॥ (ঐ, ২৮১ পৃঃ)
কেহ বলে পরাইমু পীত বসন।
চরণে নূপুর দিমু বলে কোহ্ জন॥
শ্রীকৃষ্ণবিজয় (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ৪র্থ সংস্করণ, ১৫৬ পৃঃ)
প্রভু বলে তোমরা সকলে যাহ ঘরে।
মুঞি আর না যাইমু সংসার ভিতরে॥
(বঙ্গসাহিত্য-পরিচয়, চৈতন্য ভাগবত, ১১৮১ পৃঃ)
আজি তোর গলায় ফেলিমু গোক্ষপাট।
সবংশে কাটিমু তোর হস্তী ঘোড়া ঠাট॥
(ঐ, জয়ানন্দের চৈতন্য-মঙ্গল, ১১৫৬ পৃঃ)
হৃদয়ে ধরিমু তোমার কমল-চরণ।
নয়নে দেখিমু তোমার চাঁদ বদন॥ (ঐ, চৈতন্য-চরিতামৃত, ১২২৫ পৃঃ)

ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞায় ভবিষ্যৎ কালেরও প্রয়োগ হয় ; যেমন, সদা সত্য কথা বলিও, কিংবা সদা সত্য কথা বলিবে।

আসামীতেও এইরূপ[১]। পূরবিয়া হিন্দীতেও এইরূপ প্রয়োগ দেখা যায়[২]। এইরূপ প্রয়োগ বাস্তবিক মূলানুযায়ী। কেন না, সং 'তব্য' প্রত্যয় হইতে বা. আ. পূরবিয়া হিন্দী প্রভৃতি ভাষায় ভবিষ্যতের ইব, অব প্রত্যয় আসিয়াছে : বাং চলিব <চলিঅব্ব <চলিতব্য। ভবিষ্যৎ অর্থই বরং এই সব ভাষায় নূতন সৃষ্টি।

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্

পুস্তক-বিবৃতি

১। Grammatik der Prakrit-sprachen, von R. Pischel.
২। A Comparative Grammar of the Gaudian Languages by A. F. Rudolf Hoernle.
৩। An Introduction to the Maithili Dialect of the Bihari Language, Part I, Grammar, by G. A. Grierson.
৪। Oriya Grammar by E. C. B. Hallam.
৫। A Simplified Pali Grammar by E. Müller.
৬। অসমীয়া ব্যাকরণ, হেমচন্দ্র বরুয়া-প্রণীত।
৭। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ।
৮। রামায়ণ, উত্তরকাণ্ড, ঐ।

১। অস. ব্যাকরণ—৯১ পৃঃ। ২। Gaudian Grammar, ৩৫৫ পৃঃ, ৫০৮ প্যারা।

Scale - 4½ inches = one mile.
উত্তর
রাধাকুণ্ড জলা
দলকাকুণ্ড
জলা
হরিকুণ্ড জলা
তারাজুলী নদী
গড় খাই
গড়ের মৃৎ-প্রাচীর
যাত্রাসিদ্ধি ধর্ম্মঠাকুর
এই স্থানে প্রাচীরের চিহ্ন আছে
জালন্দর বা জালালে
পুকুর
বাঘের
পুকুর
গড়
সুলতানপুর
জালন্দর বা জালালে
বর্ত্তমান চলিত নাম
গড়ের মৃৎ-প্রাচীর
হনুমান দরজা
ভোবলা বা গড় ভবানীপুর মৌজা
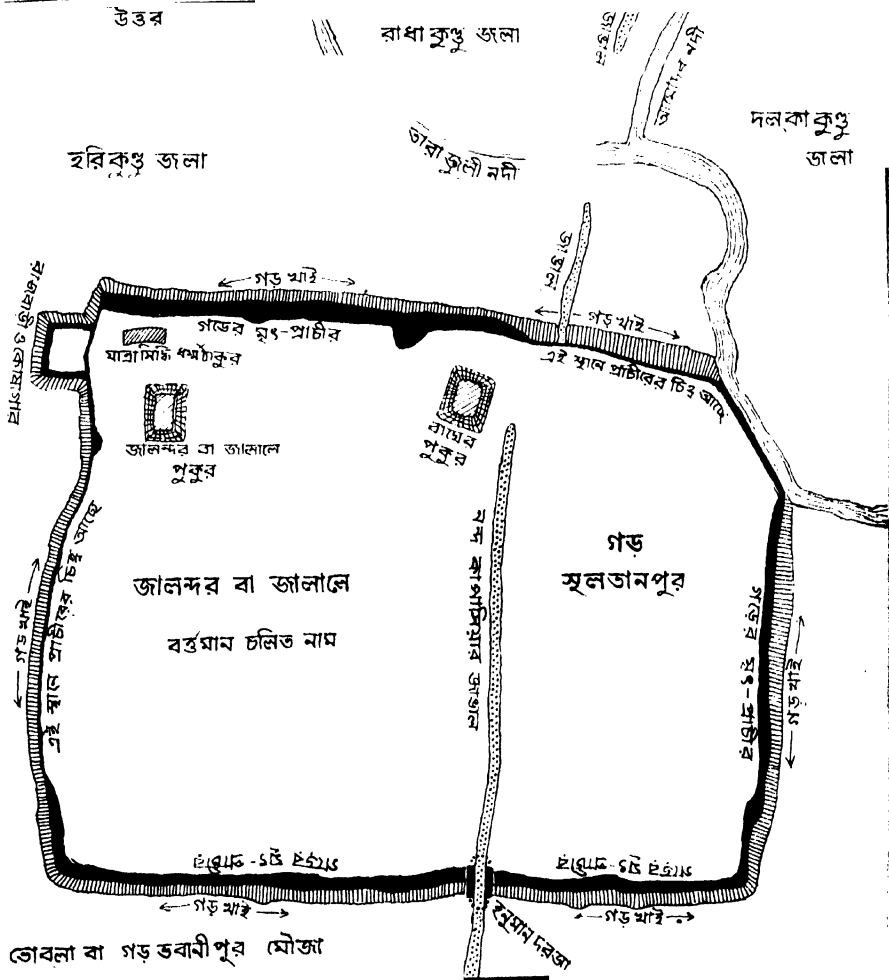
জালন্দার গড়

জালন্দার গড় *

(অস্তিত্বের অনুসন্ধান)

মাণিক গাঙ্গুলী, ঘনরাম প্রভৃতি কবিগণের রচিত ধর্ম্মমঙ্গলে ময়নার রাজা লাউসেনের কামদল বাঘ বধ একটী বিশিষ্ট পালা। লাউসেন, গৌড়াধিপ ধর্ম্মপালের শ্যালিকা রঞ্জাবতীর পুত্র; কর্ণসেন ইহার পিতা। ঢেকুরের ইছাই ঘোষের সহিত যুদ্ধে কর্ণসেনের পুত্রগুলি নিহত হয় এবং বৃদ্ধবয়সে রঞ্জাবতীর পাণি গ্রহণ করিয়া, লাউসেন গৌড়েশ্বরের নিকট "ময়নাভুবন" ইনাম পাইয়া তথায় রাজত্ব করিতে থাকেন। লাউসেন ধর্ম্মের সেবক এবং ধর্ম্মের তথা অন্যান্য দেবতাগণের কৃপা তাঁহার উপর যথেষ্ট। গৌড়েশ্বরের দর্শন কামনায় ময়না হইতে যাত্রা করিয়া, তিনি জালন্দার গড়ে কামদল বাঘ বধ করেন।

কামদল বাঘ বধ পালার উপাখ্যানভাগ এইরূপ,—জল্লাদ বা জালানশিখর জালন্দার গড়ের রাজা ছিলেন। একদা মৃগয়ায় গিয়া তারাদীঘীর জঙ্গলে একটী শার্দ্দূল-শাবক প্রাপ্ত হইয়া পুত্রস্নেহে তাহাকে পালন করিতে থাকেন। রূপী বাঘিনীর বেটা কামদল বাঘ দিনে দিনে প্রচণ্ড বিক্রমশালী ও অত্যাচারী হওয়ায় রাজা তাহাকে পিঞ্জরাবদ্ধ করিয়া রাখেন। কামদল বাঘ ইন্দ্রের নর্ত্তক ছিল; অভিশাপে ব্যাঘ্রজন্ম গ্রহণ করে। জালানশিখর শৈব ছিলেন—তাঁহার ভক্তি পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত হরপার্ব্বতী ভিক্ষার্থ আগমন করেন। রাজা দুর্ব্বুদ্ধিবশতঃ ভিক্ষা না দিয়া, কুকুর "লেলাইয়া" দেন। দেবী কুপিতা হইয়া কামদলকে বন্ধনমুক্ত করিয়া দিলে, কামদল বাঘ নগর ছারখার করিয়া দেয়। রাজা প্রাণভয়ে গৌড়ে আশ্রয় লয়েন। পরে গৌড়েশ্বরও সদলে ব্যাঘ্র দমনে আসিয়া, ব্যাঘ্ররাজ কর্ত্তৃক পরাভূত হইয়া পলায়ন করেন। সেই অবধি কামদল জালন্দার গড়ে রাজা হইয়া বসে ও অজেয় হইয়া উঠে। লাউসেন পরে তাহাকে মারিয়া ফেলেন।

গৌড়ের রাজা ধর্ম্মপাল ও ধর্ম্মমঙ্গলের ধর্ম্মপাল একই কি না, এ বিষয়ে মতভেদ থাকিলেও দশম ও একাদশ শতাব্দীতে লাউসেনের স্থিতিকাল বর্ত্তমান ঐতিহাসিকগণের দ্বারা স্বীকৃত হইয়াছে। ধর্ম্মমঙ্গলের বর্ণিত অনেক স্থানের ও গড়-বাড়ীর নিদর্শন এখনও পাওয়া যায়। জালন্দার গড়ের সংবাদ আজ পর্য্যন্ত কেহ লয়েন নাই এবং তাহার অস্তিত্ব দেখাইতেই এই প্রবন্ধের অবতারণা।

জালন্দার গড়ের নিদর্শন এখন যেখানে পাওয়া যায়, সেই গ্রামের নাম সুলতানপুর। ঘাটাল মহকুমার অন্তর্গত তম্নে বরদার মধ্যে ঐ গণ্ডগ্রামখানি অবস্থিত। ঘাটাল পাকা রাস্তা হইতে বরদার নিকট উত্তর মুখে খড়ার গ্রাম হইয়া একটী রাস্তা গিয়াছে এবং ঐ রাস্তাটী সুলতানপুর গ্রামে গিয়া শেষ হইয়াছে। তৎপরে ঐ গ্রামের জলার মধ্যে স্থানে স্থানে ঐ রাস্তার কিয়দংশ এখনও দৃষ্ট হয়। লোকে সাধারণতঃ ইহাকে "নন্দকাপাসিয়ার জাঙ্গাল" বলে। আমাদের মেদিনীপুর জেলার

---

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ৩০শ বার্ষিক ৬ষ্ঠ মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

একাধিক ইতিহাস রচিত হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, কেহই ইহার উল্লেখ করেন নাই। পুরাকালে এই জাঙ্গালটী একটী বিশিষ্ট রাজবর্ত্ম ছিল, এবং ইহা পুরী যাইবার রাস্তার সহিত পাঁশকুড়ার নিকট মিশিয়াছে; মোগল পাঠানের আমলে বাদসাহী রাস্তা বা সাহী সড়ক[১] জাহানাবাদ (বর্ত্তমান আরামবাগ) হইতে গোয়ালপাড়া (বর্ত্তমান পাঁশকুড়ার সন্নিকট) অবধি বিস্তৃত ছিল। ঐ রাস্তাটী গড়মান্দারন হইতে দারুকেশ্বর নদের কূলে কূলে চিতুয়া অবধি দক্ষিণ পশ্চিমাভিমুখে পাঁশকুড়া অবধি গিয়াছে এবং তথা হইতে মেদিনীপুর হইয়া সুবর্ণরেখার তীরে পুরীরাস্তার সহিত মিলিত হইয়াছে। উত্তর দিক্ হইতে মেদিনীপুর, তথা পুরীধাম যাইবার এইটীই প্রশস্ত রাস্তা ছিল। মোগল পাঠান যুদ্ধের সময় বাদসাহী ফৌজ বহুবার এই রাস্তায় যাতায়াত করিয়াছে। প্রবাদ যে, নন্দকাপাসিয়া নামক একজন উত্তরাঞ্চলের বস্ত্রব্যবসায়ী এই জাঙ্গালটী নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। ঐ রাস্তাই তৎকালে দক্ষিণে যাইবার short cut ছিল। বরদারাজ শোভাসিংহও বিদ্রোহী হইয়া, এই রাস্তা দিয়াই সৈন্য লইয়া গিয়া বর্দ্ধমান প্রভৃতি আক্রমণ করেন। তারাজুলী ও দামোদর নদ এই গড়খাইএর উত্তরে মিলিত হইয়া পূর্ব্বদিকে প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে। এই স্থানটী প্রাচীন কালের দুর্গনির্ম্মাণের বেশ উপযোগী ছিল। নন্দকাপাসিয়ার জাঙ্গাল গড়ের মধ্যস্থল ভেদ করিয়া গিয়াছে এবং দক্ষিণ দিকে যেখানে গড়ে প্রবেশ করিয়াছে, সেখানে একটী বিস্তৃত দ্বার ছিল, তাহাকে এখনও 'হনুমানদরজা' বলিয়া থাকে এবং ইহার ভগ্নাবশেষ এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। গড়ের উত্তর পূর্ব্ব কোণে দল্‌কাকুণ্ড নামে একটী জলা বা বিল আছে। ঐখানেই তারাজুলী ও দামোদর প্রবাহিত হইত। এক্ষণে সরকারী বাঁধের কল্যাণে ঐ নদীদ্বয়ের মুখ বন্ধ হইয়া যাওয়ায় একটী জলা বা বিলে পরিণত হইয়াছে। দল্‌কাকুণ্ড পূর্ব্বকালে দল্‌কি সহর ছিল বলিয়া প্রবাদ এবং ঐ স্থানে সময়ে সময়ে ইষ্টকাদি-নির্ম্মিত গৃহাবশেষ ও ঘাট-বাঁধান পুষ্করিণী দেখা যাইত। ঐ স্থান হইতে একটি সুন্দর প্রস্তর-নির্ম্মিত শিবের লিঙ্গমূর্ত্তি উদ্ধার হইয়া, গ্রামের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া বুড়া শিব বলিয়া পরিচিত আছেন। দল্‌কা নামটী কামদল নামের সহিত সাদৃশ্য আছে। আরামবাগ-গোঘাটের প্রসিদ্ধ ধর্ম্মঠাকুর স্বরূপনারায়ণের "কামিনী" স্বপ্নাদেশে দল্‌কার জলা হইতে পাওয়া গিয়াছে বলিয়া জানা গেল।

গড়ের মৃৎপ্রাচীর, যাহা এখনও অবশিষ্ট আছে, তাহা স্থানে স্থানে ৬০।৭০ ফুট উচ্চ এবং চতুর্দ্দিকে প্রায় এক মাইল ব্যাপিয়া এই প্রাচীর দেওয়া ছিল। গড়ের বায়ুকোণে "জালালে পুকুর" নামক একটী অতি বিস্তৃত দীর্ঘিকা ছিল, এক্ষণে তাহার অনেক মজিয়া গিয়াছে। উহার অতি

১। Badshahi Road—This road starting from Jehanabad where it was joined by roads from Burdwan and Satgaon went south-west to Mandaran, thence south-east along the Darkesvar River to Chitwa in Daspur Thana and thence nearly south to Goalpara near modern Panskura. From this place it apparently passed due east to Midnapur following very much the same line as the Grand Trunk Road and from Midnapur it ran a little to the west of the Orissa Trunk Road through old villages Kesiari and Gageneswar until it joined the Subarnarekha at Jaleswar.

Bengal District Gazetteer.

সন্নিকটে প্রাচীরের বাহিরে কতকটা খালি জায়গা পড়িয়া আছে এবং তদুপরি ইষ্টকাদি স্তূপাকারে রহিয়াছে। এইখানে রাজবাড়ী ও কোষাগার ছিল বলিয়া প্রবাদ। ঐ স্থানেই "যাত্রাসিদ্ধি" নামক "ধর্ম্মবিগ্রহ" বাগ্‌দি পণ্ডিতগণের দ্বারা অদ্যাপি পূজা পাইয়া আসিতেছেন। পণ্ডিতেরা বলেন, ঐ ঠাকুর রাজা লাউসেনের প্রতিষ্ঠিত। পূর্ব্বে ঠাকুরের পাকা মন্দির ছিল, তিনি এক্ষণে কাঁচা ঘরে আছেন। ঐ পণ্ডিতের নিকট আমি দ্বিজ রূপরামকৃত ধর্ম্মমঙ্গলের হস্তলিখিত পুঁথি প্রাপ্ত হইয়াছি। গড়ের নৈর্ঋত কোণে গড়ভবানীপুর বা ভোবলা নামক মৌজায় বাসুলী দেবী গড়রক্ষাকারিণী বলিয়া পরিচিত আছেন। জাঙ্গালের অনতিদূরে "বাঘের পুকুর" নামে একটী পুষ্করিণী আছে, তথায় কামদল বাঘ লাউসেন কর্ত্তৃক হত হইয়াছিল বলিয়া প্রবাদ। কামদল বধ করিয়া লাউসেন জালন্দার গড়ের উত্তরে তারাদীঘীতে কুম্ভীর বধ করিয়াছিলেন। গড়ের উত্তরে তারাজুলী নামক নদী এবং তদুত্তরে তারাহাট নামক একটী প্রাচীন পল্লী ও একটী প্রকাণ্ড দীঘীর অবশেষ এখনও বিদ্যমান আছে।

প্রবাদ ও কাহিনীতে এই স্থান "জালন্দার গড়" বলিয়া ধরা যায়। কিন্তু ধর্ম্মমঙ্গলকারদিগের গৌড়ের পথের বর্ণনায় জালন্দাভূমি বর্দ্ধমানের উত্তর বলিয়া জানা যায়। পথের বর্ণনায় কবিগণ সকলেই প্রায় এক-মতাবলম্বী। ময়নাগড় মেদিনীপুর জেলায় অবস্থিত এবং বর্ত্তমান তমলুক হইতে ১৩।১৪ মাইল। কিন্তু কোন কবিই "জাহানাবাজ" বা বর্ত্তমান আরামবাগের দক্ষিণের পথের বর্ণনা বিশেষ ভাবে করেন নাই। ময়না হইতে তৎকালে আসিতে হইলে নিশ্চয় "নন্দকাপাসিয়ার জাঙ্গাল" দিয়া আসিতে হইত। কারণ, তখন অন্য কোন পথ ছিল না। পাঁশকুড়া হইতে বরদা হইয়া ঐ জাঙ্গাল ঘাটালের রাস্তায় মিশিয়া, আবার উত্তর মুখে বরাবর জালন্দার গড়ের ভিতর দিয়া জাহানাবাদে (জানাবাজে) পৌছিয়াছে। যে স্থানে ঘাটালের রাস্তায় মিলিয়াছে, সেখানে "সরণি" "তিন মুখে" গিয়াছে। ঘনরাম বলিতেছেন,—

লাউসেন ও কর্পূর সেন—

গুরুপদ ভাবি যান পরম কৌতুকে।
কতদূরে সরণি দেখেন তিনমুখে॥
লাউসেন কন ভায়া এবে চল আগে।
পথে দাঁড়াইতে নারি যাব কোন দিগে॥
এতেক কহিল যদি সরস চাতুরী।
কর্পূর কহেন দাদা নিবেদন করি॥
অগ্রগামী তোমার কখন আমি নই।
ভালমন্দ পথের বিশেষ কথা কই॥
যদি যাব মহাশয় পশ্চিম সরণি।
দেখিবে দ্বারকাপুরী অযোধ্যা অবনি॥
মথুরা গোকুল গয়া গোবর্দ্ধন গিরি।
মধুর শ্রীবৃন্দাবন কাশী বিশ্বপুরী॥

এ সকল পুণ্যস্থান করিয়া ভ্রমণ।
ছমাসের পরে যাবে গৌড়ভুবন॥
ঈশান অখিলখণ্ডে যদি যাও ভাই।
তিনমাসে তরণী সরণি সুখে যাই॥
বিরাট তনয় মুখে যদি কর ভর।
ছদিনে পাইবে রাজ্য গৌড় সহর॥

পূর্ব্বোক্ত জাঙ্গালটী যে স্থানে ঘাটালের রাস্তার সহিত মিশিয়াছে, তথায় "তেমাথানি" হইয়াছে। এই তেমাথানি হইতে একটী পথ পশ্চিম দিকে যাইয়া "পুরাতন রাণীগঞ্জ সড়কে" (old Ranigunj Road) মিশিয়াছে এবং এই পথ দিয়াই পূর্ব্বে লোকে হাঁটিয়া "পশ্চিমে" তীর্থ করিতে যাইত। ঈশান কোণ অভিমুখে পথের আর এক মুখ বরাবর বর্ত্তমান সালকিয়া[১] অবধি গিয়াছে এবং ঐ পথে গৌড় যাইতে হইলে সরস্বতী নদী বাহিয়া গঙ্গা দিয়া নৌকাযোগে যাইতে হইত। উত্তরমুখে বরাবর চলিলে জালন্দার গড় হইয়া শীঘ্র গৌড়ে যাইতে পারা যাইত। তাই লাউসেন কহিলেন,—

বিলম্বে নাহিক কার্য্য শীঘ্র চল ভাই।
ছমাস ছাড়িয়া ছদিনের পথে যাই॥
তরাসে তখন ফুটে কহেন কর্পূর।
ও পথের নামে প্রাণ করে দুর দুর॥
লাউসেন বলে কেন কিবা বল ভয়।
কর্পূর কহেন শুন দাদা মহাশয়॥
আগে ঐ অন্ধকার "জালন্দার গড়"।
গৌড়পতি প্রাণ লয়ে যায় দিল রড়॥—ইত্যাদি।

সুতরাং এখানে পথের সহিত বর্ণনা মিলিয়াছে। কেবল "জানাবাজ" যাইবার পূর্ব্বে এই "জালন্দার গড়ের" বর্ণনা পাইলে ইহা যে নিশ্চয় সেই জালন্দার গড়, তাহা নিঃসংশয়ে অনুমান করা যাইত। এই সঙ্গে একখানি মানচিত্র দেওয়া গেল এবং আবশ্যকীয় স্থানগুলি চিহ্নিত করা হইয়াছে।

উপসংহারে আমার বক্তব্য এই যে, উল্লিখিত স্থানটী "জালন্দার গড়" বলিয়া বিশেষ প্রতীতি হয় এবং প্রবাদ ও কিম্বদন্তী তথায় লোকের মুখে মুখে আজও পূর্ব্বের ন্যায় প্রচারিত হইয়া আসিতেছে। ঐ স্থানটী বাগ্দিপ্রধান। এই বাগ্দিদেরই রাজা কামদলকে বাঘ বলিয়া

১। Salkhia as a centre from which four Roads radiated + + + + The fourth connected Salkhia with Tanna Fort and turned west to Sankrail and Amta where it bifurcated—one branch going to Ghatal and Khirpai and the other south-west to Midnapur.—Bengal District Gazetteer.

পরিচিত করা হইয়াছে বলিয়া বিশ্বাস। এই বাগ্দিরা এক্ষণে সামান্য কৃষিজীবী হইলেও, এখনও তাহারা আপনাদিগকে বিশেষ মর্য্যাদাবান্ মনে করে। কারণ, তাহারা সেখানের "রাজার জাতি"; তাহাদেরই কামদল বাঘ এককালে ঐ স্থানের অধিপতি ছিল। বাগ্দিদের ব্রাহ্মণ পৃথক্ এবং ঐ ব্রাহ্মণবংশ এখনও রাজপুরোহিত আখ্যায় ভূষিত ও গর্ব্বান্বিত। আমার আরও বিশ্বাস, ঐ স্থানের অনতিদূরে কবিকঙ্কণের "কালকেতুর" লীলাক্ষেত্র ছিল এবং তাহার রাজধানী গুজরাটের কিছু কিছু সন্ধান পাইতেছি এবং অন্যান্য উপাদান সংগ্রহের চেষ্টা করিতেছি।

শ্রীমৃগাঙ্কনাথ রায়

বৈষ্ণব-সাহিত্যে সামাজিক ইতিহাসের উপকরণ *

হিন্দুধর্ম্মের পুনরভ্যুত্থান ও বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনের প্রতিষ্ঠা

বাঙ্গালার আদি বৈষ্ণব কবি জয়দেব যে দিন তাঁহার "কোমল-কান্ত-পদাবলী" গাহিয়া সারস্বত কুঞ্জ মুখরিত করিয়া তুলিলেন, সেই দিন বাঙ্গালার জাতীয় জীবনে প্রাণপুরুষের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, এই পরিচয় পাওয়া গেল। বাঙ্গালার প্রকৃতিতে যেন শ্রীরাধাকৃষ্ণের মধুর লীলার ভাব-রহস্য নিহিত রহিয়াছে। জ্যোৎস্না-প্লাবিত রজনীতে "শারদোৎফুল্লমল্লিকা" দর্শনে যদি কোন দেশের প্রাণ নাচিয়া উঠে, তবে সে আমার এই বঙ্গদেশের। এই দেশের জলে স্থলে বাতাসে যেন বৈষ্ণব-গীতিকবিতার সুর মাখান রহিয়াছে। (ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশ হইতে উদ্ভূত "ভক্ত," "ভাগবত," "বৈষ্ণব," "বৈখানস" প্রভৃতি প্রাচীন সম্প্রদায় বা বর্ত্তমানের "শ্রী," "ব্রহ্ম," "রুদ্র" বা "সনক"-সম্প্রদায়ের উপাস্য দেবতা প্রভুভাবের অনন্তমূর্ত্তি বা নারায়ণমূর্ত্তি বা বড় জোর লক্ষ্মীনারায়ণ-মূর্ত্তি। শ্রীবালগোপাল উপাসনায় বাৎসল্য রসেই ভারতীয় মাধুর্য্য-রস-সাধনার চরম উৎকর্ষ প্রকটিত হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত-প্রণেতা শ্রীবিল্বমঙ্গল প্রভৃতি দুই চারিজন মহাভাগ্যবান্ সাধক শ্রীরাধাকৃষ্ণের মধুরলীলার রস আস্বাদন করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু মহাভাব-স্বরূপিণী শ্রীরাধার প্রেম-মাহাত্ম্য আমাদের এই বঙ্গদেশেই প্রণালীবদ্ধভাবে উপলব্ধ ও প্রচারিত হইয়াছিল। বঙ্গদেশই মধুর-রস-ভজনের প্রকৃষ্ট স্থান দেখিয়া পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ পাদে শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুরূপে প্রেম মূর্ত্তিমান্ হইয়া এই দেশে প্রকটিত হইয়াছিল। এই দেশের অন্যান্য সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়েরই উদ্ভব বঙ্গবহির্ভূত কোন প্রদেশে। কেবলমাত্র শ্রীরাধাকৃষ্ণ-লীলা উপাসনাযুক্ত বৈষ্ণবধর্ম্মই এই দেশের বক্ষোভেদ করিয়া উত্থিত হইয়াছে।) তাই বৈষ্ণবগীতি-কবিতা বাঙ্গালার একবারে নিজস্ব সম্পত্তি, আর এই গীতিকবিতার আলোচনায় বাঙ্গালীর প্রাণ যতটা মাতিয়া উঠে, এত আর কিছুতেই উঠে না। ইহুদি জাতির প্রাণ লুক্কায়িত যেমন ধর্ম্মের মধ্যে, প্রাচীন গ্রীসের যেমন ছিল কলা-সাহিত্যের মধ্যে ও রোমের শৃঙ্খলা ও সাম্রাজ্যবাদের মধ্যে, তেমনি মনে হয়, বাঙ্গালার প্রাণ লুক্কায়িত আছে বৈষ্ণব গীতি-কবিতার মধ্যে। তাই কবি জয়দেবের "গীতগোবিন্দ" দ্বারা বাঙ্গালার জাতীয় জীবন-প্রতিষ্ঠা সূচিত হইল। ভাব-প্রবণ বাঙ্গালী মধুর পদাবলীর মধ্যে তাহার অন্তরতম ভাবকে খুঁজিয়া পাইল।

রাষ্ট্রীয় বিপ্লব ও আবর্ত্তন এতকাল এই জাতীয় জীবনের নিজস্ব ভাবস্রোতের গতি রুদ্ধ করিয়াছিল। প্রিয়দর্শী অশোকের সময় হইতে স্কন্দগুপ্তের সময় পর্য্যন্ত বঙ্গের ভাগ্যচক্র সমগ্র উত্তরাপথের ইতিহাসের সহিত আবর্ত্তিত হইত। গুপ্তবংশের অধঃপতনকাল হইতে আরম্ভ করিয়া ধর্ম্মপালদেবের অভ্যুদয় পর্য্যন্ত বঙ্গদেশ হয় কামরূপ, কান্যকুব্জ, গুর্জ্জর বা রাষ্ট্রকূটের অধিপতিগণ দ্বারা আক্রান্ত হইত। পালবংশের শাসনকালেই সমগ্র বঙ্গদেশ যথার্থভাবে নিজস্ব শাসনকর্ত্তা পাইল। পরাক্রম-

* ব্যোমকেশ মুস্তফী সুবর্ণপদক প্রাপ্ত।

শালী পালরাজগণ বঙ্গ, গৌড়, রাঢ়, বরেন্দ্র, মিথিলা প্রভৃতি বঙ্গদেশের খণ্ডাংশগুলিকে স্বীয় অধিকারে আনিয়া সর্ব্বপ্রথমে এই দেশকে একটী রাষ্ট্রীয় একতা প্রদান করিলেন। কিন্তু তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম্ম পালরাজগণের কুলধর্ম্ম হওয়ায় প্রজাসাধারণকে এই ধর্ম্ম মানিয়া চলিতে হইত। সুতরাং রাষ্ট্রীয় স্বাতন্ত্র্য হইলেও ভাবস্বাতন্ত্র্য তখনও বাঙ্গালার লাভ হয় নাই। সেনরাজগণ এই দেশের শৈব ও বৈষ্ণব রাজা ছিলেন। তাঁহাদের সময় হইতেই বঙ্গদেশে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতিক্রিয়াস্বরূপে হিন্দুধর্ম্মের পুনর্জ্জাগরণ আরম্ভ হয়। (এই আন্দোলনকে আমরা Hindu Renaissance বা হিন্দুধর্ম্মের পুনরভ্যুত্থান নামে অভিহিত করিতে পারি।)

পেট্রার্কের ইতালীয় ভাষায় লিখিত লরার প্রতি প্রেমের কবিতাগুলিই যেমন ইউরোপের Renaissanceএর সূচনা করিয়াছিল, আমাদের দেশেও সেইরূপ জয়দেবের কবিতা নব জাগরণের সূত্রপাত করিল। গীতগোবিন্দের পদাবলী বাঙ্গালীর হৃদয়ের পুঞ্জীভূত ভাবরাজিকে যেন ভাষা প্রদান করিল—সে ইহাতে এতই মুগ্ধ হইল যে, এই মধুর ভাবকে জাতীয় জীবনের চরম সাধনারূপে স্থাপিত করিবার জন্য সে বদ্ধপরিকর হইল। জয়দেব বাঙ্গালী—তাঁহার কবিতা সংস্কৃত সমাস ও বিভক্তিযুক্ত হইলেও কোমলতায় ও পদসারল্যে তাহা বাঙ্গালাই। জয়দেবের সময় বঙ্গদেশ আত্মানুসন্ধানের পথে দাঁড়াইয়াছিল। জাতীয় ভাষার উন্নতি ব্যতীত জাতীয় জাগরণ স্ফূর্ত্তি লাভ করিতে পারে না। 'প্রাকৃতচন্দ্রিকায়' কৃষ্ণ পণ্ডিত (দ্বাদশ শতাব্দী) গৌড়ীয় ভাষাকে স্থান দান করিয়াছেন; তাহা হইতেই প্রমাণিত হয় যে, ইতালীর ন্যায় বাঙ্গালীও নবজাগরণের প্রারম্ভে নিজস্ব ভাষার উন্নতিতে মনোনিবেশ করিয়াছিল।

দ্বাদশ শতাব্দী হইতে পঞ্চদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত ইতালীর নবজাগরণের যুগ। ঐ সময়ে ইতালী বিদেশীয় আক্রমণ ও অত্যাচারে এবং স্বদেশীয়গণের গৃহবিবাদে জর্জ্জরিত। কিন্তু এত রাষ্ট্রীয় বিপ্লবের মধ্যেও ইতালী একনিষ্ঠভাবে ইউরোপের মুক্তির জন্য সাধনা করিতেছিল। বঙ্গদেশও ঠিক ঐ সময়েই পাঠান আক্রমণ ও অধিকারের ফলস্বরূপ(রাষ্ট্রীয় বিপ্লবের মধ্যে হিন্দুধর্ম্মের পুনরভ্যুত্থানের জন্য প্রাণপণ সাধনা করিতেছিল।)

কিন্তু এই সাধনার দুইটী প্রধান অন্তরায় ছিল। (নবজাগরণের আন্দোলন এই অন্তরায়দ্বয়ের সহিত যুদ্ধ করিতে যাইয়া শক্তিই সঞ্চয় করিয়াছিল এবং তাহারই ফলে ষোড়শ শতাব্দীর বৈষ্ণব-সাহিত্যে হিন্দুজীবনের এক নব অভ্যুদয়ের চিত্র দেখিতে পাই।)(বাঙ্গালার ধর্ম্মে কর্ম্মে ও জ্ঞানে জাতীয় ভাববিকাশের প্রধান অন্তরায় ছিল তথাকথিত বৌদ্ধধর্ম্ম। দ্বাদশ শতকের শেষ পাদেও বঙ্গদেশে যে বুদ্ধদেবের পবিত্র নাম পূজিত হইত, তাহার প্রমাণ জয়দেবের দশাবতারস্তোত্রের মধ্যে বুদ্ধদেবের স্তোত্র হইতে পাওয়া যায়। ভোটদেশীয় বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাস-লেখক তারানাথ খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতেও বঙ্গে বৌদ্ধ নিদর্শন দেখিয়াছিলেন। ১৬০৮ খৃঃ অঃ তিব্বতদেশীয় পণ্ডিত বুদ্ধগুপ্তনাথ বঙ্গদেশে বৌদ্ধধর্ম্মের অল্প পরিমাণ প্রভাব দেখিতে পাইয়াছিলেন। আজও বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব এ দেশ হইতে একবারে বিলুপ্ত হয় নাই, তাহা ধর্ম্মঠাকুরের প্রকৃত তত্ত্ব বাহির করিয়া মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহোদয় ঘোষণা করিয়াছেন।

প্রকৃত বৌদ্ধধর্ম্ম কিন্তু বহুকাল পূর্ব্বেও ভারতবর্ষে লোপ পাইয়াছিল। মন্ত্রযান ও বজ্রযানের সম্মিলনজাত এক অপধর্ম্ম পালরাজগণের সময়ে বঙ্গদেশকে অধিকার করিয়া বসিয়াছিল। এই অপধর্ম্মের আচার ব্যবহার বাঙ্গালা ও উড়িষ্যার জাতীয় জীবনের উপর এতই কলুষিত প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল যে, চতুর্দ্দশ শতাব্দী পর্য্যন্ত স্ত্রীপুরুষের মধ্যে শ্লীলতার স্বাভাবিক ব্যবধান অতি অল্পই রক্ষিত হইত। তথাকথিত বৌদ্ধগণের আচার ব্যবহার অত্যন্ত কদর্য্য ছিল বলিয়া বোধ হয়, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বৌদ্ধগণ আলাপের—এমন কি, দর্শনের পর্য্যন্ত অযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে।

যদ্যপি অসম্ভাষ্য বৌদ্ধ অযুক্ত দেখিতে।
তথাপি বলিলা প্রভু গর্ব্ব খণ্ডাইতে। ২৮—৮।

"বাঙ্গালার ইতিহাসে" শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় দেখাইয়াছেন যে, "মুসলমানগণের বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রতি যত বিদ্বেষ ছিল, হিন্দু ধর্ম্মের প্রতি তত অধিক ছিল না।" কিন্তু বাঙ্গালার হিন্দু অভ্যুদয়ের আন্দোলন শুধু মুসলমানগণের উপরই সদ্ধর্ম্মের বিলোপনের ভার দিয়া নিশ্চিন্ত ছিল না। বঙ্গ-নিকুঞ্জের মধুর পিক চণ্ডিদাস ও বিদ্যাপতি বাঙ্গালীর প্রাণের গান বৈষ্ণব-পদাবলী গাহিয়া জনসাধারণের মনোহরণ করিতেছিলেন। এই অপূর্ব্ব পদাবলীর মোহন ধ্বনিতে বাঙ্গালীর প্রাণের গোপন তন্ত্রী বাজিয়া উঠায় দলে দলে লোক হিন্দুধর্ম্মানুমোদিত মধুর রসের উপাসনার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল। ইহা ছাড়া প্রাচীন হিন্দু পুরাণ ও ইতিহাসগুলির যথেষ্ট আলোচনা হইতে লাগিল। দেশের ভাষায় না বলিলে দেশবাসী জনসাধারণের প্রাণস্পর্শ করিবে না জানিয়া, রামায়ণ, মহাভারত ও শ্রীমদ্ভাগবতের বহুল অনুবাদ হইতে লাগিল। ইহার ফলেও নরনারী হিন্দুধর্ম্মের দিকে আকৃষ্ট হইতে লাগিল। বৌদ্ধতন্ত্রের স্থলে হিন্দুতন্ত্র ব্যাখ্যাত হইতে আরম্ভ করিল। চণ্ডী, মনসা, শীতলা প্রভৃতি লৌকিক দেবতার পূজার প্রচলন দ্বারাও হিন্দুধর্ম্ম সাধারণের মন আকর্ষণ করিল। এইরূপে বৌদ্ধ ধর্ম্মের সহিত যুদ্ধ করিতে যাইয়া বাঙ্গালা দেশে জাতীয় ভাষা ও জাতীয় ভাবের প্রতিষ্ঠা হইল।)

(হিন্দু ধর্ম্মের পুনরভ্যুত্থানের দ্বিতীয় শত্রু হইয়াছিল মুসলমান ধর্ম্ম। মুসলমানগণ বঙ্গদেশ অধিকার করার পর শুধু যে তরবারির সাহায্যে তাঁহাদের ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন, তাহা নহে। অবশ্য অনেকেই রাজানুগ্রহ লাভের আশায় বা রাজ উৎপীড়নের ভয়ে মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু এক শ্রেণীর লোক মুসলমান পীর ও তাপসগণের মহান্ ধর্ম্মপ্রবণতায় আকৃষ্ট হইয়াও ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। আবার হিন্দুসমাজের নিকৃষ্ট জাতিসমূহও উচ্চ সম্মান লাভের আশায় রাজধর্ম্মে যোগদান করিয়াছিলেন। এই ত্রিবিধ আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্য হিন্দুসমাজ বদ্ধপরিকর হইল। হিন্দুসমাজের, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণগণের শিথিলপ্রায় আচার ব্যবহার আবার সুনিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য স্মৃতিশাস্ত্রের পুনরালোচনা হইতে লাগিল। প্রাচীন স্মৃতির যে সমস্ত অনুশাসন কালোপযোগী নহে, তাহা বাদ দিয়া ও যে সমস্ত আচার সমাজ রক্ষার জন্য সবিশেষ প্রয়োজন, তাহা স্মৃতিশাস্ত্রের অঙ্গীভূত করিয়া এক নব্য স্মৃতি রচিত হইতে লাগিল। একদিকে

এই নব্য স্মৃতির সৃষ্টি হয় নাই; দুই তিন শতাব্দী ধরিয়া হিন্দুসমাজকে মুসলমান প্রভাব হইতে রক্ষা করিয়া সুসংস্কৃত করিবার যে আন্দোলন চলিতেছিল, তাহারই ফলস্বরূপ হইতেছেন স্মার্ত্ত রঘুনন্দন। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের নিকট শুনিয়াছি যে, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহোদয়ের নিকট রঘুনন্দনের পূর্ব্ববর্ত্তী স্মার্ত্তগণের স্মৃতিনিবন্ধের পুঁথি আছে। সেই পুঁথি হইতে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, রঘুনন্দনের স্মৃতির অধিকাংশই তাঁহার নিজের লেখা নহে। সুতরাং নব্য স্মৃতি ব্যক্তিবিশেষের মস্তিষ্কপ্রসূত নহে, বাঙ্গালায় নব জাগরণের আন্দোলনের ফল, তাহা প্রমাণিত হইল।

হিন্দুসমাজ শুধু স্মৃতিশাস্ত্র রচনা করিয়াই সমাজ রক্ষা সম্বন্ধে নিশ্চেষ্ট হন নাই। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ প্রভৃতি উচ্চ জাতির মধ্যে বৌদ্ধ বা মুসলমান ধর্ম্মের সংস্পর্শে যে সমস্ত গলদ ঢুকিয়াছিল, তাহাও পঞ্চদশ শতাব্দীতে নব জাগরণের দিনে বিদূরিত হইল। ১৪৮০ খৃঃ অঃ দেবীবর ঘটক রাঢ়ীয় কুলীন ব্রাহ্মণ-সমাজের সংস্কার সাধন করিয়া মেল নিয়ম প্রচলিত করিলেন। এই ঘটনার কিছু কাল পূর্ব্বে বারেন্দ্র-কুলশাস্ত্র-বিশারদ উদয়নাচার্য্য, ভাদুড়ী বারেন্দ্র কুলীন-সমাজকে আটটী পটিতে বিভক্ত করেন। এ দিকে দক্ষিণবঙ্গে দেবীবরের সমকালবর্ত্তী পরমানন্দ বসু দক্ষিণ-রাঢ়ীয় কায়স্থ-সমাজে পুত্র পৌত্রাদিক্রমে সমান পর্য্যায়ে বিবাহ দিবার কুলবিধি প্রচারিত করিয়াছিলেন। এই সময়ে চন্দ্রদ্বীপেও রাজা পরমানন্দ রায় বঙ্গজ কায়স্থদিগের সামাজিক কুলাচার সম্বন্ধে কতকগুলি নিয়ম অবধারণ করিয়া যান।

পদাবলী, পুরাণ, ইতিহাস, তন্ত্র ও স্মৃতির আলোচনা ছাড়া নব্য ন্যায়ের চর্চ্চাও বঙ্গদেশে হিন্দু-ধর্ম্মের পুনরভ্যুত্থানের, তথা বাঙ্গালীর নব জাগরণের, বিশেষ সহায়তা করিয়াছিল। মিথিলা এই নব্য ন্যায়ের আদিস্থান ছিল। বৌদ্ধ ও মুসলমান ধর্ম্মকে যুক্তি দ্বারা পরাভব করিয়া হিন্দু ধর্ম্মের প্রাধান্য স্থাপনের জন্য নব জাগরণের আন্দোলন তর্কশাস্ত্রের সাহায্যেই বৌদ্ধ ধর্ম্মকে পরাভূত করিয়াছিল। যথা,—

তর্কপ্রধান বৌদ্ধশাস্ত্র নব মতে।
তর্কেই খণ্ডিল প্রভু না পারে স্থাপিতে॥
বৌদ্ধাচার্য্য নব নব প্রশ্ন উঠাইল।
দৃঢ় যুক্তি তর্কে প্রভু খণ্ড খণ্ড কৈল॥—চৈঃ চঃ।

বঙ্গদেশে কিয়ৎকাল বসবাস করিবার পর এই দেশের শাস্ত্র ও আচার ব্যবহার জানিবার জন্য মুসলমানগণের মধ্যে এক প্রকার আগ্রহ জন্মিল। মুসলমান অধিপতিগণ উৎসাহ দিয়া মহাভারত, ভাগবত প্রভৃতি অনুবাদ করাইলেন। তাহাতে বঙ্গভাষার সমৃদ্ধি সাধন হওয়ায় বাঙ্গালায় নব জাগরণের যথেষ্ট আনুকূল্য সাধিত হইয়াছিল।

এই নব জাগরণের আন্দোলন ফলে বঙ্গদেশ সমগ্র ভারতবর্ষের সহিত অন্তরের যোগ অক্ষুণ্ণ রাখিয়াও নিজের স্বাতন্ত্র্য প্রকাশ করিল। ইউরোপীয় Renaissanceএ যেমন প্রাচীন গ্রীক ও লাটিন সাহিত্যের আলোচনার ফলে দেশব্যাপী এক নব জীবনের সঞ্চার হইয়াছিল এবং পরিণামে

জাতীয়ভাব প্রচারিত হইয়াছিল, আমাদের দেশেও তদ্রূপ বিদ্যালোচনার সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গদেশের জাতীয়ভাব বিকশিত হইল। রঘুনন্দনের স্মৃতি বঙ্গদেশ ব্যতীত আর কোথাও প্রচলিত নাই। কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ সমগ্র তন্ত্রের সার উদ্ধার করিয়া বাঙ্গালার শক্তি-পূজার এক অভিনব সুগম পন্থা আবিষ্কার করিয়া দিয়া গেলেন। আর কাণভট্ট শিরোমণি তাঁহার অলোকসামান্য প্রতিভার প্রখর জ্যোতিঃসম্পাতে নব্য ন্যায়দর্শনকে বাঙ্গালীর নিজস্ব সম্পত্তিরূপে পরিণত করিলেন। তাঁহার পূর্ব্বে বঙ্গের বিদ্যাপীঠ নদীয়ার উপাধি ভারতীয় পণ্ডিতসমাজে তাদৃশ শ্রদ্ধা পাইত না, তিনি নদীয়ার উপাধিকে ভারতের শ্রেষ্ঠ উপাধি করিলেন।

বঙ্গদেশে পীঠস্থান ছাড়া তীর্থ ছিল না—মহাপ্রভু নবদ্বীপকে বঙ্গের তীর্থ করিয়া তুলিলেন। বঙ্গদেশ যে ভারতের গতানুগতিক চিন্তাধারা বর্জ্জন করিয়া স্বাধীনভাবে নিজের জাতীয় জীবনের সমস্যার সমাধান করিতে পারে, নব্য ন্যায়, নব্য স্মৃতি, তন্ত্র ও বিশেষ করিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মদ্বারা তাহাই প্রমাণীকৃত হইল। এই স্বাধীনভাবে চিন্তা করাই নব জাগরণের বৈশিষ্ট্য।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব্ব অবস্থা বর্ণনা করিতে যাইয়া বৈষ্ণব কবিগণ বিদ্যা-জগতের এক মহা সমৃদ্ধ অবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন। ঐ বর্ণনার যাথার্থ্য যাহাতে আমরা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি, তজ্জন্য বঙ্গের নবজাগরণের ইতিহাসের সংক্ষেপে আলোচনা করিলাম। বাঙ্গালার পরবর্ত্তী সামাজিক ইতিহাস বুঝিবার পক্ষেও এই নবজাগরণের ইতিহাস অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

বৈষ্ণব-সাহিত্যে নবজাগরণের চিত্র

(ইতালীর ফ্লরেন্সের ন্যায় নবদ্বীপ নবজাগরণের আন্দোলনের কেন্দ্রস্বরূপ হইয়াছিল। পঞ্চদশ শতাব্দীতে নবদ্বীপ বিদ্যারসে একেবারে উন্মত্ত হইয়াছিল। শ্রীচৈতন্যভাগবতে শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর লিখিয়াছেন,—

> নবদ্বীপের সম্পত্তি কে বর্ণিতে পারে।
> একো গঙ্গাঘাটে লক্ষ লোক স্নান করে॥
> ত্রিবিধ বয়সে একো জাতি লক্ষ লক্ষ।
> সরস্বতীদৃষ্টিপাতে সভে মহাদক্ষ॥
> সভে মহা অধ্যাপক করি গর্ব্ব ধরে।
> বালকেহো ভট্টাচার্য্য সনে কক্ষা করে॥
> নানা দেশ হইতে লোক নবদ্বীপে যায়।
> নবদ্বীপে পড়িলে সে বিদ্যারস পায়॥
> অতএব পড়ুয়ার নাহি সমুচ্চয়।
> লক্ষ কোটি অধ্যাপক নাহিক নির্ণয়॥—চৈঃ ভাঃ।

ইউরোপীয় Renaissanceএ যেমন দেখা যায়, জ্ঞানপিপাসু ছাত্রবৃন্দ অশেষ ক্লেশ সহ্য করিয়া আল্‌প্‌স্ পর্ব্বত পার হইয়া ইতালীতে গমন করিতেন এবং ইতালীতে পাঠ না লইলে তাঁহাদের বিদ্যা

সমাপ্ত হইত না, সেইরূপ আমাদের জাতীয় জীবনের জাগরণের যুগে নবদ্বীপে পাঠ না লইলে কাহারও বিদ্যা সমাপ্ত হইত না। বিদ্যা-গৌরবে মণ্ডিত নবদ্বীপের উল্লিখিত চিত্রখানির পার্শ্বে পেরিক্লীসের যুগের এথেন্সের চিত্রও কি ম্লান বলিয়া বোধ হয় না? কবি কর্ণপূর শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত মহাকাব্যে কিরূপ ব্যক্তিগণ দ্বারা শাস্ত্র আলোচিত হইত, তাহা লিখিয়াছেন,—

বসন্তি যত্র ক্ষিতিদেবসত্তমাঃ
সদা সদাচারপরাঃ পরায়ণাঃ।
নিরন্তরং বেদবিধানকর্ম্মসু
শ্রুতিস্মৃতীনাং বিষয়ঃ শরীরিণঃ॥

ন্যায়শাস্ত্রের আলোচনা যে খুব প্রবলভাবে হইত, তাহা শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকের "বিরাগ" নবদ্বীপ দর্শন করিয়া বর্ণন করিতেছেন,—

অভ্যাসাদ্য উপাধিজাত্যনুমিতিব্যাপ্ত্যাদিশব্দাবলে-
র্জন্মারভ্য সুদূরদূরভগবদ্বার্ত্তাপ্রসঙ্গা অমী।
যে যত্রাধিককল্পনাকুশলিনঃ তে তত্র বিদ্বত্তমাঃ
স্বীয়ং কল্পনমেব শাস্ত্রমিতি যে জানন্ত্যহো তার্কিকাঃ॥

প্রাচীন ভারতে যেমন অশ্বমেধ বা রাজসূয় যজ্ঞ করিবার উপলক্ষ্যে প্রবলপরাক্রান্ত কোন রাজা অপর রাজন্যবর্গকে পরাজিত করিয়া রাজচক্রবর্ত্তী হইতেন বা অধুনা ইউরোপ ও আমেরিকায় মুষ্টিযুদ্ধ প্রভৃতিতে মল্লগণকে হারাইয়া মল্লশ্রেষ্ঠ "জগদ্বিজয়ী" উপাধি ধারণ করেন, সেইরূপ বিদ্যা-লোচনার যুগে প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণ ভারতবর্ষের সমস্ত পণ্ডিতকে পাণ্ডিত্য ও তর্কযুদ্ধে পরাজিত করিয়া দিগ্বিজয়ী উপাধি লাভ করিতেন। (সমসাময়িক ইউরোপীয় Renaissanceএ ও Scholastic Vogents দেখিতে পাওয়া যায়। ষোড়শ শতাব্দীর 'Frier Bacon and Frier Bungay' নামক নাটকে মহাপ্রভুর দিগ্বিজয়ী পরাভবের অনুরূপ একটী চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়। বৈষ্ণব-সাহিত্যে আমরা অনেকগুলি দিগ্বিজয়ীর সাক্ষাৎ লাভ করি। (১) শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে মহাপ্রভু কর্ত্তৃক কেশব কাশ্মীরীর পরাজয়কাহিনী বর্ণিত আছে। (২) ঈশান নাগরের অদ্বৈতপ্রকাশে শ্যামদাস নামে এক দিগ্বিজয়ীর সাক্ষাৎ পাই।

এক দ্বিজ দিগ্বিজয়ী বহু দেশ জিনি।
শান্তিপুরে উপনীত হইলা আপনি॥
বেদপঞ্চানন আখ্যা প্রভুর শুনিঞা।
তাঁহার নিকটে গেলা অতি হর্ষ হৈয়া॥

(৩) প্রেমবিলাসে শ্রীজীব গোস্বামীর নিকট রূপচন্দ্র দিগ্বিজয়ীর পরাভবের কথা আছে,—

দিগ্বিজয় করি তেঁহো নানা স্থানে যায়।
যেখানে পণ্ডিত দেখে বিচার করয়॥

(৪) নরোত্তমবিলাসে দিগ্বিজয়ী মুরারির সহিত ঠাকুর মহাশয়ের, ব্রাহ্মণ বড়, কি বৈষ্ণব বড়, এই সকল লইয়া তর্কের কথা বর্ণিত আছে।

পরাভব হইয়া দিগ্বিজয়ী সবে কয়।
বৈষ্ণবমহিমা কহি মোর সাধ্য নয়॥

(৫) ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেনের সংগৃহীত বঙ্গসাহিত্য-পরিচয় গ্রন্থে প্রকাশিত একখানি প্রাচীন দলিল হইতে জানা যায় যে, ১৭১৭ খৃঃ অঃ রাধামোহন ঠাকুর জয়পুরের রাজার প্রেরিত দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতকে পরাস্ত করিয়া ব্রজলীলার পরকীয়াবাদ স্থাপন করেন। দেশের ধনিগণও বিদ্যারসে মাতোয়ারা ছিলেন। তাই এই সমস্ত দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত যশোবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ঐশ্বর্য্যও লাভ করিতেন।

পরমসমৃদ্ধ অশ্ব গজযুক্ত হই।
সভা জিনি নবদ্বীপে গেলা দিগ্বিজয়ী॥—চৈঃ ভাঃ।

ধর্ম্মসংস্কার

(শুধু বিদ্যার আলোচনাদ্বারা সম্যক্‌ভাবে জাতীয় উন্নতি সংসাধিত হইতে পারে না। বিদ্যা আলোচনার ফলে বুদ্ধি সুতীক্ষ্ণ হয়, স্বাধীন চিন্তা বিকাশ লাভ করে। কিন্তু এই স্বাধীন চিন্তা বিকাশের সঙ্গে হৃদয়ের যোগ না থাকিলে সাধারণ সামাজিক আচার ব্যবহারের প্রতি অবহেলা-বশতঃ সমাজে দুর্নীতিই প্রকাশ পায়। ইতালীর Renaissanceএ তাহাই হইয়াছিল, Boccacioর Decameron তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। আমাদের দেশের অন্তরাত্মাও শুধু বিদ্যার আলোচনায় তৃপ্ত হইতে পারে নাই।

রমাদৃষ্টিপাতে সর্ব্বলোক সুখে বসে।
ব্যর্থ কাল যায় মাত্র ব্যবহাররসে॥
কৃষ্ণনাম ভক্তিশূন্য সকল সংসার।
প্রথম কলিতে হৈল ভবিষ্য আচার॥—চৈঃ ভাঃ।

(অদ্বৈত, শ্রীবাস প্রভৃতি অনুভবী ভক্তগণ যথার্থই উক্ত প্রকার দুঃখ বোধ করিয়াছিলেন। Martin Luther যেমন ইউরোপীয় Renaissanceএর পরিণত ফল, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুও তেমনি জাতীয় নবজাগরণপ্রসূত স্বাধীন চিন্তার চরম বিকাশ। এক দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে শ্রীচৈতন্য-প্রচারিত বৈষ্ণব ধর্ম্মও ব্রাহ্মণ-ধর্ম্মের বিরুদ্ধে একটী protest। মানবজন্ম কোন পূর্ব্বকৃত দুষ্কৃতির ফলস্বরূপ বলিয়া সাধারণতঃ এতকাল বিবেচিত হইত। হিন্দুগণ ক্রিয়াকর্ম্ম বা জ্ঞানসাধনা করিয়া হয় স্বর্গলাভ, না হয় মোক্ষলাভ করিয়া মানবজন্ম পরিহার করিতে চেষ্টাপরায়ণ ছিলেন। কেবলমাত্র ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম জগতের অবিসম্বাদিত মধ্যস্থ (Medium between God and man) ছিল। মহাপ্রভু প্রথমতঃ ধর্ম্মরাজ্যে জাতি অপেক্ষা গুণের অধিকার স্থাপন করিলেন। মানবিকতার মহিমা ঘোষণা করাই বৈষ্ণব ধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য। চণ্ডীদাস গাহিয়াছিলেন,—

শুন হে মানুষ ভাই।
সবার উপরে মানুষ বড়
তাহার উপরে নাই॥

শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলাবাদের প্রথম কথাই হইতেছে,—

কৃষ্ণের যতেক লীলা সর্ব্বোত্তম নরলীলা
নরবপু তাহার স্বরূপ।
গোপ-বেশ বেণুকর নবকিশোর নটবর
নরলীলার হয় অনুরূপ॥—চৈঃ চঃ।

প্রেমের রাজ্যে মানব ও ভগবান্ সমভূমিতে দণ্ডায়মান। ভগবান্ মানবের প্রেমলাভের জন্য ব্যাকুল—এমন কি, তিনি মানবের দ্বারে প্রেমের ভিখারী।

(মোর পুত্র মোর সখা মোর প্রাণপতি।
এই ভাবে করে যেই মোরে শুদ্ধভক্তি॥
আপনাকে বড় মানে আমাকে সম হীন।
সেই ভাবে আমি হই তাহার অধীন॥
মাতা মোরে পুত্রভাবে করয়ে বন্ধন।
অতি হীন জ্ঞানে করে লালন পালন॥
সখা শুদ্ধ সখ্যে করে স্কন্ধে আরোহণ।
"তুমি কোন বড় লোক, তুমি আমি সম"॥—চৈঃ চঃ।

(বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাস বুঝার পক্ষে মহাপ্রভু মানবকে কি গৌরবময় স্থান দান করিয়া মানবের মনকে উন্নত করিয়া তুলিয়াছিলেন, তাহা বুঝা বিশেষ প্রয়োজন। লীলাবাদেই বঙ্গদেশের জাতীয় নবজাগরণের ইতিহাস পূর্ণতা লাভ করিল। এক্ষণে বৈষ্ণব-সাহিত্যে এই নবভাবে অনুপ্রাণিত জাতির সামাজিক ইতিহাস কি ভাবে লিখিত হইয়াছে, দেখা যাউক।

কোন দেশেই দুই এক শতাব্দীর মধ্যে সামাজিক আচার ব্যবহারের পরিবর্ত্তন হয় না; ভারতবর্ষের ন্যায় সংরক্ষণশীল দেশের পক্ষে এ কথা বিশেষভাবে সত্য। বাঙ্গালাদেশে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত যে বৈষ্ণব-সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা মুসলমানগণের শাসনের সময়। সুতরাং কালানুসারে (chronologically) (১২০০—১৮০০) এই সময়ে সামাজিক ইতিহাস রচনা করার বিশেষ প্রয়োজনও নাই, আর আয়াসসাধ্যও বটে। প্রাক্‌চৈতন্য, চৈতন্য ও চৈতন্যের পরবর্ত্তী যুগের মধ্যে ধর্ম্ম ও সমাজের যে পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছিল, তাহা যথাস্থানে নির্দ্দেশ করিয়া যাইব।

বাঙ্গালার ধর্ম্ম

বৌদ্ধকেই মধ্যমণির ন্যায় স্থাপন করিয়া ভারতবর্ষের সমগ্র জীবন বিকাশ লাভ করিয়াছিল।

ধর্ম্ম আন্দোলন হইতেই বাঙ্গালাদেশে সাহিত্যের উৎপত্তি। অতএব সর্ব্বপ্রথমে বৈষ্ণবসাহিত্যে বঙ্গদেশের ধর্ম্ম ইতিহাসের কি উপকরণ পাওয়া যাইতে পারে, তাহাই দেখা যাউক।

বৌদ্ধধর্ম্ম

মহাপ্রভুর সময়ে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব যে ভারতবর্ষ হইতে বিলুপ্ত হয় নাই, তাহা পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যভাগবতে নিত্যানন্দ প্রভুর তীর্থপর্য্যটনের মধ্যে বৌদ্ধগণের সহিত তাঁহার সাক্ষাতের কথা লিখিত আছে।

তবে নিত্যানন্দ গেলা বৌদ্ধের ভবন।
দেখিলেন প্রভু বসি আছে বৌদ্ধগণ॥
জিজ্ঞাসেন প্রভু কেহো উত্তর না করে।
ক্রুদ্ধ হই প্রভু লাথি মারিলেন শিরে॥—চৈঃ ভাঃ।

শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভ্রমণকালে বৌদ্ধ পণ্ডিতের সহিত বিচার বর্ণিত হইয়াছে। বৌদ্ধগণকে হিন্দুগণ এ সময়ে "পাষণ্ডী" নামে অভিহিত করিতেন।

পাষণ্ডীর গণ আইল পাণ্ডিত্য শুনিঞা॥
গর্ব্ব করি আইল সঙ্গে শিষ্যগণ লঞা॥
বৌদ্ধাচার্য্য মহাপণ্ডিত নিজ মতে।
প্রভু আগে উদ্গ্রাহ করি লাগিল কহিতে॥—চৈঃ চঃ।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহোদয় "বেণের মেয়ে" নামক উপন্যাসে বৈশ্যগণের মধ্যেই বৌদ্ধধর্ম্মের অধিক প্রচার ছিল লিখিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকেও সেই কথা পাওয়া যায়।

সংজ্ঞামাত্রবিশেষতো ভুজভুবো বৈশ্যাস্তু বৌদ্ধা ইব।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, বৌদ্ধগণ এ সময়ে সমাজে অত্যন্ত হেয় হইয়াছিলেন। মহাপ্রভু স্বয়ং বৌদ্ধগণকে উদ্ধার করিয়াছিলেন। তর্কে পরাজিত হইয়া বৌদ্ধগণ মহাপ্রভুর বিরুদ্ধে ষড়্‌যন্ত্র করিতে যাইয়া নিজেদের আচার্য্যকেই বিপদাপন্ন করিয়াছিলেন। তখন,—

হাহাকার করি কান্দে সব শিষ্যগণ।
সবে আসি প্রভুপদে লইল শরণ॥
তুমিহ ঈশ্বর সাক্ষাৎ ক্ষম অপরাধ।
জীয়াহ আমার গুরু করহ প্রসাদ॥
প্রভু কহে সবে কহ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরি।
গুরুকর্ণে কহ কৃষ্ণনাম উচ্চ করি॥
তোমা সবার গুরু তবে পাইবে চেতন।
সর্ব্ব বৌদ্ধ মিলি করে কৃষ্ণ সঙ্কীর্ত্তন॥

গুরুকর্ণে কহে কহ কৃষ্ণ রাম হরি।
চেতন পাইল আচার্য্য উঠে হরি বলি ॥
কৃষ্ণ কহি আচার্য্য প্রভুকে করয়ে বিনয়।
দেখিয়া সকল লোক পাইল বিস্ময় ॥—চৈঃ ভাঃ।

শ্রীচৈতন্ত তর্কদ্বারা বৌদ্ধমত খণ্ডন করিয়া ও কৃপাদ্বারা বৌদ্ধগণকে বৈষ্ণব করিয়া ভারতবর্ষে বৌদ্ধপ্রভাব বহুল পরিমাণে খর্ব্ব করিয়াছিলেন। বৈষ্ণব ধর্ম্মশাস্ত্রে কিন্তু বৌদ্ধগণকে বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষার অযোগ্য বলিয়া উল্লেখ আছে।

"জৈমিনিঃ সুগতশ্চৈব নাস্তিকো নগ্ন এব চ।
কপিলশ্চাক্ষপাদশ্চ ষড়েতে হেতুবাদিনঃ ॥
এতন্মতানুসারেণ বর্ত্তন্তে যে নরাধমাঃ।
তে হেতুবাদিনঃ প্রোক্তাস্তেভ্যস্তন্ত্রং ন জাপয়েৎ ॥"—শ্রীহরিভক্তিবিলাস।

নিত্যানন্দবংশবিস্তার নামক নাতিপ্রামাণিক গ্রন্থে লিখিত আছে যে, বীরভদ্র গোস্বামী নাড়ানাড়ী নামধারী বৌদ্ধধর্ম্মাশ্রিত বহুসংখ্যক নরনারীকে খড়দহে বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত করেন।

তান্ত্রিক বামাচার

বৈষ্ণব-সাহিত্যে বামাচারের প্রাবল্যের নিদর্শন যথেষ্ট পাওয়া যায়। শান্তিপুর গমনকালে শ্রীচৈতন্ত ও নিত্যানন্দ এক বামাপন্থী সন্ন্যাসীর আশ্রমে উঠিয়াছিলেন।

বামাপন্থী সন্ন্যাসী মদিরা পান করে।
নিত্যানন্দ প্রতি তাহা কহে ঠারে ঠোরে ॥
শুনহ শ্রীপাদ কিছু "আনন্দ" আনিব।
তোমা হেন অতিথি বা কোথায় পাইব ॥
নগনী হইয়া মদ্য পিয়ে স্ত্রীসঙ্গ আচরে।
তথাপি ঠাকুর গেল তাহার মন্দিরে ॥—চৈঃ ভাঃ।

কৃষ্ণদাস কর্ত্তৃক অনূদিত ভক্তমাল গ্রন্থে দেখা যায়,—

কাটোয়ার ফৌজদার নবাব সরকারে।
শক্তি উপাসক হয় ভজে বামাচারে ॥
কাঁটাছেড়া মদ্যমাংস সদা ব্যবহার।
যোগিনীচক্রেতে বসি করয়ে আহার ॥

দেশে দুর্নীতির প্রাদুর্ভাব

বামাচার-ধর্ম্মের স্রোত দেশের মধ্যে প্রবল ভাবে বহিতে থাকায় দেশের জনসাধারণের মধ্যে অতিশয় দুর্নীতি প্রকাশ পাইয়াছিল। পানদোষ সমাজে অত্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল।

(হরি বলি হাতে তালি দিয়া কেহো নাচে।
উল্লাসে মদ্যপগণ যায় তা ন পিছে ॥—চৈঃ ভাঃ।

মদ্যপগণের বর্ণনা বৈষ্ণব-সাহিত্যে বহু স্থানে দেখা যায়। দুর্নীতির প্রাবল্যের উদাহরণস্বরূপ গোবিন্দ দাসের কড়চার একটী বর্ণনা উদ্ধৃত করা যাইতে পারে।

স্বার্থপর দুরাচার মদ্য মাংস খায়।
কলির জীবের বল কি হবে উপায় ॥
শিশ্নোদরপরায়ণ নিষ্ঠা-বিবর্জ্জিত।
অর্থের লাগিয়া মিথ্যা কহে অবিরত ॥
যোনিকীট রমণীর মুখ লালা খায়।
ভক্তি অমৃতের ধারা নিছিয়া ফেলায় ॥
বেশ্যার অন্নেতে রুচি বেশ্যা অনুগত।
কনক কামিনী বালা কামকেলিরত ॥
এ কারণ মুহি শিখা সূত্র তেয়াগিয়া।
বেড়াইব দ্বারে দ্বারে হরিনাম দিয়া ॥)

নরোত্তম-বিলাসে প্রাপ্ত খেতুরীর মহোৎসবের পূর্ব্বে তদ্দেশবাসিগণের ব্যবহারও গোবিন্দদাসের প্রদত্ত চিত্রের অনুরূপ,—

এ দেশের লোক দস্যুকর্ম্মে বিচক্ষণ।
না জানয়ে ধর্ম্ম কিম্বা কর্ম্ম বা কেমন ॥
করয়ে কুক্রিয়া যত কে কহিতে পারে।
ছাগ মেষ মহিষ শোণিত ঘর দ্বারে ॥
কেহ রহে মনুষ্যের কাটা মুণ্ড লৈয়া।
খড়্গ করে করয়ে নর্ত্তন মত্ত হৈয়া ॥
সে সময়ে যদি কেহ সেই পথে যায়।
হইলেও বিপ্র তার হাত না এড়ায় ॥
(সবে স্ত্রী-লম্পট জাতি বিচার রহিত।
মদ্য মাংস বিনা না ভুঞ্জয়ে কদাচিত ॥

সাধারণের দুর্নীতির এই চিত্রের ঐতিহাসিকতার বিরুদ্ধে এই বলা যাইতে পারে যে, নিজ ধর্ম্মের মহিমা ও প্রাধান্য স্থাপনের জন্য চিরকালই ধর্ম্মসম্প্রদায় তাঁহাদের পূর্ব্বতন অবস্থাকে মসিলিপ্ত করিয়া অঙ্কন করিয়া থাকেন। তবে বহু গ্রন্থে একই অবস্থার বর্ণনা দেখিয়া মনে হয় যে, এ বর্ণনার মধ্যে নিশ্চয়ই কিছু সত্যাভাস আছে।

শাক্তধর্ম্ম

মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব্বে শাক্ত ধর্ম্মই জনসাধারণের ধর্ম্ম ছিল বলিয়া বোধ হয়। জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে লিখিত আছে যে, যবন রাজা কালীর স্বপ্নাদেশে নবদ্বীপে অত্যাচার করিতে নিবৃত্ত হইলেন। ইহা হইতে তৎকালীন শাক্তধর্ম্মের প্রভাব প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় অনুমান করিয়াছেন। দুর্গোৎসবে খুব আনন্দ হইত বলিয়া নবদ্বীপে ভক্তগণ যখন কীর্ত্তনানন্দে বিভোর হইতেন, তখন—

নাগরিয়াগুলা বোলে মাগি খাই মরে।
অকালেই দুর্গোৎসব আনিলেক ঘরে॥—চৈঃ ভাঃ।

মঙ্গলচণ্ডী, বিষহরি প্রভৃতি শক্তির লৌকিক প্রকাশগুলিও যথোপচারে পূজিত হইতেন।

মঙ্গলচণ্ডীর গীতে করে জাগরণে।
দম্ভ করি বিষহরি পূজে কোন জনে॥
বাসুলী পূজয়ে কেহো নানা উপহারে।
মদ্য মাংস দিয়া কেহো যক্ষ পূজা করে॥—চৈঃ ভাঃ।

বাসুলী দেবীকে বৌদ্ধধর্ম্মের বজ্রযানের বজ্রধাত্বীশ্বরী বলিয়া প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব অনুমান করেন।

শৈবধর্ম্ম

তৎকালে শৈবধর্ম্মের প্রভাবও নিতান্ত কম ছিল না।

একদিন আসি এক শিবের গায়ন।
ডমরু বাজায় গায় শিবের কথন॥
আইল করিতে ভিক্ষা প্রভুর মন্দিরে।
গাইয়া শিবের গীত বেড়ি নৃত্য করে॥—চৈঃ ভাঃ।

ধর্ম্মে প্রাণহীনতা ও বৈষ্ণবতার অভাব

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষপাদে বঙ্গে যে ধর্ম্মই প্রচলিত থাকুক না কেন, তাহা কেবল বাহ্য আচারেই পর্য্যবসিত হইয়াছিল। ধর্ম্মের সহিত জাতীয় জীবনের যোগসূত্র ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল।

যেবা ভট্টাচার্য্য চক্রবর্ত্তী মিশ্র সব।
তাহারা কেহ না জানয় গ্রন্থ অনুভব॥
শাস্ত্র পড়াইয়া সভে এই কর্ম্ম করে।
শ্রোতার সহিতে যমপাশে বান্ধি মরে॥
না বাখানে যুগধর্ম্ম কৃষ্ণের কীর্ত্তন।
দোষ বহি গুণ কারো না করে কথন॥

যেবা সব বিরক্ত তপস্বী অভিমানী।
তা সভার মুখেহ নাহিক হরিধ্বনি॥
অতি বড় সুকৃতি সে স্নানের সময়।
গোবিন্দ পুণ্ডরীকাক্ষ নাম উচ্চারয়॥
গীতা ভাগবত যে যে জনে বা পড়ায়।
ভক্তির ব্যাখ্যান নাহি তাহার জিহ্বায়॥
এই মত বিষ্ণুমায়া-মোহিত সংসার।
দেখি ভক্ত সব দুঃখ ভাবেন অপার॥

দেশের চিন্তাশীল ভাবুকসম্প্রদায় এইরূপ ধর্ম্মের জন্য আকুতি প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়াই বৈষ্ণবধর্ম্ম দেশে এতটা প্রভাব বিস্তার করিতে পারিয়াছিল।

মহাপ্রভুর ধর্ম্ম প্রচার

দেশের লোক প্রথমে বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারে যথেষ্ট বাধা প্রদান করিয়াছিল। নবদ্বীপের পণ্ডিত-সমাজ জ্ঞানমার্গের কথা বুঝিতেন—বৈষ্ণবধর্ম্মের অপূর্ব্ব ভাব উন্মাদনা তাঁহাদের নিকট অদ্ভুত ও অভিনব বলিয়া প্রতীত হইয়াছিল। সেই জন্যই মহাপ্রভু যখন ভক্তগণকে লইয়া প্রথমে কীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করেন, তখন তাঁহারা—

শুনিলেই কীর্ত্তন করয়ে পরিহাস।
কেহো বলে সব পেট পুষিবার আশ॥
কেহো বলে জ্ঞানযোগ এড়িয়া বিচার।
উন্মত্তের প্রায় নৃত্য এ কোন ব্যাভার॥—চৈঃ ভাঃ।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণের পর বঙ্গ, উড়িষ্যা, দাক্ষিণাত্য ও পশ্চিম প্রদেশের কিয়দংশে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্ম অতি অল্পকালমধ্যে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। এক মহাভাবের প্রবল বন্যায় বঙ্গ ও উড়িষ্যা ডুবিয়া গিয়াছিল। এই ধর্ম্ম প্রচারের জন্য সভা করিয়া বক্তৃতা দিতে হয় নাই, মঠ বা বিহার স্থাপন করিয়া জনসাধারণকে উপদেশ দিতে হয় নাই—তরবারি ত ধরিতে হয়ই নাই। ভাব যেন সংক্রামক হইয়া দেশের মধ্যে প্রচারিত হইয়া গিয়াছিল। শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভ্রমণ-কাহিনী হইতে গৌড়ীয় ধর্ম্মের প্রচার-পদ্ধতি বুঝা যাইবে।

এই শ্লোক পড়ি পথে চলে গৌরহরি।
লোক দেখি পথে কহে বোল হরি হরি॥
সেই লোক প্রেমে মত্ত বলে হরিকৃষ্ণ।
প্রভুর পাছে সঙ্গে যায় দর্শনে সতৃষ্ণ॥
কথো দূরে রহি প্রভু তারে আলিঙ্গিয়া।
বিদায় করেন তারে শক্তি সঞ্চারিয়া॥

সেই জন নিজগ্রামে করিলা গমন।
কৃষ্ণ বলি হাসে কান্দে নাচে অনুক্ষণ॥
যারে দেখে তারে কহে কহ কৃষ্ণনাম।
এই মত বৈষ্ণব কৈল সব নিজ গ্রাম॥
গ্রামান্তর হৈতে আইসে দেখে যত জন।
তাহার দর্শন-কৃপায় হয় তার সম॥
সেই যাই নিজগ্রাম বৈষ্ণব করয়।
অন্যগ্রামী আসি তারে দেখি বৈষ্ণব হয়॥
সেই যাই আর গ্রাম করে উপদেশ।
এই মত বৈষ্ণব হইল সব দক্ষিণ দেশ॥—চৈঃ চঃ।

নিত্যানন্দ, রূপ, সনাতন প্রভৃতি পদ্ধতি অনুসারে অন্যান্য দেশে প্রেমধর্ম্ম যাজন করিলেন,—

মথুরাতে পাঠাইল রূপ সনাতন।
দুই গোসাঞি কৈল ভক্তি প্রচারণ।
নিত্যানন্দ গোসাঞি পাঠাইলা গৌড়দেশ।
তিঁহো ভক্তি প্রচারিল অশেষ বিশেষ॥—চৈঃ চঃ।

পরবর্ত্তী আচার্য্য নরত্তোম ঠাকুর মহাশয়, শ্রীনিবাস আচার্য্য, শ্যামানন্দ, বীরভদ্র গোস্বামীও বঙ্গ উড়িষ্যায় প্রেমধর্ম্ম প্রচার করেন। নিত্যানন্দপত্নী শ্রীজাহ্নবাদেবী ও শ্রীনিবাস আচার্য্যের কন্যা হেমলতা ঠাকুরাণীও বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রচার করিয়াছিলেন বলিয়া বৈষ্ণবজগতের পূজা পাইয়া থাকেন। মহাপ্রভু সাধারণকে সন্ন্যাস উপদেশ না দিয়া গার্হস্থ্যাশ্রমেই থাকিতে বলিয়াছেন; এইরূপে সমাজসংস্কার হইয়াছিল। মহাপ্রভু স্বয়ং, ছয় গোস্বামী ও কতিপয় প্রচণ্ড বৈরাগ্যশালী মহাজন সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করিলেও মহাপ্রভু তাঁহার ধর্ম্মপ্রচারকালে জনসাধারণের প্রতি সন্ন্যাস উপদেশ করেন নাই; গৃহে থাকিয়া শ্রীকৃষ্ণ ভজন করিতেই উপদেশ দিয়াছিলেন। কূর্ম্ম নামে এক বৈদিক ব্রাহ্মণ তাঁহার সঙ্গে যাইতে চাহিলে,—

প্রভু কহে ঐছে বাত কভু না কহিবা।
গৃহে রহি কৃষ্ণনাম নিরন্তর লৈবা॥—চৈঃ চঃ।

সৌভাগ্য-বিদ্যায় ভারতবাসী চিরদিনই বিশ্বাসবান্। তাই জাতীয় উন্নতির জন্য গুণকর্ম্ম-বিভাগযুক্ত বর্ণাশ্রমধর্ম্ম এ দেশে প্রচলিত হইয়াছিল। বৈষ্ণবের সন্তান বৈষ্ণব হইবারই সম্ভাবনা অধিক। মহাপ্রভু ও তাঁহার পরিকরগণের তিরোভাবের সঙ্গে সঙ্গেই যাহাতে বৈষ্ণবধর্ম্ম বিলোপ না পায়, তজ্জন্য সাধনপথে অগ্রসর ভক্ত মহাপুরুষগণকে মহাপ্রভু বিবাহ করিতে আদেশ দিয়াছিলেন। এই জন্যই শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু, শ্রীনিবাস আচার্য্য, গৌরীদাস পণ্ডিত ও শ্রীমুকুন্দ শেষ বয়সে বিবাহ করিয়াছিলেন। ঈশাননাগরকৃত অদ্বৈতপ্রকাশে লিখিত আছে,—

একদিন শ্রীঅদ্বৈত ডাকি পুত্রগণে।
নির্জ্জনে কহয়ে অতি মধুর বচনে॥
অহে বৎসগণ সভে স্থির কর মন।
গার্হস্থ্য ধর্ম্মের সার করহ শ্রবণ॥
সন্ধ্যাবন্দনাদি আর মধ্য মহাযজ্ঞ।
যেই জন করে নিত্য সেই মহাবিজ্ঞ॥

অদ্বৈত প্রভুর পুত্র অচ্যুত বাল্যকাল হইতেই পরম বৈষ্ণব। তিনি বিবাহ করেন নাই বলিয়া অদ্বৈতপ্রভু তাঁহাকে বিগ্রহসেবায় পর্য্যন্ত ভার দিলেন না।

অতএব শ্রীবিগ্রহের সেবাদিক ক্রিয়া।
তোমা হৈতে না চলিবে দেখিনু বুঝিয়া॥—অঃ প্রঃ।

(সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে, মহাপ্রভু বাঙ্গালার সামাজিক জীবনকে ভাঙ্গিয়া সব সন্ন্যাসী করিয়া দিতে চাহেন নাই। বরং তিনি সেই সামাজিক জীবনে প্রেমভক্তির ভাব প্রবেশ করাইয়া সমাজকে সুসংস্কৃত করিতে চাহিয়াছিলেন।)

প্রেমধর্ম্ম প্রচারের পর বঙ্গদেশের নৈতিক অবস্থার যে যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। যে ধর্ম্মের মূলমন্ত্র "জীবে দয়া নামে রুচি বৈষ্ণবসেবন," যে ধর্ম্মে সাধন করিবার প্রণালী হইতেছে,—

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ।

সে ধর্ম্মের বহুল প্রচারের সঙ্গে যে দেশের নৈতিক চরিত্রের উন্নতি হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? জগাই মাধাইয়ের ন্যায় মদ্যপ, চান্দরায় ও তাহার অনুচরগণের ন্যায় দস্যুগণকে যে ধর্ম্ম পরম বৈষ্ণব করিতে পারিয়াছে, সে ধর্ম্ম নিশ্চয়ই অন্ততঃ কিছুকালের জন্যও জনসাধারণের চরিত্রকে মহৎ করিয়া তুলিয়াছিল।) বৈষ্ণব কবি ও গ্রন্থকারগণ যেন দৈন্য ও বিনয়ের এক একজন অবতার। বৃদ্ধ জরাতুর শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ "ছোট বড় ভক্তগণ, বন্দো সভার শ্রীচরণ, সভে মোরে করহ সন্তোষ।" বলিয়া সমস্ত পাঠকবৃন্দের কৃপাভিক্ষা করিয়াছেন। জগতের ইতিহাসে পাঠকের নিকট গ্রন্থকারের ঈদৃশ বিনয় প্রকাশ নিতান্তই দুর্লভ। (তন্ত্রাচার প্রচারের ফলে সমাজে ব্যভিচার দেখা দিয়াছিল। মহাপ্রভু বৈষ্ণব সাধকের পক্ষে স্ত্রীমুখ দর্শন পর্য্যন্ত নিষেধ করিয়া দিলেন।

প্রভু কহে বৈরাগী করে প্রকৃতি সম্ভাষণ।
দেখিতে না পারি আমি তাহার বদন॥—চৈঃ চঃ।

ছোট হরিদাসকে দণ্ডপ্রদান করিয়া বৈষ্ণবসমাজে মহাপ্রভু এক উচ্চ আদর্শ স্থাপন করিলেন। এই মহান্ আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া দেশবাসিগণ কিছুকালের জন্য ব্যভিচারাদি দোষ ত্যাগ করিয়াছিল বলিয়া বোধ হয়।)

ধর্ম্মসংঘর্ষে শোণিতপাত ভারতের ইতিহাসে বিরল। তবে মানবপ্রকৃতি সর্ব্বত্রই সমান—তাই বিভিন্ন দেবতার উপাসকগণের মধ্যে প্রায়ই কলহ উপস্থিত হইত, যদিও সে কলহ বাক্যেই পর্য্যবসিত হইত। বৈষ্ণবশাস্ত্রকারগণ উচ্চ নৈতিক আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া অন্য দেবদেবীর নিন্দা বা অবজ্ঞা করা নিষেধ করিয়া দিলেন।

হরিরেব সদারাধ্যঃ সর্ব্বদেবেশ্বরেশ্বরঃ।
ইতরে ব্রহ্মরুদ্রাদ্যা নাবজ্ঞেয়াঃ কদাচন॥

(ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে উদ্ধৃত পদ্মপুরাণের শ্লোক।)

শ্রীচৈতন্যমঙ্গলের মঙ্গলাচরণে শ্রীচৈতন্যের সহিত গণপতি, হরগৌরী, সরস্বতী ও দেবগণের বন্দনা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয় যে, বৈষ্ণবগণ ধর্ম্মবিরোধে বা ধর্ম্মকলহে যোগদান করিতেন না। শাক্ত ও বৈষ্ণবের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা বৈষ্ণবধর্ম্মের উন্নতির যুগ গত হইবার পর। পরবর্ত্তী কালে রচিত ভক্তমাল গ্রন্থে শাক্তবৈষ্ণবের দ্বন্দ্বের বিস্তর আভাস "গোবিন্দ কবিরাজ", "রবীন্দ্রনারায়ণ রায়" প্রভৃতির চরিত্রে পাওয়া যায়।

বৈষ্ণবধর্ম্ম বঙ্গদেশে বিস্তৃতি লাভ করিলেও শাক্তধর্ম্মকে দেশ হইতে বিদূরিত করিতে পারে নাই। তবে, পরবর্ত্তী চণ্ডী বা অপর কোন লৌকিক দেবতার মঙ্গলসাহিত্যে শ্রীচৈতন্য ও নিত্যানন্দকে বন্দনা করা হইয়াছে। ঐ সমস্ত মঙ্গলকাব্য জনসমাজে গীত হইত; সুতরাং গ্রন্থের মঙ্গলাচরণে মহাপ্রভুর বন্দনা থাকায় দেশের উপর বৈষ্ণবপ্রভাব উপলব্ধি করা যায়। মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তীর "চণ্ডী"তে, ভবানীপ্রসাদ রায়ের "দুর্গামঙ্গলে", রামেশ্বর ভট্টাচার্য্যের "শিবায়নে" ও ঘনরামের "ধর্ম্মমঙ্গলে" অন্যান্য পৌরাণিক দেবদেবীর সহিত একসঙ্গে মহাপ্রভুর বন্দনা আছে। মহাপ্রভুর জীবনকালেই তাঁহার অবতারত্ব ঘোষিত হইয়াছিল। উক্ত মঙ্গলাচরণ পাঠে জানা যায় যে, সাধারণ হিন্দুসমাজ এ মত মানিয়া লইয়াছিল। বৈষ্ণব-সমাজে ত শ্রীচৈতন্য ও নিত্যানন্দের মূর্ত্তি-উপাসনাই আরম্ভ হইয়াছিল।

প্রভুর মন্দিরে শীঘ্র লইয়া চলিলা।
নিত্যানন্দ চৈতন্য দর্শন করাইলা॥

শাক্ত সাহিত্যে মহাপ্রভু শুধু পূজিত হয়েন নাই—শাক্ত ধর্ম্মের উপর তাঁহার ধর্ম্মের প্রভাবও বিস্তৃত হইয়াছিল। শাক্ত সাহিত্যের "আগমনী গীতির" বাৎসল্যরস বৈষ্ণবপদাবলীর নিকট ঋণী। বৈষ্ণবধর্ম্ম বাঙ্গালার শাক্ত ধর্ম্মের সাধ্য বস্তু পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তন করিয়া দিয়াছিল।

সালোক্য-সার্ষ্টি-সামীপ্য-সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥

রামপ্রসাদ সেন এই ভাবের বশবর্ত্তী হইয়া গাহিয়াছেন,—

নির্ব্বাণে কি আছে ফল, জলেতে মিশায় জল,
ওরে চিনি হওয়া ভাল নয় মন, চিনি খেতে ভালবাসি॥

বৈষ্ণবধর্ম্মের অবনতি

বৈষ্ণবধর্ম্ম রস সাধনার ধর্ম্ম। অতি উচ্চাঙ্গের সাধক না হইলে এই ধর্ম্ম সাধন করিতে যাইয়া রসের বিকারদ্বারা অভিভূত হইবার আশঙ্কা আছে। তাই মহাপ্রভু সাধারণকে শুধু নামকীর্ত্তনে অধিকারী বলিয়াছেন। কিন্তু এত করিয়া উপদেশ দিয়াও তিনি রসের বিকার হইতে এক শ্রেণীর লোককে বাঁচাইতে পারেন নাই। ইহারা সহজিয়া বা বাউল নামে এ দেশে পরিচিত। সহজধর্ম্ম অতি প্রাচীন কাল হইতে এদেশে প্রচলিত ছিল। মধ্যযুগে মন্ত্রযান ও বজ্রযান সম্প্রদায়ের সহিত এই সহজধর্ম্ম মিশ্রিত হইয়া কলুষিত আকার ধারণ করে। পরকীয়া স্ত্রী এই ধর্ম্মের সাধনের অঙ্গ বলিয়া বিবেচিত হয়। চণ্ডীদাস একজন, কি বহু, সে তর্কের মধ্যে প্রবেশ না করিয়াও আমরা বলিতে পারি যে, খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে বঙ্গদেশে সহজধর্ম্ম প্রচলিত ছিল।

> সহজ সহজ সবাই কহয়ে
> সহজ জানিবে কে।
> তিমির অন্ধকার যে হয়েছে পার
> সহজ জেনেছে সে॥
> পরকীয়া ধন সকল প্রধান
> যতন করিয়া লই।
> নৈষ্ঠিক হইয়া ভজন করিলে
> পদ্ধতি সাধক হই॥

সহজধর্ম্মের পরকীয়াবাদকে মহাপ্রভু সুসংস্কৃত করিয়া বৈষ্ণবধর্ম্মে গ্রহণ করেন। লীলায় শ্রীরাধাকৃষ্ণের পরকীয়াভাব হইলে রসের পরিপুষ্টি হয়। এই জন্য ভক্তগণ সখী ও মঞ্জরীগণের অনুগত হইয়া শ্রীকৃষ্ণলীলা পরকীয়াভাবে স্মরণ মনন করিবেন। কিন্তু এই সাধনায় কোন নারীর প্রয়োজন নাই, তাহা বারংবার ঘোষণা করা হইল।

> গোপিকাভাবের এই সুদৃঢ় নিশ্চয়।
> ব্রজেন্দ্রনন্দন বিনা অন্যত্র না হয়।—চৈঃ চঃ।
> পরকীয়াভাবে অতি রসের নির্য্যাস।
> ব্রজ বিনা ইহার অন্যত্র নহে বাস।—কর্ণানন্দ।

সুতরাং রক্ত মাংসের দৈহিক ব্যাপারকে বৈষ্ণবশাস্ত্রকারগণ আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা প্রদান করিয়া উচ্চাঙ্গের ভজনপ্রণালী স্থাপন করিলেন। এই আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার ফলে পরকীয়াবাদ ভাবরাজ্যের কি এক অপূর্ব্ব সুষমা লাভ করিয়াছে, তাহা উজ্জ্বলনীলমণি নামক বৈষ্ণব রসশাস্ত্র পাঠ করিলে বুঝা যায়। কিন্তু দুই শতাব্দীর মধ্যেই এক শ্রেণীর লোকে এই উচ্চভাবের কথা বিস্মৃত হইয়া গেল। তাহারা মহাপ্রভু ও তদনুগত শ্রীরূপ গোস্বামী, নরোত্তম ঠাকুর প্রভৃতি মহাজনগণের নাম দিয়া এক ধর্ম্ম কল্পনা করিয়া চালাইতে লাগিল। ইহারা কি ভাবে বৈষ্ণবগণের পূর্ব্বীয়

আচার্য্যবৃন্দকে স্বদলে টানিয়াছে, তাহা দেখিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। প্রেমদাস-রচিত "আনন্দ-ভৈরবে" লিখিত আছে,—

> স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্রনন্দন।
> তাহার চরিত্র গোসাঞি করিয়াছে বর্ণন॥
> সেই অনুসারে বিদ্যাপতির করণ।
> চণ্ডীদাস সেই ধর্ম্ম করেছে যাজন॥
> জয়দেব গোসাঞির সেই মত হয়।
> গৌণরূপে ভজন কৈল ছয় মহাশয়॥
> মহাপ্রভুর মনের করণ না যায় বর্ণনে।
> নিত্যানন্দ প্রভুর চরিত্র দেখহ নয়নে॥
> বীরভদ্র গোসাঞির কি কহিব গুণে।
> বৈরাগীকে শিখাইল আপন কারণে॥
> যদি এহেন বাক্যে কেহ প্রতীত না হয় মনে।
> বার শত নাড়াকে তের শত নাড়ী দিবেন কেনে॥
> যে সব বৈরাগী প্রকৃতির মুখ নাহি দেখে।
> এখন প্রকৃতি বিনে তিলার্দ্ধ না থাকে॥

উদ্ধৃত অংশের শেষ দুই পঙ্ক্তির মধ্যে বৈষ্ণবধর্ম্মের পতনের ইতিহাস নিহিত আছে। সহজিয়াগণ প্রচার করিয়াছিল যে,—

> মানুষের দেহ হয় নিত্যবৃন্দাবন।
> পুরুষ প্রকৃতি ইথে জানিহ কারণ॥

—গৌরীদাসের নিগূঢ়ার্থপ্রকাশাবলী।

চিত্তসংযম, ব্রহ্মচর্য্য ও ভগবানে আত্মসমর্পণযুক্ত যে সাধনা বৈষ্ণবধর্ম্মের অঙ্গীভূত, সেই সাধনাকে সহজিয়াগণ বলিল,—

> হাস্যরস কৌতুকে সদা কাল গোঙাইবে।
> ইহা নহিলে ব্রজপ্রাপ্তি করিতে নারিবে॥

সপ্তদশ শতাব্দী হইতে সহজিয়াধর্ম্ম বহুলভাবে প্রচারিত হইতে আরম্ভ করিয়াছিল। এই সম্প্রদায়ের বহু গ্রন্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে। গ্রন্থের সংখ্যা দেখিয়াই বঙ্গদেশে ইহার প্রভাব অনুমান করা যাইতে পারে। সহজিয়া বৈষ্ণবগণ সমাজে অত্যন্ত হেয়। কিন্তু প্রায় দুই শত বৎসর কাল ইহারাই বৈষ্ণব, বৈরাগী আখ্যায় অভিহিত হওয়ায় অধুনা ভজননিষ্ঠ কোন ভক্তকে ভদ্রসমাজে বৈষ্ণব বলিয়া পরিচয় দিতে হইলে আবার বৈষ্ণব শব্দের সদ্ব্যাখ্যা করিয়া দিতে হয়। এস্থলে বলা আবশ্যক যে, এই উপধর্ম্ম মূল বৈষ্ণবধর্ম্মের কণ্ঠ একেবারে রোধ করিতে পারে নাই।

ক্ষীণভাবে চলিলেও বিশুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্ম কোন দিনই বঙ্গদেশে বিলুপ্ত হয় নাই—হইলে আজ আর বৈষ্ণবগ্রন্থরাজি আমাদের নয়নগোচর হইত না।)

বর্ণাশ্রম ও বৈষ্ণবধর্ম্ম

বর্ণাশ্রমধর্ম্মকে ভিত্তি করিয়া ভারতবর্ষের প্রাচীন সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছিল। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রবল প্লাবনের সময় ইহার প্রভাব মন্দীভূত হইলেও একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই। বর্ণাশ্রমধর্ম্মের উপর দিয়া বহু ঝঞ্ঝা বহিয়া গিয়াছে, কিন্তু আজও সে ধর্ম্ম হিন্দুগণের মধ্যে প্রচলিত আছে। ইহা হইতেই বুঝা যাইবে যে, বর্ণাশ্রমধর্ম্মের মূল হিন্দুর জাতীয় জীবনের অন্তস্তলে প্রোথিত।

কিন্তু বর্ণাশ্রমধর্ম্মকে পরমার্থের চরম অবস্থা বা সাধ্য বস্তু বলিয়া ভারতবর্ষ কখনই ঘোষণা করে নাই। মোক্ষ প্রাপ্তির ইচ্ছা আসিলে যতিধর্ম্ম গ্রহণ করিতে হইবে, ইহাই শাস্ত্রের উপদেশ। শ্রীশঙ্করাচার্য্য-প্রবর্ত্তিত দশনামী সন্ন্যাসিসম্প্রদায়, হিন্দুধর্ম্মের মধ্যে থাকিয়াও নিজদিগকে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের উপরিতন অবস্থায় স্থিত কল্পনা করিয়া বর্ণাশ্রমধর্ম্ম পালন করেন না।

শ্রীমন্মহাপ্রভুও ভারতের এই সনাতন পন্থা অবলম্বন করিয়া ঘোষণা করিলেন যে, বর্ণাশ্রমধর্ম্ম সাধারণ গার্হস্থ্য ও সামাজিক জীবনের উপযোগী হইলেও ইহা মানবের উচ্চতর জাগ্রত ক্ষুধাকে পরিতৃপ্ত করিতে সমর্থ নহে। ভাবভক্তির রাজ্যের উচ্চ গ্রামে আসীন ভক্তের পক্ষে বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম পালন করার কোনই প্রয়োজন নাই। বর্ণাশ্রমধর্ম্মের উপরিতন অনেকগুলি সাধনরাজ্যের অবস্থা চরিতামৃতের মধ্যলীলায় রায় রামানন্দ-সংবাদে লিখিত হইয়াছে। তথায় বর্ণাশ্রমধর্ম্মকে মহাপ্রভু বাহ্য ধর্ম্ম বলিয়াই নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

প্রভু কহে পড় শ্লোক সাধ্যের নির্ণয়।
রায় কহে স্বধর্ম্মাচরণে বিষ্ণুভক্তি হয়॥
বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ পরঃ পুমান্।
বিষ্ণুরারাধ্যতে পন্থা নান্যত্তত্তোষকারণম্॥
প্রভু কহে এহো বাহ্য আগে কহ আর।—চৈঃ চঃ।

প্রেমরাজ্যের জাতিভেদ অন্যপ্রকার,—

কিবা বিপ্র কিবা শূদ্র ন্যাসী কেনে নয়।
যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়।—চৈঃ চঃ।
যেই ভজে সেই বড়, অভক্ত হীন ছার।
কৃষ্ণ ভজনে নাহি জাতিকুলাদি বিচার।—চৈঃ চঃ।

শ্রীহরিভক্তিবিলাসও এই কথার প্রতিধ্বনি করিয়া বলিতেছেন,—

মহাকুলপ্রসূতোঽপি সর্ব্বযজ্ঞেষু দীক্ষিতঃ।
সহস্রশাখাধ্যায়ী চ ন গুরুঃ স্যাদবৈষ্ণবঃ।

ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে বর্ণাশ্রমধর্ম্মাচারের সহিত ভক্তিধর্ম্মের সম্বন্ধ সুস্পষ্টভাবে লিখিত হইয়াছে।

সম্মতং ভক্তিবিজ্ঞানাং ভক্ত্যঙ্গত্বং ন কর্ম্মণাং।

অর্থাৎ কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, বর্ণাশ্রমবিহিত কর্ম্মপরম্পরা ভক্তির অঙ্গ, কিন্তু তাহা ভক্তিতত্ত্ববেত্তাদের মত নহে। শ্রীজীব গোস্বামী এই শ্লোকের টীকায় বলিয়াছেন,—

"বর্ণাশ্রমাচারেত্যাদিকং অজাতদৃঢ়শ্রদ্ধং শুদ্ধভক্ত্যনধিকারিনং প্রত্যেবোক্তমিতি ভাবঃ।"

এই নীতি অনুসরণ করিয়া বহু শুদ্ধ ভক্ত শ্রীকৃষ্ণ ভজন সম্বন্ধে জাতিধর্ম্মকে তুচ্ছ করিয়া বৈষ্ণবত্বকেই শ্রেষ্ঠ স্থান দিয়াছেন। গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী, যাঁহার সম্বন্ধে প্রেমবিলাসে লিখিত আছে,—

বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ তিঁহো পণ্ডিত প্রধান।
পাঁচ শত পড়ুয়ায় নিত্য অন্ন কৈল দান॥

রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য, যদুনাথ বিদ্যাভূষণ, কাশীনাথ তর্কভূষণ, হরিদাস শিরোমণি, চন্দ্রকান্ত তর্কপঞ্চানন প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণ কায়স্থকুলোদ্ভব নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীরসিকানন্দ, শূদ্র শ্যামানন্দের নিকট ও কাটোয়ার যদুনন্দন চক্রবর্ত্তী শ্রীগদাধর দাস মহাশয়ের নিকট পাঞ্চরাত্রিক দীক্ষায় দীক্ষিত হইয়াছিলেন। ব্রাহ্মণেতর জাতি ব্রাহ্মণের গুরু হওয়ায় সামাজিক বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল। নরোত্তম-বিলাসে লিখিত আছে,—

নরোত্তম শিষ্য কৈলা অনেক ব্রাহ্মণ।
পাষণ্ডী ব্রাহ্মণ সব হৈল অগ্নি সম॥

রাজা নরসিংহ পণ্ডিত সহ নরোত্তমের সহিত ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব বিচার করিবার জন্য আসিয়াছিলেন। অবশ্য বিচারে দিগ্বিজয়ী মুরারির পরাভব হয়।

পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে যে, ষোড়শ শতাব্দীতে হিন্দুসমাজে সংস্কার আরম্ভ হইয়াছিল। মেলবন্ধন ও নব্যস্মৃতি প্রচার প্রভৃতি দ্বারা হিন্দুসমাজ পূর্ব্ববর্ত্তী বৌদ্ধপ্লাবন ও মুসলমান অত্যাচারজাত ত্রুটিগুলি সংশোধন করিয়া লইতেছিল। শ্রীচৈতন্যভাগবতে বর্ণিত সুবুদ্ধি খাঁর উপাখ্যান হইতে আমরা তদানীন্তন সমাজের উপর বর্ণাশ্রমধর্ম্মের প্রভাব বুঝিতে পারি। সুবুদ্ধি খাঁ হুসেন সাহার প্রভু ছিলেন। হুসেন বাদশা হইয়া স্ত্রীর প্ররোচনায় সুবুদ্ধি খাঁর মুখে জোর করিয়া জল দেন। সুবুদ্ধি খাঁ নিজের দোষ নাই জানিয়াও, জাতিপাত হইয়াছে, এই চিন্তায় আকুল হইয়া উঠিলেন। পণ্ডিতগণ ব্যবস্থা দিলেন যে, এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত তুষানলে প্রাণত্যাগ। ষোড়শ শতাব্দী বর্ণাশ্রমধর্ম্মের পুনরুজ্জীবনের যুগ বলিয়াই মহাপ্রভু-প্রবর্ত্তিত এই আদর্শ হিন্দুসমাজের বুকে এতটা বাজিয়াছিল। জন্মগত অধিকারই যে সময়ে সমস্ত বিষয় নিয়ন্ত্রিত করিতেছিল, সে সময় সাধনরাজ্যেও গুণগত অধিকারকে স্থান দিতে হিন্দুসমাজ পরাঙ্মুখ হইয়াছিল।

লৌকিক ব্যবহারে কিন্তু মহাপ্রভু বর্ণাশ্রমধর্ম্ম অবহেলা করেন নাই। প্রেম সাধনার রাজ্যে জাতিধর্ম্ম উপেক্ষিত হইলেও সাধক ভক্ত লৌকিক চেষ্টা ও ব্যবহারের সময় বর্ণাশ্রমধর্ম্ম মানিয়া চলিবেন, ইহাই বৈষ্ণবশাস্ত্রের উপদেশ। বর্ণাশ্রমধর্ম্মের প্রভাব তখন এতটা প্রবল যে, মহাপ্রভু চেষ্টা করিলেও ইহাকে উঠাইয়া দিতে পারিতেন কি না, সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

মহাপ্রভু স্বয়ং ব্রাহ্মণেতর কোন জাতির বাড়ীতে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছেন, এরূপ কথা কোন লীলাগ্রন্থে লিখিত নাই। বরং "নিমন্ত্রণ লইল জানি বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ" প্রভৃতি কথাই আছে। জগন্নাথক্ষেত্রে কোন কোন সময়ে এক সঙ্গে বসিয়া সকল জাতীয় ভক্তই আহার করিয়াছেন—কিন্তু তাহা শ্রীধামের ও প্রসাদের সম্মান প্রদর্শন জন্য। কোন সামাজিক ভোজে সকল জাতি এক সঙ্গে বসিয়া আহার করিয়াছেন, এরূপ কথা কুত্রাপি লিখিত হয় নাই। শ্রীসনাতন গোস্বামী যবন-সংসর্গ হেতু নিজকে পতিত মনে করিতেন। বর্ণাশ্রমধর্ম্মের প্রতি সম্মানবশতঃ তিনি মন্দিরের পথে না যাইয়া উত্তপ্ত বালুকাময় সমুদ্রতীরবর্ত্তী পথে যাতায়াত করিতেন। স্বয়ং মহাপ্রভু মহাপ্রসাদ পাইবার জন্য শ্রীহরিদাস ঠাকুর মহাশয়কে আহ্বান করিলেও তিনি কাতরভাবে দূরে পড়িয়া থাকিতেন, কদাচ নিকটে যান নাই।

অদ্বৈত-প্রকাশ-রচয়িতা ব্রাহ্মণ ঈশান নাগর মহাপ্রভুর পদধৌত করিতে যান—কিন্তু ব্রাহ্মণ-তনু বিষ্ণুতনু বলিয়া মহাপ্রভু ইহাতে সম্মত হয়েন নাই। ঈশান তখন উপবীত ছিঁড়িয়া ফেলিলেন।

তাহা দেখি মোর প্রভু হাসিয়া কহিলা।
কি লাগি ঈশান বিপ্রধর্ম্ম বিনাশিলা।
দ্বিজাতির যজ্ঞসূত্র চিত্তশুদ্ধিদাতা॥
নিরন্তর পরব্রহ্মে হৃদয় নিযোক্তা॥
এত কহি প্রভু পুনঃ পৈতা দিল মোরে।—অঃ প্রঃ।

লৌকিক ব্যবহারে ভোজন ও বিবাহেই বর্ণাশ্রমধর্ম্মের পরিচয় পাওয়া যায়। বৈষ্ণব বংশধর উৎপন্ন করিয়া বৈষ্ণব ধর্ম্মকে স্থায়িত্ব প্রদান করিবার জন্য শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু, শ্রীনিবাস প্রভৃতি অনেক মহাজন পরজীবনে বিবাহ করিয়াছিলেন। কিন্তু ইঁহারা কিংবা অন্য কোন মহাপ্রভুর ভক্ত স্বজাতীয় ছাড়া অন্য জাতি হইতে কন্যা গ্রহণ করিয়াছেন, এ কথা দেখিতে পাই না। নিত্যানন্দ প্রভুর ন্যায় প্রচণ্ড অবধূতও স্বজাতি, এমন কি, স্বশ্রেণীর কন্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন। ভোজনবিচার না থাকিলেও এই জন্য তাঁহার বংশধরগণও ব্রাহ্মণসমাজে স্থান পাইয়াছিলেন। "কুলকল্পতরু" নামক কুলশাস্ত্রে লিখিত আছে,—

নিতাইতনয় বীরভদ্র নাম তাঁর।
স্বনামে হইল তাঁর ভাবের সঞ্চার॥
সিন্দুরমধ্য গাঁই আছিল নিতাই।
অবধৌত কল্পতরু বন্দ্যবংশ গাঁই॥

বংশগাঁই হইল করি কুল অপচয়।
উদাসীন হইলে কভু জাতি নাহি রয়॥
উভয় বর্জ্জনে "বীর" সঙ্কেত হইল।
কুলাচার্য্য বটব্যাল রচনা করিল॥

অদ্বৈত ও নিত্যানন্দের মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ছিল। বিভিন্ন শ্রেণীভুক্ত হইলেও উভয়ের মধ্যে বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়া প্রীতি আরও বর্দ্ধিত হয়, ইহা উভয়েরই ইচ্ছা হইল। কিন্তু এই ইচ্ছাকে কার্য্যে পরিণত করিতে যাইয়া তাঁহাদের যে বেগ পাইতে হইয়াছিল, তাহাতেই তৎকালীন হিন্দুসমাজের উপর বর্ণাশ্রমধর্ম্মের প্রভাব ও তাহার নিকট বৈষ্ণবগণের মস্তক অবনত করার কথা পাওয়া যায়। নিত্যানন্দ প্রভু তাঁহার কন্যা গঙ্গাদেবীকে অদ্বৈত প্রভুর ভাগিনেয় ঘনশ্যামের হস্তে সমর্পণ করিতে চাহিলেন। কিন্তু রাঢ়ী ও বারেন্দ্রে বিবাহ সমাজে প্রচলিত ছিল না; সুতরাং তৎকালীন বঙ্গসমাজের এই দুই মহাপ্রভাবশালী ব্যক্তিকে সভা আহ্বান করিয়া পণ্ডিতসমাজের মত লইতে হইয়াছিল। রাঢ়ী ও বারেন্দ্রের মধ্যে আদানপ্রদানের এই প্রথম উদাহরণ। প্রেমবিলাস যে বলিয়াছেন,—

রাঢ়ী ও বারেন্দ্রের বিয়ে হয়েছে অনেক।
দেশভেদে নামভেদ এই পরতেক॥

ইহার অর্থ হইতেছে এই যে, রাঢ় ও বরেন্দ্র এই দুই ভূমিতে বাস করা হেতু যখন শ্রেণীভেদ হইয়াছিল, তখন অধুনা রাঢ়দেশবাসীর সহিত বরেন্দ্রদেশবাসীর বিবাহ ত অনেকই হইয়াছে; কেবল তাহাকে রাঢ়ী শ্রেণীর সহিত বরেন্দ্র শ্রেণীর বিবাহ বলে না, এই মাত্র। উদ্ধৃত পয়ার উপরিউক্ত বিবাহের সমর্থন করিবার জন্যই রচিত হইয়াছিল। প্রকৃতপক্ষে রাঢ়ী ও বারেন্দ্রের মধ্যে কোন বিবাহ এ পর্য্যন্ত হয় নাই। "বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস"-প্রণেতা দুর্গাচন্দ্র সান্যালও এই মত পোষণ করেন।

বৈষ্ণবগণ যে লৌকিক ব্যবহারে বর্ণাশ্রমধর্ম্মকে অবহেলা করেন না, তাহা বৈষ্ণবস্মৃতি শ্রীহরিভক্তিবিলাস পাঠ করিলেও বুঝা যায়। এই গ্রন্থে বৈষ্ণবের ভক্তিসাধনের ও সদাচারের যাবতীয় কথা লিখিত হইয়াছে। স্মার্ত্ত রঘুনন্দন তৎকৃত একাদশীতত্ত্ব, বিষ্ণুপূজাপদ্ধতি ও আহ্নিকতত্ত্বে শ্রীহরিভক্তিবিলাসের মত উদ্ধৃত করিয়াছেন। পূর্ব্বেই দেখিয়াছি যে, বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের অধিকাংশ ব্যক্তিই গৃহস্থ—সুতরাং তাঁহাদের পুত্রকন্যার উপনয়ন বিবাহাদি প্রয়োজন। বৈষ্ণবধর্ম্মে যদি বর্ণাশ্রম অস্বীকৃত হইত, তবে বৈষ্ণবস্মৃতিগ্রন্থ হরিভক্তিবিলাসে উপনয়ন বিবাহাদির স্বতন্ত্র ব্যবস্থা থাকিত। কিন্তু স্মার্ত্ত বিধান অনুসারে ঐ সমস্ত লৌকিক কর্ম্ম সম্পাদিত হওয়াই বৈষ্ণবশাস্ত্রকারগণের অভিপ্রেত বলিয়া তাঁহারা এ সম্বন্ধে কোন স্বতন্ত্র ব্যবস্থা লিপিবদ্ধ করেন নাই। বলা বাহুল্য, বাউলসম্প্রদায়ের অংশবিশেষের হিন্দুসমাজে প্রবেশ লাভের ব্যর্থ চেষ্টাজাত সংযোগী বৈরাগিগণের মধ্যে বিবাহে যে মালা চন্দন বদল প্রথা আছে, তাহা বিশুদ্ধ বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত

অনুমোদিত নহে। বর্ণাশ্রমধর্ম্মের দশবিধ সংস্কারের মধ্যে কেবল শ্রাদ্ধ সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ বিধি শ্রীহরিভক্তিবিলাসে দৃষ্ট হয়।

প্রাপ্তে শ্রাদ্ধদিনেঽপি প্রাগন্নং ভগবতেঽর্পয়েৎ।
তচ্ছেষেণৈব কুর্ব্বীত শ্রাদ্ধং ভাগবতো নরঃ॥

স্মার্ত্ত বিধান অনুসারেও যখন শ্রাদ্ধের পূর্ব্বে যজ্ঞেশ্বরকে শ্রাদ্ধীয় দ্রব্যের অগ্রভাগ নিবেদন করা হইয়া থাকে, তখন উদ্ধৃত বিধি বর্ণাশ্রমাচারের প্রতিকূল নহে, পরন্তু অনুকূল। স্মার্ত্ত বিধানে যাহা সামান্য বিধি, বৈষ্ণব স্মৃতিতে তাহাই বিশেষ বিধি করা হইয়াছে।

প্রেমবিলাসের চতুর্ব্বিংশতি বিলাসে রাঢ়ী ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ-সমাজের ইতিবৃত্ত ও কুলমর্য্যাদা সম্বন্ধে বিশদভাবে বর্ণনা আছে। খুব সম্ভব, প্রেমবিলাসের এই অংশ অত্যন্ত আধুনিক। কিন্তু তাহা হইলেও বৈষ্ণবগ্রন্থের পরিশিষ্টে যে কুলাচার বর্ণিত আছে, তাহা হইতে অনুমিত হয় যে, মহাপ্রভুর উপাসকগণের মধ্যে বর্ণাশ্রমধর্ম্মের প্রভাব শিথিল হয় নাই।

এই সমস্ত তত্ত্ব ও প্রমাণ ভালভাবে আলোচনা না করিয়াই আধুনিক লেখকগণ এই ভ্রান্ত মত প্রচার করেন যে, মহাপ্রভু জাতিধর্ম্ম উঠাইয়া দিতে চাহিয়াছিলেন ও জাতিধর্ম্মের প্রভাব সমাজে তখন শ্লথ হইয়া গিয়াছিল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার

জৈনদিগের দৈনিক ষট্‌কর্ম্ম*

হিন্দু দ্বিজাতির পক্ষে প্রতিদিন পাঁচটী মহাযজ্ঞের † অনুষ্ঠান করিবার ব্যবস্থা আছে। অবশ্য এই যজ্ঞগুলির মধ্যে সকলগুলিতেই দেবতোদ্দেশে অগ্নিতে আজ্যাদি আহুতি দিতে হয় না। এই মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান একটু অন্যরূপ। বেদাদির অধ্যয়ন এবং অধ্যাপন ব্রহ্মযজ্ঞ, পিতৃলোকের তর্পণ পিতৃযজ্ঞ, বৈশ্বদেব হোম দেবযজ্ঞ,—পশু পক্ষীদিগকে অন্নদান ভূতযজ্ঞ আর অতিথিপূজন নৃযজ্ঞ ‡। প্রাচীন কালে প্রত্যেক দ্বিজ নিত্য নিয়মিতভাবে এই পাঁচ মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেন। এগুলি তাঁহাদের নিত্যকর্ম্মের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

এই পঞ্চ মহাযজ্ঞের বর্ণনা করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। হিন্দুগণের এই পঞ্চ মহাযজ্ঞের অনুরূপ জৈনগণের পক্ষে প্রতিদিন অনুষ্ঠেয় ষট্‌কর্ম্ম বা ছয়টী কার্য্যবিশেষের অনুষ্ঠান করিবার নিয়ম আছে। সেইগুলির বিষয় সংক্ষেপে কথঞ্চিৎ আলোচনা করিবার অভিপ্রায়েই এই প্রবন্ধ লিখিত হইতেছে। জৈন শাস্ত্রকার বলিয়াছেন,—

দেবপূজা গুরূপাস্তিঃ স্বাধ্যায়ঃ সংযমস্তপঃ।
দানং চেতি গৃহস্থানাং ষট্‌ কর্ম্মাণি দিনে দিনে॥

দেবপূজা, গুরুর উপাসনা, স্বাধ্যায় (শাস্ত্রাধ্যয়ন), সংযম, তপস্যা এবং দান, এই ছয়টী কর্ম্ম প্রত্যেক গৃহস্থেরই প্রতিদিন অনুষ্ঠান করিতে হইবে। ইহাই জৈন শাস্ত্রের বিধান। এই ষট্‌-কর্ম্মই জৈনদিগের নিত্যকৃত্যের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান। জৈন শ্রাবক প্রতিদিন তাঁহার ধর্ম্মের অন্য শাস্ত্রের নির্দেশানুসারে অন্য কোনও কার্য্য করুন আর নাই করুন, এই ষট্‌কর্ম্মের অনুষ্ঠান তাঁহার অবশ্য কর্ত্তব্য। তবে কোন বিধিই সকলের পক্ষে সমানভাবে প্রযুক্ত হইতে পারে না। যিনি সম্যগ্‌জ্ঞানী, যিনি বিদ্বান্‌, যিনি সমর্থ, তিনি সম্যক্‌রূপে এই ষট্‌কর্ম্মের সমস্ত বিধান পালন করিয়া চলিবেন। আর যিনি অল্পজ্ঞ—যিনি অসমর্থ, তিনি যথাসাধ্য প্রতিদিন ষট্‌কর্ম্মের প্রত্যেক কর্ম্মের অন্ততঃ আংশিক অনুষ্ঠান করিবেন। কার্য্যতঃও দেখিতে পাওয়া যায়, জৈনদিগের মধ্যে সকলেই যথাশক্তি ষট্‌কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। ফলতঃ, হিন্দু ব্রাহ্মণাদির সন্ধ্যাবন্দনাদির মত এইষট্‌কর্ম্ম জৈনদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য নিত্যকর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত। এই সকল কর্ম্মানুষ্ঠানের যে সকল বিধান জৈনশাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে, তাহাদেরই সম্বন্ধে কথঞ্চিৎ আলোচনা এইবার করিব।

দেবপূজা

দেব (চতুর্বিংশতি অতীত জিন বা তীর্থঙ্কর, চতুর্বিংশতি বর্ত্তমান তীর্থঙ্কর এবং চতুর্বিংশতি ভবিষ্যৎ তীর্থঙ্কর), গুরু (আচার্য্য, উপাধ্যায়, সাধু, মুনি প্রভৃতি) ও শাস্ত্র—এই সকলকেই জৈনগণ

---

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ৩১শ বার্ষিক ২য় মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

† ব্রহ্মযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, দেবযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ ও নৃযজ্ঞ।

‡ অধ্যাপনং ব্রহ্মযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞস্তু তর্পণম্।
হোমো দৈবো বলির্ভৌতো নৃযজ্ঞোঽতিথিপূজনম্॥—মনুসংহিতা ৩.৭০।

দেবতাজ্ঞানে পূজা করিয়া থাকেন। নিত্যপূজায় সাধারণতঃ তাঁহারা তীর্থঙ্করগণের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়া ভক্তিসহকারে জল প্রভৃতি অষ্ট দ্রব্যের দ্বারা সেই মূর্ত্তির পূজা করিয়া থাকেন। কাহারও কাহারও নিজ গৃহেই এইরূপ জিনমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত থাকে। যাঁহাদের বাড়ীতে এইরূপ জিনমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে, তাঁহারা গৃহেই নিত্যপূজা সম্পন্ন করিতে পারেন। কিন্তু যাঁহাদের গৃহে এরূপ মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত নাই, তাঁহারা নিকটবর্ত্তী জিনমন্দিরে যাইয়া পূজাকার্য্য সমাধা করেন। একটা কথা এ স্থানে বলা দরকার। জৈনেরা যে সকল দেবমূর্ত্তি প্রস্তুত করেন, তাহা হয় ধাতুময়ী, না হয় পাষাণময়ী। মৃণ্ময়ী মূর্ত্তি প্রস্তুত করা তাঁহাদের শাস্ত্রবিরুদ্ধ।

নিত্যপূজার সময় যে মন্দিরে যে তীর্থঙ্কর প্রধানরূপে প্রতিষ্ঠিত, তাঁহার পূজা করা বিধেয়। একসঙ্গে চতুর্বিংশতি তীর্থঙ্করের পূজাও করা যাইতে পারে। এইরূপ একত্র চতুর্ব্বিংশতি তীর্থঙ্করের পূজা করার নাম "সমুচ্চয়চতুর্ব্বিংশতিজিনপূজা।"

জৈনদিগের পূজ্য এই যে জিন বা তীর্থঙ্কর, ইঁহারা মানবরূপেই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তবে তাঁহারা তপশ্চর্য্যাদির প্রভাবে কর্ম্মবন্ধন ছিন্ন করিয়া মোক্ষলাভ করিয়াছেন এবং সর্ব্বজ্ঞতা প্রভৃতি গুণলাভ করিয়া সাধারণকে মোক্ষলাভের উপায়সমূহ (বা মোক্ষমার্গ) নির্দেশ করিয়া দিয়াছেন। এইরূপ মুক্ত পরমাত্মার পূজাকে জৈনাচার্য্যগণ শ্রাবকের দৈনন্দিন কৃত্যের মধ্যে প্রধান স্থান দিয়া বোধ হয় ইহাই প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, এই তীর্থঙ্করগণই প্রত্যেক শ্রাবকের আদর্শস্বরূপ হওয়া উচিত এবং প্রত্যেক শ্রাবকেরই তাঁহাদের অবলম্বিত পন্থা অনুসরণ করিয়া এবং তাঁহাদের আচরণের সর্ব্বথা অনুকরণ করিয়া, তাঁহাদেরই মত মোক্ষলাভের জন্য যত্নবান্ হওয়া উচিত। জৈন শাস্ত্রের যে ইহাই একমাত্র অভিপ্রায়, তাহা জিনপূজার মন্ত্রগুলি মনোযোগের সহিত পাঠ করিলেও স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান হয়। মোক্ষ ভিন্ন জৈনদিগের জীবনের অপর কোন লক্ষ্য নাই—মোক্ষলাভই এই নিত্য জিনপূজার মুখ্য ও একমাত্র উদ্দেশ্য—পূজার প্রতিমন্ত্রে তাহার নিদর্শন পাওয়া যায়।

পূজাকালে তীর্থঙ্করের উদ্দেশে জলচন্দনাদি উৎসর্গ করিবার সময় প্রত্যেক স্থলেই এক একটী কামনার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। হিন্দুদিগের পূজার মধ্যে এ জিনিষটী নাই। তাঁহারা পূজার প্রারম্ভে কামনার উল্লেখ করিয়া সঙ্কল্প করিয়া থাকেন বটে; তবে পাদ্যাদি উৎসর্গ করিবার সময় কোন কামনা করেন না। কিন্তু জৈনগণ ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের দ্বারা পূজা করিবার সময় ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে মুক্তির কামনা করেন। উদাহরণ দিলেই কথাটী স্পষ্ট হইবে।

"ওঁ হ্রীং বৃষভাদিবীরান্তেভ্যো জন্মমৃত্যুবিনাশনায় জলং নির্ব্বপামি,......ভবতাপবিনাশায় চন্দনং নির্বপামি,......অক্ষতপদপ্রাপ্তয়ে অক্ষতান্ নির্বপামি, ...কামবাণবিধ্বংসনায় পুষ্পং নির্বপামি,......... ক্ষুধারোগবিনাশনায় নৈবেদ্যং নির্বপামি,... .. মোহান্ধকারবিনাশনায় দীপং নির্বপামি,......অষ্টকর্ম্মদহনায় ধূপং নির্বপামি,......মোক্ষফলপ্রাপ্তয়ে ফলং নির্বপামি,......অনর্ঘ্যপদপ্রাপ্তয়ে অর্ঘ্যং নির্বপামি।"

জৈনদিগের এই কামনা সম্বন্ধে আর একটী বিষয়ও লক্ষ্য করিতে হইবে। পূজার্চনাদির সময়

হিন্দুদিগের কামনার বিষয় পুত্র, পৌত্র, ধন, ঐশ্বর্য্য, অক্ষয় স্বর্গলাভ প্রভৃতি। কিন্তু জৈনগণ দৈনন্দিন দেবপূজার সময়ও এই সকল বিনশ্বর বস্তু কামনা করেন না। প্রত্যেক জৈনেরই জীবনে একমাত্র লক্ষ্য মোক্ষপ্রাপ্তি। সুতরাং তাঁহারা সেই মোক্ষপ্রাপ্তির অনুকূল বিষয় ব্যতীত অপর বিষয়ের কামনা কদাপি করেন না। অবশ্য হিন্দুরও যে চরম লক্ষ্য মোক্ষ, তাহা কেহই অস্বীকার করিবেন না। তবে হিন্দু দার্শনিকের মতে প্রারম্ভ হইতেই মোক্ষপ্রাপ্তির জন্য প্রয়াস করিলে অনেক সময় সে প্রয়াস ব্যর্থ হইয়া যায়। সংসারের প্রতি যত দিন মনের বৈরাগ্য উপস্থিত না হয়, ততদিন মোক্ষপ্রাপ্তির জন্য যত্ন করা পণ্ডশ্রম ব্যতীত আর কিছুই নহে। এই জন্য স্বর্গভোগাদি নশ্বর বস্তু প্রাপ্তির জন্য মানুষ প্রথমে পূজার্চ্চনাদির অনুষ্ঠান করুক—এইরূপে চিত্ত শুদ্ধ হইলে এবং বৈরাগ্য উপস্থিত হইলে তখন মোক্ষলাভের জন্য যত্ন করিলে তাহা অল্প সময়ের মধ্যেই ফলপ্রসূ হইবে। জৈনগণ তাহার উত্তরে বলিবেন—চিত্তশুদ্ধিই যদি পূজাদির উদ্দেশ্য হয় এবং কামনার দ্বারা লোকের চিত্ত পূজাদির দিকে আকৃষ্ট করাও যদি প্রয়োজন বলিয়া মনে হয়, তাহা হইলে এ উভয় কার্য্যই ত পূজার সময় মোক্ষপ্রাপ্তির অনুকূল ইন্দ্রিয়-জয়াদি ও মোক্ষলাভের কামনাদ্বারা সিদ্ধ হইতে পারে।

যাহা হউক, পূজাদি ব্যাপারে এইরূপ মোক্ষলাভের যে কামনা এবং প্রারম্ভ হইতেই সকলের চিত্ত জীবনের এই চরম লক্ষ্যের দিকে উন্মুখ করিবার জন্য এই যে চেষ্টা, তাহা যে বিশেষ প্রশংসনীয়, তাহাতে সন্দেহ করিবার অবকাশ নাই। জৈনদিগের প্রত্যেক ধর্ম্মানুষ্ঠানের মধ্যেই এই চরম লক্ষ্যের দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিয়া জৈন শাস্ত্রকারগণ প্রত্যেকের সম্মুখেই যে সকল সময়ের জন্য এক উচ্চ আদর্শ উপস্থিত রাখিয়াছেন, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। জীবনের যেটি লক্ষ্য হওয়া উচিত, সেটীর কথা এইরূপ সকল সময়ে সকলের হৃদয়ের মধ্যে জাগরূক করিয়া রাখার উপকারিতা ও প্রয়োজনীয়তা পণ্ডিত মাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিবেন।

আমরা প্রকৃত বিষয় হইতে অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। এখন প্রকৃতের অনুসরণ করা কর্ত্তব্য। পূজা আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে যে জিন বা তীর্থঙ্করের পূজা করা হইবে, তাঁহার আবাহন, স্থাপন ও সন্নিধীকরণ * করিতে হয়। তাহার পর পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রের দ্বারা জল, চন্দন, অক্ষত, পুষ্প, নৈবেদ্য, দীপ, ধূপ ও ফল, এই অষ্ট দ্রব্যের সাহায্যে পূজা করিতে হয়। ইহারই নাম অষ্টক বা অষ্টদ্রব্য পূজা। ইহার পর পঞ্চকল্যাণকের অনুষ্ঠান করা হয় অর্থাৎ অর্চ্চনীয় তীর্থঙ্করের গর্ভ, জন্ম, তপস্যা, জ্ঞানলাভ ও মোক্ষের কথা স্মরণ করিয়া এক একটী অর্ঘ্য দেওয়া হয়। ইহার পর স্তোত্রাদি বা জয়মালা পঠিত হয়। এইরূপ স্তোত্রাদি পাঠ করিতে করিতে জিনমূর্ত্তিকে প্রদক্ষিণ করা হইয়া থাকে।

হিন্দুদিগের যেমন এক দেবতার পূজা করিবার সময় মূল পূজার পূর্ব্বে ও পরে গণেশাদি নানা দেবতার পূজা করিয়া লইতে হয়, জৈনদিগের সেইরূপ কোনও বিধান দেখা যায় না। তারপর হিন্দুদিগের মধ্যে পূজার দ্রব্যাদির বাহুল্যানুসারে ষোড়শোপচার, দশোপচার ও পঞ্চোপচার, এই কয়টী

* আবাহন করিবার সময় 'অত্র অবতর অবতর সং বৌষট্‌', স্থাপন করিবার সময় "অত্র তিষ্ঠ তিষ্ঠ ঠঃ ঠঃ" এবং সন্নিধীকরণের সময় 'অত্র মম সন্নিহিতো ভব ভব বষট্‌।' এই মন্ত্র পাঠ করিতে হয়।

জেন দেখিতে পাওয়া যায়। জৈনদিগের মধ্যে কিন্তু মাত্র ঐ অষ্টকের ব্যবস্থা। তবে প্রতিদিনই যে সকলে ঐ আটটী দ্রব্যের দ্বারা পূজা করেন, এমন নহে। সংক্ষেপের জন্য বেশীর ভাগ লোকেই জিনমন্দিরে যাইয়া জিনদেবের দর্শন ও তাঁহার উদ্দেশে অক্ষত অথবা পুষ্প ও যে কোন একটী ফলমাত্র উৎসর্গ করিয়া থাকেন। তবে এইটুকু অনুষ্ঠান করিতে পারত পক্ষে প্রায় কোন স্ত্রীপুরুষই বাধা করেন না।

গুরূপাস্তি

যাঁহারা সংসারের মায়া পরিত্যাগ করিয়াছেন—বিষয়ের প্রলোভন যাঁহাদিগকে প্রলুব্ধ করিতে পারে না—কামক্রোধাদি যাঁহাদের নিকট পরাজয় স্বীকার করিয়াছে, এরূপ মুনিদিগের সেবা বা উপাসনা করাও প্রত্যেক শ্রাবকের দৈনন্দিন কর্ত্তব্যের মধ্যে পরিগণিত। কায়, মন ও বাক্যের দ্বারা প্রতিনিয়তই ইঁহাদিগের সেবা করা উচিত, ইহা জৈনশাস্ত্রের বিধি *। এইরূপ মুনির পার্শ্বে বসিয়া তাঁহাদের নিকট শ্রদ্ধার সহিত বিবিধ বিষয়ে উপদেশ গ্রহণ করাও এই গুরূপাসনারই অন্তর্গত। তারপর এইরূপ গুরুকে যথাবিধি অর্চ্চনা করিয়া তাঁহার নিকট নিজের আচরিত পাপের কথাও প্রকাশ করা উচিত। † এইরূপে গুরুর নিকট স্বকৃত পাপের বিষয় উল্লেখ করিলে এক দিকে যেমন গুরু সমস্ত বিষয় বুঝিয়া কর্ত্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ দিতে পারেন, অন্য দিকে আবার শ্রাবকের ইহা বলিতে বলিতে পাপের প্রতি ঘৃণা স্বতঃই উৎপন্ন হয় এবং সে পাপ পরিত্যাগ করিবার জন্য তাহার হৃদয়ে বাসনা প্রবল হইয়া উঠে। ফলতঃ অপরের নিকটই হউক বা নিজ মনে মনেই হউক, স্বকৃত পাপের একবার আলোচনা করিলে তাহাতে যথেষ্ট সুফল পাওয়া যায়।

তবে আজকাল আর সাধারণতঃ সেই নির্গ্রন্থ দিগম্বর মুনি বহুল পরিমাণে পাওয়া যায় না। এই জন্য সেইরূপ মহাপুরুষদিগের কথা স্মরণ করা এবং সম্যগ্‌দৃষ্টি ও সম্যগ্‌জ্ঞান যাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এরূপ ঐলক, ক্ষুল্লক ‡ ও ব্রহ্মচারীকেই সেবা করা এবং তাঁহাদের নিকট বসিয়া উপদেশ গ্রহণ করা গুরূপাস্তির অনুকল্পরূপে বিহিত হইয়াছে।

---

* সাগারধর্ম্মামৃত—২।৪৩। † সাগারধর্ম্মামৃত—৬।১১।

‡ উৎকৃষ্ট জৈন শ্রাবকদিগের মধ্যে দুই ভেদ—(১) ঐলক, (২) ক্ষুল্লক। ক্ষুল্লক অপেক্ষা ঐলকের স্তর উচ্চে। ক্ষুল্লক একখানি কৌপীন ও একখণ্ড ক্ষুদ্র উত্তরীয় মাত্র ধারণ করিয়া থাকেন। তাঁহার নিকট জলপানের জন্য একটী কমণ্ডলু, ভোজনের জন্য একটী পাত্র এবং মাটি হইতে কীটপতঙ্গাদি অপসারিত করিবার জন্য ময়ূরপুচ্ছনির্ম্মিত পিচ্ছিকা থাকে। ক্ষুল্লককে বিশেষ যত্নের সহিত সামায়িক, প্রোষধোপবাস, স্বাধ্যায় ও অন্যান্য ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে হয়। ঐলককেও মুনিদিগের ন্যায় শ্রদ্ধার সহিত বিবিধ ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে হয়। রাত্রিতে তাঁহার পক্ষে মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক ধ্যানস্থ হইবার বিধান আছে। একখানি কৌপীন, পিচ্ছিকা ও একটী কমণ্ডলু ভিন্ন ঐলকের অন্য কোনও দ্রব্য রাখিবার নিয়ম নাই। খাদ্য সম্বন্ধে উভয়কেই শ্রাবকের দানের উপর নির্ভর করিতে হয়। তবে শ্রাবক স্বয়ং অভ্যর্থনা না করিলে যাচিয়া শ্রাবকের বাড়ীতে ইঁহারা ভোজন করেন না।

স্বাধ্যায়

প্রত্যেক জৈনের পক্ষেই প্রতিদিন যথাসাধ্য কিছু সময় জৈনশাস্ত্র আলোচনা করা কর্ত্তব্য। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, জৈনগণ শাস্ত্রগ্রন্থকে দেবতার মত ভক্তি ও পূজা করেন। সুতরাং শাস্ত্রালোচনও যে তাঁহাদের পক্ষে দৃঢ় ভক্তি ও শ্রদ্ধার সহিত কর্ত্তব্য, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। যিনি গ্রন্থ পাঠ বা শ্রবণ করিবেন, তাঁহাকে পবিত্রভাবে ভক্তির সহিত ঐ কার্য্য করিতে হইবে, ইহা জৈনশাস্ত্রের বিধি। অপবিত্র বস্ত্রাদি পরিধান করিয়া, অস্নাত অপবিত্র দেহে, অপরিষ্কৃত ও অপবিত্র স্থানে বসিয়া অশ্রদ্ধার সহিত শাস্ত্রগ্রন্থের অধ্যয়ন বা আলোচনা করিলে উহাতে শাস্ত্রের অবমাননা করা হয় এবং সেরূপ অধ্যয়ন বা আলোচনায় কোনরূপ সুকৃতি লাভ হয় না বলিয়া জৈনশাস্ত্রকারগণ উহা নিষিদ্ধ বলিয়া প্রতিপাদন করিয়াছেন।

জৈনদিগের এই স্বাধ্যায় শব্দে শাস্ত্রের অধ্যয়নমাত্রই বুঝিতে হইবে না। ফলতঃ, শাস্ত্রের অধ্যয়ন ব্যতীতও স্বাধ্যায়ক্রিয়া সম্পন্ন হইতে পারে। কথাটী একটু পরিষ্কার করিয়া বলা দরকার। জৈনশাস্ত্রকারগণ স্বাধ্যায়ের কয়েকটী প্রকারভেদ স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে স্বাধ্যায় পাঁচ প্রকার—বাচনা স্বাধ্যায়, পৃচ্ছনা স্বাধ্যায়, অনুপ্রেক্ষা স্বাধ্যায়, আম্নায় স্বাধ্যায় ও ধর্ম্মোপদেশ স্বাধ্যায় *। বিশুদ্ধভাবে শাস্ত্রগ্রন্থের পঠন ও পাঠনের নাম বাচনা স্বাধ্যায়। প্রকৃতপক্ষে বলিতে গেলে ইহাই যথার্থ স্বাধ্যায়। শাস্ত্রগ্রন্থের কোন অংশ বুঝিতে না পারিলে জ্ঞানী ব্যক্তির নিকট বিনীতভাবে তাহার অর্থ জিজ্ঞাসা করিবার নাম পৃচ্ছনাস্বাধ্যায়। গুরুর নিকট হইতে শ্রুত বিষয়ের পুনঃ পুনঃ চিন্তা ও অভ্যাস করার নাম অনুপ্রেক্ষাস্বাধ্যায়। শুদ্ধভাবে স্পষ্টরূপে (আর্ষ আম্নায়ানুসারে অর্থ বুঝিয়া) শাস্ত্রগ্রন্থ আবৃত্তি করার নাম আম্নায়স্বাধ্যায়। জনসাধারণকে উন্মার্গ হইতে সৎপথে আনিবার জন্য এবং তাহাদিগকে পদার্থের যথার্থ স্বরূপ বুঝাইবার জন্য ধর্ম্মবিষয়ে উপদেশ দেওয়ার নাম ধর্ম্মোপদেশস্বাধ্যায়।

এই পঞ্চবিধ স্বাধ্যায়ের মধ্যে যে কোন স্বাধ্যায়ের অনুষ্ঠান করা প্রত্যেক শ্রাবকের পক্ষে প্রতিদিনই কর্ত্তব্য। স্বাধ্যায়ের এই কয়টী ভেদ থাকায় জৈনদিগের মধ্যে দুইটী সুন্দর জিনিষ লক্ষিত হয়। প্রথমতঃ, ইহাতে কি পণ্ডিত, কি মূর্খ—কি অক্ষরজ্ঞ, কি নিরক্ষর—কি উচ্চজাতি, কি অস্পৃশ্য নীচ জাতি, সকলের পক্ষেই একপ্রকার না একপ্রকার স্বাধ্যায় পালন করা সম্ভবপর হয়। দ্বিতীয়তঃ, ইহাতে সমাজের প্রত্যেকেই শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয় সম্বন্ধে কিছু কিছু জ্ঞান লাভ করিতে পারে। বাঙ্গালাদেশে যখন কথকতার প্রচলন খুব বেশী ছিল, তখন যেমন বঙ্গপল্লীর আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই হিন্দুপুরাণ ও হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞানলাভ করিত, স্বাধ্যায়ের এইরূপ নানা ভেদ জৈনশাস্ত্রে বর্ণিত হওয়ার দরুণ এবং এই স্বাধ্যায় প্রত্যেক জৈনের অবশ্যকর্ত্তব্য দৈনন্দিন কার্য্যের মধ্যে পরিগণিত হওয়ায় জৈনশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বহু জটিল ও গভীর তত্ত্ব সম্বন্ধেও জৈন সাধারণ লোকের তেমনই যথেষ্ট জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। নিরক্ষরেরাও দর্শনের প্রতিপাদ্য কঠিন কঠিন বিষয় সম্বন্ধে কথঞ্চিৎ অভিজ্ঞ—এরূপ লোক

* তত্ত্বার্থাধিগমসূত্র—৯।২৫।

বোধ হয়, জৈনদিগের মধ্যে ভিন্ন অপর কোনও ধর্ম্মাবলম্বিগণের মধ্যে পাওয়া যায় না। মুক্তি কি—মুক্তি লাভের উপায় কি, তত্ত্ব কয় প্রকার, প্রমাণ কাহাকে বলে, জ্ঞান কয় প্রকার, জীব কয় প্রকার প্রভৃতি বিষয়ে প্রশ্ন করিলে প্রত্যেক জৈন শ্রাবকই তাহার কিছু উত্তর দিতে পারিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। বস্তুতঃ, এই বিষয়টী লক্ষ্য করিয়া আমি প্রকৃতপক্ষেই বিস্মিত ও আনন্দিত হইয়াছি। আমার মনে হয়, প্রত্যেক ধর্ম্মেই এইরূপ ধর্ম্মগ্রন্থের স্বাধ্যায়ের ব্যবস্থা থাকা দরকার।

সংযম

জৈনশাস্ত্রকারদিগের মতে সংযম দুই প্রকার—(১) ইন্দ্রিয়সংযম, (২) প্রাণিসংযম। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়কে তাহাদের বিষয় হইতে নিবৃত্ত করার নাম ইন্দ্রিয়সংযম। আর প্রাণিহিংসা হইতে বিরত হওয়ার নাম প্রাণিসংযম। এই দুই সংযম অভ্যাস করিবার জন্য প্রত্যেক শ্রাবককেই প্রতিদিন যথাশক্তি চেষ্টা করিতে হইবে। 'আজ আমি এই জিনিসটী দেখিব না', 'আজ আমি এই জিনিসটী খাইব না' প্রতিদিন শ্রাবককে এইরূপ একটী একটী (শক্ত্যনুসারে একাধিক) প্রতিজ্ঞা করিয়া এবং সেই প্রতিজ্ঞানুসারে কার্য্য করিয়া সংযম অভ্যাস করিতে হইবে। ইহাই তাহার পক্ষে দৈনন্দিন কর্ত্তব্য সংযম। এইরূপে অভ্যাস করিলে কালক্রমে তাহার দুই প্রকার সংযমই অভ্যস্ত হইবে এবং ধর্ম্মবিষয়ে বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করিয়া সে সাক্ষাৎ মুক্তির কারণ মুনিধর্ম্ম ধারণ করিতে সক্ষম হইতে পারিবে।

তপঃ

ধর্ম্মে প্রবৃত্তি বাড়াইবার জন্য প্রতিদিনই যথাশক্তি কিছু না কিছু তপশ্চর্য্যা বা আত্মধ্যানাদির অনুষ্ঠান করাও কর্ত্তব্য। এইরূপ ক্রিয়ার আর এক নাম সামায়িক। ইহার অনুষ্ঠান আদৌ কঠিন নহে। "ওঁ নমঃ সিদ্ধেভ্যঃ," "শ্রীবীতরাগায় নমঃ," "ণমো অরহন্তাণং" "ণমো সিদ্ধাণং" ইত্যাদি মন্ত্রের যে কোন একটী যথাশক্তি স্থিরচিত্তে সংযত ও পবিত্রভাবে জপ করাই এই অনুষ্ঠানের মুখ্য কর্ত্তব্য। এরূপ জপের দ্বারা চিত্তের পবিত্রতা ও একাগ্রতা সাধিত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মের প্রতি অনুরাগও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

এই তপশ্চর্য্যার মধ্যে আর একটী কার্য্য করিবারও বিধান দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রাবক যে যে পাপকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছে, মনে মনে তাহার আলোচনা, তাহার জন্য অনুতাপ এবং সেইরূপ কার্য্য ভবিষ্যতে যাহাতে সঙ্ঘটিত না হয়, সে বিষয়ে মনে মনে চিন্তা করাও তপশ্চর্য্যার অন্তর্ভুক্ত। এরূপ চিন্তা ও আলোচনার দ্বারা যে অনেক উপকার হয়, তাহা কেহই অস্বীকার করিবেন না। জৈনাচার্য্যগণ তপস্যার দ্বাদশ প্রকার ভেদের বর্ণনা করিয়াছেন। তন্মধ্যে ছয় প্রকার বাহ্য তপঃ ও ছয় প্রকার আভ্যন্তর তপঃ। অনশন, অবমৌদর্য্য, বৃত্তিপরিসংখ্যান, রস-পরিত্যাগ, বিবিক্তশয্যাসন ও কায়ক্লেশ, এই ছয়টী হইল বাহ্য তপঃ। খাদ্যদ্রব্যাদি বাহ্য বস্তু বিষয়েই এই তপের বিধান; তাই ইহার নাম বাহ্য তপঃ। প্রায়শ্চিত্ত, বিনয়, বৈয়াবৃত্ত্য, স্বাধ্যায়, ব্যুৎসর্গ ও ধ্যান, এই ছয়টী আভ্যন্তর তপঃ। এই দ্বাদশবিধ তপস্যা মুনিগণেরই মুখ্য কর্ত্তব্য। তবে শ্রাবকগণ যথাশক্তি ইহাদের অনুষ্ঠান করিবেন, ইহাই জৈনশাস্ত্রের নির্দেশ।

এক্ষণে সংক্ষেপে এই তপস্যাগুলির লক্ষণ নির্দ্দেশ করিব। সংযম অভ্যাস করিবার নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য খাদ্য, স্বাদ্য, লেহ্য, পেয়, এই চারি প্রকার ভোজন ত্যাগ করার নাম অনশন তপঃ। বিবিধ উৎসবাদি উপলক্ষে হিন্দুদিগের যে উপবাসের বিধান আছে, জৈনদিগের অনশন তপঃ অনেকটা সেইরূপ। উপোষিত অবস্থায় পূজা ধ্যানাদির অনুষ্ঠানে চিত্তের একাগ্রতা বৃদ্ধি পাইয়া থাকে, ইহা সকলেই স্বীকার করেন। সংযমাভ্যাস, ইন্দ্রিয়দমন, এবং চিত্তের একাগ্রতা সাধনের উদ্দেশ্যে অল্প পরিমাণে (আকণ্ঠ পূর্ণ না করিয়া) ভোজন করার নাম অবমৌদর্য্য। অধিক পরিমাণে ভোজন যেমন স্বাস্থ্যের অনিষ্ট জন্মায়, তেমনই ধর্ম্মানুষ্ঠানের পথে বাধা হইয়া দাঁড়ায়। "আজ মাত্র দুই বাড়ীতে যাইব। আহার মিলে ত ভাল; নহিলে উপবাসী থাকিব।" এইরূপ প্রতিজ্ঞানুসারে কার্য্য করার নাম বৃত্তিপরিসংখ্যান। সংযমাভ্যাসার্থ ঘৃত, দুগ্ধ, দধি, গুড়, লবণ, তৈল প্রভৃতির মধ্যে প্রতিদিন এক বা একাধিক রসত্যাগ করার নাম রসপরিত্যাগ *। চিত্তের একাগ্রতাসাধনের জন্য নির্জ্জন স্থানে শয়ন ও উপবেশন করিবার নাম বিবিক্তশয্যাসন। শরীরের প্রতি মমত্ব ত্যাগ করিয়া নানারূপ কষ্ট সহ্য করার নাম কায়ক্লেশ। এই সকল তপগুলি সংযমাভ্যাস, ইন্দ্রিয়দমন, চিত্তের একাগ্রতাসাধন প্রভৃতি বিষয়ে যে একান্ত উপযোগী, তাহা একটু বিবেচনা করিলেই বুঝা যায়। অবশ্য নব্যসম্প্রদায়ের অনেকে হয় ত ইহাকে প্রশংসার চক্ষে দেখিবেন না। কিন্তু সংযম অভ্যাস করাই যদি লক্ষ্য হয়, তবে তাহা ত্যাগের মধ্য দিয়া ভিন্ন ভোগের মধ্য দিয়া হয় না, এ কথা স্থির নিশ্চিত।

আভ্যন্তর তপের সকলগুলির লক্ষণ বলা প্রয়োজনীয় মনে করি না। প্রায়শ্চিত্ত, বিনয় ও ধ্যান, ইহাদের অর্থ সকলেই জানেন। স্বাধ্যায়ের কথা ইতঃপূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। মুনি প্রভৃতির সেবা করার নাম বৈয়াবৃত্ত্য। পরিগ্রহপরিত্যাগের নাম ব্যুৎসর্গ।

দান

প্রতিদিন যথানিয়মে যে শ্রাবক কিছু দান করে এবং যথাশক্তি তপশ্চর্য্যা করে, সে জন্মান্তরে শ্রেষ্ঠ লোকে গমন করিয়া থাকে। † এই জন্যই সাগারধর্ম্মামৃতকার শ্রাবকের দৈনন্দিন আচারের বর্ণনা করিবার প্রসঙ্গে বলিয়াছেন,—"তাহার পর ভক্তির সহিত যথাশক্তি সৎপাত্রকে (দানাদির দ্বারা) সন্তুষ্ট করিয়া এবং আশ্রিত সকল লোকেরই সন্তোষ বিধান করিয়া যথাকালে পরিমিত আহার করিবে। ‡

দান করিবার সময়ে সৎপাত্রকেই দান করা উচিত। জৈনাচার্য্যগণের মতে সৎপাত্রের মধ্যেও উত্তম, মধ্যম ও জঘন্য, এই তিন শ্রেণী আছে। সংসারত্যাগী মুনিই উত্তম পাত্র। সম্যগ্‌দৃষ্টি-সম্পন্ন শ্রাবক মধ্যম পাত্র আর যাহাদের সম্যগ্‌দর্শন নাই, এরূপ সাধারণ ক্ষুধাতুরাদি দুঃখী মাত্রেই জঘন্য পাত্র। উত্তম পাত্রে দান করিতে পারিলে তাহাতেই সমধিক ফল লাভ হয়; তবে

* হিন্দুদিগের মধ্যেও এইরূপ সংযমাভ্যাসের জন্যই প্রতিদিন কোনও না কোনও দ্রব্য পরিত্যাগ করিবার ব্যবস্থা আছে।

† সাগারধর্ম্মামৃত—২।৪৯। ‡ সাগারধর্ম্মামৃত—৬।২০।

উত্তম পাত্র পাওয়া না গেলে অগত্যা মধ্যম বা অধম পাত্রকেই দান করিতে হইবে, ইহা জৈন শাস্ত্রের মত ও গৃহস্থগণের প্রাত্যহিক কর্ম্ম।

ইঁহাদের মতে দান চারি প্রকার—অভয়দান, আহারদান, বিদ্যাদান ও ঔষধদান। এই চারি প্রকার দানের মধ্যে সকলগুলি না হউক, অন্ততঃ একটী প্রত্যহ প্রত্যেক শ্রাবকের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। সকল লোকের বাঞ্ছিত ধর্ম্ম, কাম, অর্থ ও মোক্ষ—উৎকৃষ্ট সুখ প্রভৃতি লাভ করা প্রাণ না থাকিলে সম্ভবপর হয় না। সুতরাং প্রাণই ইহাদের সকলের মূল। সেই মূলীভূত প্রাণ-রক্ষার জন্য যিনি অভয়দান করেন, তিনি কিই বা দান না করেন অর্থাৎ তাঁহার দানই সর্ব্বোৎকৃষ্ট।* অভয়দানের এই প্রশংসাসূচক বাক্য হইতে প্রতীত হইতেছে যে, জীব রক্ষা করার জন্য যে অহিংসা-ব্রতের অনুষ্ঠান, তাহাও এই অভয়দানেরই অন্তর্ভুক্ত।

শাস্ত্রপাঠেই কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিষয় জ্ঞান জন্মে—শাস্ত্রপাঠেই ধর্ম্মে অনুরাগ জন্মায়, পাপরাশি দূর করে এবং চিত্তকে পবিত্র করে; সুতরাং সেই শাস্ত্র দান করা একান্ত কর্ত্তব্য †। এই শাস্ত্রদানই বিদ্যাদান নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

যাহার জন্য লোকে ভার্য্যা, ভ্রাতা এবং পুত্রকেও ত্যাগ করে, যাহা বিনা ব্রতাদি সকলই নষ্ট হয়, যাহার অভাবে পীড়িত হইয়া লোকে ক্ষুধার প্রকোপে অখাদ্য পর্য্যন্ত ভক্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হয়, সংযত সাধু ব্যক্তিকে সেই আহার দান করা কর্ত্তব্য। ‡

শরীর সুস্থ থাকিলেই তপঃ ধ্যান প্রভৃতি সম্ভব, এই নিমিত্ত রোগ শান্তির জন্য সাধু ব্যক্তি-দিগকে ঔষধ দান করা উচিত। ** এইরূপে এই চারি প্রকার দানের মাহাত্ম্যই জৈন শাস্ত্রে কীর্ত্তিত হইয়াছে।

শ্রাবকগণ যথাশক্তি এই সকল দানকার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলে সমাজে কাহারও কোন কষ্ট থাকিতে পারে না—মুনিগণ নিশ্চিন্ত মনে তপশ্চর্য্যাদি কার্য্য করিতে পারেন; তাঁহাদের যদি কোনও অভাব অভিযোগ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে আর কিছুর জন্য না হউক, অন্ততঃ পুণ্যার্জ্জনের জন্যও শ্রাবক তাহা দূর করিতে পারে। বস্তুতঃ জৈনদিগের এই ষট্‌কর্ম্ম একদিকে যেমন অনুষ্ঠাতার ধর্ম্মোন্নতির কারণ হইয়া থাকে, অন্য দিকে সেইরূপ যাঁহারা ধর্ম্মার্জ্জনের জন্য প্রাণ পণ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের যাহাতে কোন বিঘ্ন না হয়, বরং তাঁহারা যাহাতে সুখে ও নিশ্চিন্তভাবে ধর্ম্মার্জ্জন করিয়া নিজের এবং অপরের উন্নতির বিষয়ে সহায়তা করিতে পারেন, সে কার্য্যে শ্রাবককে প্রবৃত্ত করাইয়া সমাজের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়া থাকে।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী

---

* সুভাষিতরত্নসন্দোহ—৪৭৬।
† ঐ— ঐ। —৪৭৭।
‡ ঐ — ঐ। —৪৭৮।
** ঐ — ঐ —৪৭৯।

বৈষ্ণব-সাহিত্যে সামাজিক ইতিহাসের উপকরণ

[৩১শ ভাগ, ৩য় সংখ্যায় প্রকাশিতের পর]

দীক্ষাগ্রহণ

আজকাল কি শাক্ত, কি বৈষ্ণব, সকলেরই মধ্যে বংশগত গুরুকরণ প্রথা দেখিতে পাওয়া যায়। গুরুকরণে যোগ্যগুরুর অনুসন্ধান শিষ্য করেন না। গুরু, শিষ্য দীক্ষাগ্রহণের উপযুক্ত কি না, দেখেন না। গুরুর পুত্রই গুরু হইবেন এবং প্রত্যেক হিন্দুকেই দীক্ষা লইতে হইবে, এই মতের সৃষ্টি কি করিয়া হইল, বলা যায় না। তন্ত্রে যোগ্য গুরুর ও যোগ্য শিষ্য অনুসন্ধানের ব্যবস্থা আছে। শ্রীহরিভক্তিবিলাসে লিখিত আছে,—

"পরিচর্য্যা-যশোলাভলিপ্সুঃ শিষ্যাদ্‌গুরুর্নহি।"

শ্রীজীব টীকায় "লাভো ধনাদিঃ শিষ্যাৎ" এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। গুরুও দীক্ষাগ্রহণেচ্ছুর সহিত এক বৎসর এক সঙ্গে বাস করিয়া, তাঁহাকে উপযুক্ত দেখিলে তবে দীক্ষা দিবেন, এই বিধি আছে।

"তয়োর্বৎসরবাসেন জ্ঞাত্বান্যোন্যস্বভাবয়োঃ।
গুরুতা শিষ্যতা চেতি নান্যথৈবেতি নিশ্চয়ঃ॥"

এই সমস্ত উৎকৃষ্ট বিধি থাকা সত্ত্বেও যে বংশানুক্রমিক গুরুকরণ প্রথার কি করিয়া সৃষ্টি হইল, তাহা অনুসন্ধেয়।

হিন্দুমুসলমানের সম্বন্ধ

বৈষ্ণব-সাহিত্যের প্রায় প্রারম্ভ হইতেই অর্থাৎ জয়দেবের কিছু কাল পরেই মুসলমানগণ বঙ্গদেশে আগমন করেন। খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দী হইতে ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত বঙ্গদেশ পাঠানগণের অধিকারভুক্ত ছিল। ঐ সময়ের মধ্যেই বৈষ্ণব-সাহিত্যের প্রধান প্রধান গ্রন্থগুলি রচিত হয়। তৎকালীন বৈষ্ণব-সাহিত্যে দেশে সুশাসনের পরিচয় পাওয়া যায় না। মোগল অধিকারের সময়ে রচিত কর্ণানন্দ, ভক্তিরত্নাকর, প্রেমবিলাস, নরোত্তমবিলাস, কৃষ্ণদাস-(লালদাস নামান্তর) কৃত ভক্তমালের অনুবাদ প্রভৃতি গ্রন্থে অন্যান্য প্রাচীন গ্রন্থ অপেক্ষা মুসলমান-গণের পরিচয় অধিক পাওয়া যায় এবং ঐ সমস্ত গ্রন্থে অনেক স্থলেই হিন্দুমুসলমানের প্রীতি-বন্ধনের চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা হইতে অনুমান হয় যে, মোগল বাদশাহগণ ও মুর্শীদ কুলি খাঁ প্রভৃতি বঙ্গীয় নবাবগণ হিন্দুগণের উপর অপেক্ষাকৃত কম অত্যাচার করিতেন। বহুকাল এক সঙ্গে বসবাস করিবার ফলে উভয় জাতির মধ্যে বহু ভাবের আদান-প্রদান হইয়াছিল ও তাহারা পরস্পরকে শ্রদ্ধা করিতে শিখিয়াছিল। আকবরের উদার শাসননীতির ফলেও হিন্দুমুসলমানের

সদ্ভাব বর্দ্ধিত হইয়াছিল। এ সব কথার সাক্ষ্য ইতিহাসও দিয়া থাকে। আমার কিন্তু বৈষ্ণব-সাহিত্য আলোচনা করিয়া হিন্দুমুসলমানের সদ্ভাব বৃদ্ধির অপর একটি কারণ মনে হইয়াছে। পরে দেখাইব যে, মহাপ্রভু বহু মুসলমানকে বৈষ্ণব করিয়াছিলেন। আকবর বাদশাহের শ্রীরূপ-সনাতনকে দর্শন করিতে আসিবার প্রবাদও প্রচলিত আছে। তাঁহার রচিত একটি পদও আবিষ্কৃত হইয়াছে। বহু শতাব্দীর শত অত্যাচারের পরিবর্ত্তে যে জাতির মহাপুরুষ অত্যাচারি-গণকে সাদর আলিঙ্গন দিয়া প্রেমদান করিলেন, সে জাতির মহত্ব দেখিয়া মুসলমানগণের পক্ষে অত্যাচারের মাত্রা হ্রাস করা বিস্ময়ের বিষয় নহে। মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম্ম প্রচারের ফলে হিন্দু-মুসলমানের সদ্ভাব স্থাপিত হইয়াছিল, ইহাই আমার বিশ্বাস।

পাঠান শাসনকালে রাজনৈতিক অবস্থা

পাঠান শাসনকালে বঙ্গদেশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যখণ্ডে বিভক্ত ছিল এবং প্রত্যেকটি খণ্ডই বিভিন্ন নীতিতে শাসিত হইত। বঙ্গের সুলতান প্রবলপরাক্রান্ত হইলে ঐ সমস্ত খণ্ড হইতে কর গ্রহণ করিতে পারিতেন। সুলতান প্রবলই হউন, দুর্ব্বলই হউন, দেশে যে সামন্ত-শাসনপ্রণালী ছিল, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। মহাপ্রভুর ভ্রমণকাহিনী হইতে জানা যায় যে, প্রতাপরুদ্রের রাজ্যের পরই এক মুসলমানের অধিকার ছিল।

> মদ্যপ যবনরাজের আগে অধিকার।
> তার ভয়ে কেহ পথে নারে চলিবার॥
> পিচ্ছলদা পর্য্যন্ত সব তার অধিকার।
> তার ভয়ে নদী কেহ হৈতে নারে পার॥ — চৈঃ চঃ।

ফেরিস্তাবর্ণিত বিবরণ পাঠে আমাদের অনুমান সত্য বলিয়াই বোধ হয়। ফেরিস্তা লিখিয়াছে যে, শের শাহ্ বঙ্গরাজ্যকে কতকগুলি সমক্ষমতাপন্ন সামন্তের মধ্যে ভাগ করিয়া দিয়া কাফি ফজিলেতকে সমগ্র রাজ্যের পরিদর্শক নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

উড়িষ্যার অধিপতি প্রতাপরুদ্র (১৪৯৭—১৫৪০) এ সময়ে অত্যন্ত পরাক্রমশালী হইয়া উঠিয়াছেন। "He subjected to his dominion the whole country as far as Setubandha Rameswar" (Andrew Sterling, T. R. A. A., 1831)

জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে তাঁহার বঙ্গ আক্রমণের অভিসন্ধির বিবরণ লিখিত আছে, তাহা পাঠে তৎকালীন বঙ্গাধিপের (হুসেন সাহ্ অথবা নসরৎ সাহ্) পরাক্রমেরও পরিচয় পাওয়া যায়।

> এই মত আছেন বৎসর দুই চারি।
> গৌড়ে উৎকলে তবে পড়িল যে ধাড়ী॥
> প্রতাপরুদ্র গৌড় জিনিতে করে আশ।
> শুনিয়া গৌড়েন্দ্র তারে করেন উপহাস॥

চৈতন্যদেবে রাজা আজ্ঞা মাগিল।
প্রভু বলেন প্রতাপরুদ্র কুবুদ্ধি লাগিল॥
কালযবন রাজা পঞ্চ গৌড়েশ্বর।
সিংহ শার্দ্দূল দেখে কতক অন্তর॥
ওড়্ দেশ উচ্ছন্ন করিবেক যবনে।
জগন্নাথ নীলাচল ছাড়িবে এত দিনে॥
লজ্জা পাবে প্রতাপরুদ্র আমার বাক্য ধর।
গৌড়মুখে শয়ন ভজন পাছে কর॥
কাঞ্চীদেশ জিনি কর নানা রাজ্য।
গৌড় জিনিবে হেন না দেখি সে কার্য্য॥
গৌড়েশ্বর অবশ্য আসিব নীলাচলে।
তুমি ছাড়িবে প্রলয় হইব উৎকলে॥
প্রভু নিবারিল সে শুনিয়া প্রতাপরুদ্র।
বিজয়ানগরে গেল করিবারে যুদ্ধ॥—জয়ানন্দকৃত চৈতন্যমঙ্গল।

রামানন্দ রায়কৃত শ্রীজগন্নাথবল্লভ নাটকে শ্রীপ্রতাপরুদ্রের প্রভাবের পরিচয় আছে,—

যন্নামাপি নিশম্য সন্নিবিশতে সেকন্দরঃ কন্দরং
স্বং বর্গং কলবর্গভূমিতিলকঃ সাস্রং সমুদ্বীক্ষতে।
মেনে গুর্জ্জরভূপতির্জ্জরদিবারণ্যং নিজং পত্তনং
বাতব্যগ্রপয়োধিপোতগমিব স্বং বেদ গৌড়েশ্বরঃ॥—১ম অঃ ১০

হুসেন সাহ্‌ কিন্তু উৎকল আক্রমণ করিয়াছিলেন,—

যে হুসেন সাহা সর্ব্ব উড়িয়ার দেশ।
দেবমূর্ত্তি ভাঙ্গিলেক দেউল বিশেষ॥—চৈঃ চঃ।

বনবিষ্ণুপুর, মল্লবংশীয় রাজপুতগণের অধীনে মুসলমানগণের নিকট হইতে স্বাধীনতা রক্ষা করিতেছিল। জনৈক ফরাসী পরিব্রাজক বলিয়াছেন, এরূপ সুশাসিত দেশ ভূমণ্ডলে নাই। রাজাদিগের বড় বড় কামান ছিল এবং এরূপ বন্দোবস্ত ছিল যে, শত্রু আসিলে তাঁহারা দেশ জলে প্লাবিত করিতে পারিতেন। এই বংশীয় বীর হাম্বীর শ্রীনিবাস আচার্য্যের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন।

বৈষ্ণব-সাহিত্যে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হিন্দু রাজা ও হিন্দু শাসনকর্ত্তার পরিচয় পাওয়া যায়।

সপ্তগ্রাম মুলুকের সেই ত চৌধুরী॥
হিরণ্যদাস মুলুক নিল মোক্তা করিয়া।
তার অধিকার গেল মরে সে দেখিয়া॥

বার লক্ষ দেয় রাজার সাধে বিশ লক্ষ।
সে তুড়ুক কিছু না পাঞা হৈল প্রতিপক্ষ॥

রঘুনাথদাসের প্রতি তাহার উক্তি—

তোমার জ্যাঠা নির্ব্বুদ্ধি অষ্ট লক্ষ খায়।
আমি ভাগী আমারে কিছু দিবারে যুয়ায়॥—চৈঃ চঃ।

গোপীনাথ পট্টনায়ক হিরণ্যদাসের ন্যায় আর একজন হিন্দু শাসনকর্ত্তা ছিলেন বলিয়া চরিতামৃতে উল্লেখ আছে। নরোত্তমবিলাস হইতে জানা যায় যে, ঠাকুর মহাশয়ের পিতা শ্রীকৃষ্ণানন্দ দত্ত খেতুরীর রাজা ছিলেন। বেনাপোলের রামচন্দ্র খানও যশোহর বিভাগের কিয়দংশের শাসনাধিকারী ছিলেন, ইহা শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে জানা যায়। "অদ্বৈতপ্রকাশে" লিখিত আছে, শ্রীহট্ট জেলার—

লাউড়েতে নবগ্রামে ছিল তাঁর বাস।
দিব্যসিংহ রাজার তাঁহা রাজত্ববিলাস॥

এই সমস্ত রাজা মুসলমান অধিপতিকে কর দিতেন। কর যথাসময়ে না দিতে পারিলে তাঁহাদের কিরূপ শাস্তি হইত, তাহা চরিতামৃতে বর্ণিত গোপীনাথ পট্টনায়কের দুর্দ্দশা হইতে বুঝা যায়।

এক দিন লোক আসি প্রভুরে নিবেদিল।
গোপীনাথে বড় জানা চাঙ্গে চড়াইল॥
তলে খড়্গা পাতি তার উপরে ডারিবে।
প্রভু রক্ষা করেন যবে তবে নিস্তারিবে॥—চৈঃ চঃ।
দুই লক্ষ কাহন তার ঠাঁই বাকী হৈল।
দুই লক্ষ কাহন কৌড়ি রাজা ত মাগিল॥—চৈঃ চঃ।

অবশ্য পট্টনায়ক প্রতাপরুদ্রের দ্বারা নির্য্যাতিত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার নির্য্যাতনপ্রথা মুসলমানগণের প্রথা হইতে ভিন্ন ছিল না। প্রেমবিলাসে বর্ণিত আছে যে, নবাব বিদ্রোহী চান্দ রায়কে ধরিয়া হাতী দিয়া মারিতে গিয়াছিলেন।

মাতোয়াল করি হাতী আনহ সাক্ষাতে।
বসিলা অনেক লোক মরণ দেখিতে॥—প্রেঃ বিঃ।

করপ্রদানকারী এই সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজার শাসন দেখিয়া মনে হয় যে, পাঠান রাজগণ দেশের আভ্যন্তরীন রাজকার্য্য নিজেরা না করিয়া হিন্দুগণের উপর ভার দিতেন। বাঙ্গালার ইতিহাস-প্রণেতা Stewart সাহেব বলিয়াছেন,—"The Government of the Afghans in Bengal cannot be said to have been monarchical, but nearly resembled the feudal system introduced by the Goths and Vandals into Europe. It is possible that many of the Afghan officers, averse to business, or frequently called away from their homes to attend their chiefs, farmed

out their estates to the opulent Hindus, who were also permitted to retain the advantages of manufacture and commerce." জন-প্রবাদের উপর ভিত্তি করিয়া রচিত বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাসেও (দুর্গাচন্দ্র সান্ন্যাল) এইরূপ কথা আছে। "বাঙ্গালাদেশ মুসলমানদিগের অধিকৃত হইলেও দেশের অভ্যন্তরে হিন্দুরাজত্ব চলিতেছিল।"

রাজদ্রোহ ও দস্যুভয়

এইরূপ করপ্রদানকারী রাজাদিগের মধ্যে কেহ কেহ আবার কর প্রদান না করিয়া বিদ্রোহ ঘোষণা করিতেন। প্রেমবিলাসে রাজমহলের জমীদার চান্দ রায়ের কাহিনী নিম্নলিখিত ভাবে আছে,—

মহাবীর শক্তি ধরে যুদ্ধ পরাক্রমে।
শুনিয়া তাহার নাম কাঁপয়ে জীবনে॥
চৌরাশি হাজার মুদ্রার ছিল জমীদার।
তার কথো দিনে হৈল এমন প্রকার॥
গড়িদ্বারে গেল তাহা ফৌজদার হয়।
রাজমহল থানা করি আমল করয়॥
বলবান্ দেখি সেই বিচারিল মনে।
না দেয় পাতসার কর থানা দেয় গ্রামে॥
পাঁচ সহস্র অশ্ব রাখে থানা দেয় গ্রামে।
কত দেশ মারি নিল করি অস্ত্রবল॥

চাঁদরায় স্বাধীন হইয়া রাজ্যস্থাপনের চেষ্টা করেন নাই,—দস্যুবৃত্তি করিয়া দেশের উৎপীড়ন করিয়াছিলেন মাত্র। তৎকালে দস্যুদলে ভদ্র ব্রাহ্মণ-সন্তানগণও যোগদান করিয়াছিলেন।

গোবিন্দ ব্যাড়ুয্যা আর ললিত ঘোষাল।
কালিদাস ভট্ট দস্যু অতি দুরাচার॥
নীলমণি মুখটি আর রামজয় চক্রবর্ত্তী।
হরিনাথ গাঙ্গুলী আর শিব চক্রবর্ত্তী॥
পূর্ব্বে তারা চান্দ রায়ের সৈন্য যে আছিল।
চাঁদরায়ের সনে বহু দস্যুবৃত্তি কৈল॥—প্রেঃ বিঃ।

পাঠান অধিকারকালে দেশমধ্যে যে শান্তি ছিল না, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ উল্লিখিত ঘটনাগুলি হইতে পাওয়া যায়। জগাই মাধাই—

মাধাই করিয়া মদ্য গোমাংস ভক্ষণ।
ডাকাচুরি পরগৃহ দহে সর্ব্বক্ষণ॥
দেয়ানে নাহিক দেখা বোলায় কোটাল।
মদ্যপান বিনা আর নাহি যায় কাল॥—চৈঃ ভাঃ।

জলাপন্থের জমিদার হরিশচন্দ্র রায়।
রাজদ্রোহী দস্যুবৃত্তি করেন সদায় ॥—প্রেমবিলাস।

বৈষ্ণব-সাহিত্যের বহু স্থলেই দস্যুর উৎপাতের কথা লিখিত আছে। অনেক দস্যু তান্ত্রিক আচারী ছিল।

ভাল করি আজি সভে মদ্য মাংস দিয়া।
চল সবে এক ঠাঞি চণ্ডী পূজি গিয়া ॥—চৈঃ ভাঃ।

বহু দূরে গমন করিতে হইলে তখন লোকে জলপথে যাইত। জলদস্যুরও অভাব ছিল না—

জলদস্যুভয়ে সেই যবন চলিল।
দশ নৌকা ভরি বহু সৈন্য সঙ্গে নৈল ॥—চৈঃ চঃ।

দেশের যখন এরূপ অবস্থা, তখন যে পথঘাট ভীতিসঙ্কুল হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি ?

পথে প্রভু হইয়াছে বিষম সময়।
সে দেশে এ দেশে কেহ পথ নাহি বয় ॥
রাজারা ত্রিশূল পুঁতিয়াছে স্থানে স্থানে।
পথিক পাইলে "জাও" বলি লয় প্রাণে ॥—চৈঃ চঃ।

মুসলমানগণের হিন্দুসমাজের উপর অত্যাচার

মুসলমানগণ হিন্দুধর্ম্মের উপর অত্যাচার করিয়া লোককে জোর করিয়া মুসলমান করিতে চাহিয়াছিলেন। জয়ানন্দের চৈতন্য-মঙ্গলে লিখিত আছে যে, মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব্বে,—

আচম্বিতে নবদ্বীপে হৈল রাজভয়।
ব্রাহ্মণ ধরিঞা রাজা জাতি প্রাণ লয় ॥
নবদ্বীপে শঙ্খধ্বনি শুনে জার ঘরে।
ধন প্রাণ লয় তার জাতি নাশ করে ॥
কপালে তিলক দেখে যজ্ঞসূত্র কান্ধে।
ঘর দ্বার লোটে তার লৌহপাশে বান্ধে ॥
দেউল দেহরা ভাঙ্গে উপাড়ে তুলসী।
প্রাণভয়ে স্থির নহে নবদ্বীপবাসী ॥
গঙ্গাস্নান বিরোধিল হাট ঘাট যত।
অশ্বত্থ পনস বৃক্ষ কাটে শত শত ॥

ঈশান নাগরের অদ্বৈতপ্রকাশে লিখিত আছে,—

একদিন হরিদাস কহে প্রভু স্থানে।
নিত্য ধর্ম্ম নষ্ট করে দুষ্ট ম্লেচ্ছগণে ॥

দেবতা প্রতিমা ভাঙ্গি করে খণ্ড খণ্ড।
দেবপূজার দ্রব্য সব করে লণ্ডভণ্ড॥
শ্রীমদ্ভাগবত আদি ধর্ম্মশাস্ত্রগণে।
বল করি পোড়াইয়া ফেলয়ে আগুনে॥
ব্রাহ্মণের শঙ্খঘণ্টা কাড়ি লঞা যায়।
অঙ্গের তিলক মুদ্রা বলে চাটি খায়॥
শ্রীতুলসী বৃক্ষে মুতে কুকরের সমে।
দেবগৃহে মলত্যাগ করে হৃষ্ট মনে॥
পূজায় বসিলে দেয় কুলকুচা জল।
সাধুরে তাড়ন করে বলিয়া পাগল॥
হেন মতে কত শত দুষ্ট ব্যবহারে।
সর্ব্ব ধর্ম্ম কর্ম্ম তারা সব নষ্ট করে॥

সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য এই অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়া উড়িষ্যায় চলিয়া গিয়াছিলেন। বৈষ্ণব-ধর্ম্মের অভ্যুত্থানকালে মুসলমানগণ যে প্রবল বাধা প্রদান করিয়াছিল, তাহার পরিচয় আমরা শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে পাই। কিন্তু নবোদিত ধর্ম্মকে বাধা দিতে যাওয়া সকল সময়ে নিরাপদ্ নহে। শ্রীচৈতন্যভাগবতে কাজীদলনের বৃত্তান্ত পড়িয়া মনে হয় যে, মহাপ্রভু মুসলমান অত্যাচারে ত্যক্ত-বিরক্ত হইয়া, দলবল সহ মশাল হাতে করিয়া কাজীকে শাস্তি দিতে গমন করিয়াছিলেন।

কেহো ঘর ভাঙ্গে কেহ ভাঙ্গয়ে দুয়ার।
কেহো লাথি মারে কেহো করয়ে হুঙ্কার॥
ভাঙ্গিলেন সব যত বাহিরের ঘর।
প্রভু বোলে "অগ্নি দেহ বাড়ীর ভিতর॥"

মহাপ্রভুকে দেখিয়া কাজি যে ভক্তিগদ্‌গদচিত্তে আসিয়া স্তুতিমিনতি করেন, এ কথা পরবর্ত্তী ইতিহাস-লেখক শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ কল্পনা করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যভাগবতে মহাপ্রভুকে হিন্দু বিদ্রোহিগণের নেতৃরূপেই বর্ণনা করা হইয়াছে।

মুসলমান ভক্ত

যাহা হউক, সন্ন্যাস গ্রহণের পর মহাপ্রভু জাতিনির্ব্বিশেষে হিন্দু মুসলমানকে প্রেম দান করিয়াছিলেন। বহু মুসলমান তাঁহার কৃপা পাইয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন। বাদশাহ্ হুসেন শাহ্ পর্য্যন্ত তাঁহার চরিত্রগুণে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যলীলার অষ্টাদশ পরিচ্ছেদে অনেকগুলি মুসলমান উদ্ধারের কথা লিখিত আছে।

তা সভারে কৃপা করি প্রভু ত চলিলা।
সেই ত পাঠান সব বৈরাগী হইলা॥—চৈঃ চঃ।

পরবর্ত্তী কালে অনেক মুসলমান মহাত্মা মহাপ্রভুপ্রচারিত প্রেমধর্ম্মের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া বৈষ্ণব ধর্ম্ম আলোচনা করেন। পদ্মাবৎকাব্যের রচয়িতা সুপ্রসিদ্ধ আলওয়াল, করম আলি, সৈয়দ মর্ত্তুজা প্রভৃতি বহু মুসলমান কবি বৈষ্ণবপদাবলী লিখিয়াছেন। এতদ্দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মহাপ্রভুর সার্ব্বজনীন প্রেমধর্ম্ম প্রচারের পর হিন্দুমুসলমানের মধ্যে অনেকটা প্রীতির ভাব স্থাপিত হইয়াছিল।

হিন্দুমুসলমানের প্রীতি-সম্বন্ধ

রাজ্যশাসন-ব্যাপারে মুসলমানগণ হিন্দুদিগের নিকট হইতে যথেষ্ট সাহায্য গ্রহণ করিতেন। রূপ-সনাতন হুসেন শাহের মন্ত্রী ও কেশব ছত্রী একজন প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন। সনাতনের উপর পাতশাহের কতটা নির্ভর ছিল, তাহা চরিতামৃত হইতে জানা যায়।—

আমার যে কিছু কার্য্য সব তোমা লঞা।
কার্য্য ছাড়ি ঘরে তুমি রহিলা বসিঞা॥

মুসলমানগণ হিসাবনিকাশে পটু ছিলেন না বলিয়া হিন্দুগণের সাহায্য লইতেন। যদুনন্দন দাসের কর্ণানন্দে মজুমদার, শিকদার প্রভৃতি উপাধিধারী ব্যক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। ঐ সমস্ত উপাধি হিন্দুগণের মুসলমান রাজসরকারের কর্ম্মসূচক। এক একটি বিভাগে মুসলমান আমিন সর্ব্বপ্রধান ছিলেন। তাঁহার অধীনে একটি জেলার ভারপ্রাপ্ত হিন্দু মজুমদার ও একটি মহকুমার ভারপ্রাপ্ত হিন্দু শিকদার থাকিতেন। অনেক ব্রাহ্মণের খাঁ উপাধি ছিল—যথা সুবুদ্ধি খাঁ, সত্যরাজ খাঁ প্রভৃতি। মুসলমানগণ কবিরাজী মতেও চিকিৎসিত হইতেন। মুকুন্দ গুপ্ত রাজ-কবিরাজ ছিলেন।

একদিন ম্লেচ্ছ রাজার উচ্চ টঙ্গিতে।
চিকিৎসার বাত কহে তাহার অগ্রেতে॥—চৈঃ চঃ।

আজকাল যেমন আমরা ইংরাজী বেশ পরিধান করিতেছি, সেইরূপ মুসলমান আমলে অনেকে মুসলমান বেশ পরিতেন।

ব্রাহ্মণে রাখিবে দাড়ি পারস্য পড়িবে।
মোজা পাএ পড়ি হাতে কামান ধরিবে॥—জয়ানন্দ।

মহাপ্রভুর পরে যে হিন্দুমুসলমানের সদ্ভাব স্থাপিত হইয়াছিল, তাহার আর একটি প্রমাণ আমরা একখানি প্রাচীন বৈষ্ণব দলিল হইতে পাই। মুর্শীদ কুলি খাঁর সময়ে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে স্বকীয়া ও পরকীয়া-তত্ত্ব লইয়া বহু তর্ক হয়। এই তর্কের নিরাকরণ উদ্দেশ্যে ১৭৩২ খৃষ্টাব্দে বৈষ্ণবগণ বিচার করা স্থির করিলেন। "বিচার মানিলাম, তাহা পাতশাই শুভা শ্রীযুক্ত নবাব জাফর খাঁ সাহেব নিকট দরখাস্ত হইল। তিঁহো কহিলেন, ধর্ম্মাধর্ম্ম বিন তজবিজে হয় না, অতএব বিচার কবুল করিলেন।" জয়পত্রে মুর্শীদ কুলি খাঁর সহি ও মোহর আছে।

কোন বৈষ্ণব সাহিত্যিক মুসলমানগণের নিকট সাহায্য বা উৎসাহ না পাইলেও সাধারণতঃ বিদ্যোৎসাহী মুসলমান সম্রাটেরা বাঙ্গালা ভাষার সাহিত্যিকগণকে অর্থ-সাহায্যে উৎসাহিত করিতেন।

কবি বিদ্যাপতি নাশির শাহার কাছে কোন সাহায্য পাইয়াছিলেন কি না, জানা যায় না। তবে তাঁহার একটি পদের ভণিতায় আছে,—

সে যে নাসিরা সাহ জানে
যারে হানিল মদন-বাণে।
চিরঞ্জীব রহু পঞ্চ গৌড়েশ্বর
কবি বিদ্যাপতি ভাণে॥

আর্থনৈতিক অবস্থা

বৈষ্ণব-সাহিত্যে মহোৎসবের ভূরি বর্ণনা দেখিয়া মনে হয় যে, সে সময়ে দেশের লোকের বিশেষ অর্থকষ্ট ছিল না। মুদ্রার প্রচলন থাকিলেও কড়ি দ্বারা কর প্রদান ও ক্রয়বিক্রয় হইত। সনাতন গোস্বামী বহু স্বর্ণমুদ্রা উৎকোচ দিয়া বাদশাহের নিকট হইতে পলায়ন করিয়াছিলেন। তিন মুদ্রায় ভোট-কম্বল পাওয়া যাইত। মহাপ্রভুকে খুব পরিপাটী করিয়া খাওয়াইবার জন্য চারি আনার অধিক লাগিত না। আট কড়িতেই খাজা ও সন্দেশ পাওয়া যাইত।

রঘুনাথদাস—মাসে দুই দিন কৈল প্রভুর নিমন্ত্রণ।
দুই নিমন্ত্রণ লাগি কৌড়ি অষ্টপণ॥—চৈঃ চঃ।

ভক্তমালের শ্রীনরসীভক্ত-চরিত্রের নিম্নলিখিত বর্ণনা পড়িলে বুঝা যায় যে, তৎকালে দেশে এক প্রকার banking system ছিল।

এক যে বৈষ্ণব যান দ্বারকা দর্শনে।
হুণ্ডি করিবারে গেলা মহাজন স্থানে॥
হুণ্ডি নাহি দিল কহে বিদ্রূপ করিয়া।
নরসী ভকত স্থানে হুণ্ডি লহ গিয়া॥
উদার বৈষ্ণব তাহা সত্য করি মানে।
ছুটিতে ছুটিতে গেলা বৈষ্ণবের স্থানে॥
তাহারে কহেন এক শত টাকা লহ।
দ্বারকা মোকামে মোরে হুণ্ডি লিখি দেহ॥
তেঁহো কহে ভাল ভাল শত টাকা দেহ।
হাজার টাকার হুণ্ডি লিখি দেহ লহ॥
হুণ্ডি লিখি দিলেন শ্যামল সাহার নামে।
কহে সে তুথর বড় দ্বারকার ধামে॥
যার হুণ্ডি চলে সর্ব্বদেশ বেয়াপিয়া।
যাবামাত্র টাকা পাবে হুণ্ডি সমর্পিয়া॥

দেশে দুর্ভিক্ষ মাঝে মাঝে হইত। রেল ষ্টীমার না থাকায় লোক দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত দেশ ত্যাগ করিত। 'জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে' পাঠে জানা যায় যে, শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব্বে শ্রীহট্টে ভীষণ দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল এবং বহু ব্যক্তি শ্রীহট্ট ত্যাগ করিয়া পশ্চিমবঙ্গে আসিয়া বাস করিতে আরম্ভ করেন।

শিক্ষা প্রণালী

পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে যে, খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে বঙ্গদেশ প্রকৃতই সারস্বত কুঞ্জে পরিণত হইয়াছিল। উচ্চ শিক্ষার যথেষ্ট বিস্তার এই যুগে সাধিত হইয়াছিল। নবদ্বীপ সেই উচ্চ-শিক্ষার কেন্দ্রস্থল ছিল। ছাত্রগণ গুরুগৃহে আসিয়া অধ্যয়ন করিতেন। গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী সম্বন্ধে লিখিত আছে,—

বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ তিঁহো পণ্ডিত প্রধান।
পাঁচ শত পড়ুয়ায় নিত্য অন্ন কৈল দান॥

নবদ্বীপে বহুতর ছাত্রের সমাগম হওয়ায় প্রত্যেক পণ্ডিতেরই অনেকগুলি করিয়া ছাত্র হইয়াছিল—সুতরাং নবদ্বীপের পণ্ডিতগণের পক্ষে সকল ছাত্রকে অন্নদান করা অতি দুঃসাধ্য ব্যাপার ছিল।

ছাত্রগণ ব্যাকরণ পড়িয়া পাঠ আরম্ভ করিত। কলাপ ব্যাকরণই সমধিক আদৃত ছিল। নিম্নে তৎকালের দুইটি পাঠ্য-তালিকা প্রদত্ত হইল।

সুবন্ত দশনাকার পড়িল ষট্‌কারক।
সটীক কলাপ পড়ে সভার ব্যাপক॥
নবদ্বীপের ভিতর পণ্ডিত গঙ্গাদাস।
তাহার মন্দিরে কৈল বিদ্যার প্রকাশ॥
চন্দ্র সারস্বত নব কাব্য নাটকে।
স্মৃতি তর্ক সাহিত্য পড়িল একে একে॥—জয়ানন্দ।
শ্রুতিধর প্রভু পড়ে কলাপ ব্যাকরণ।
দৃষ্টিমাত্র শিখে সূত্র অর্থ বিবরণ॥
শ্রীঅদ্বৈত পড়ে তবে সাহিত্যাভিধান
অলঙ্কার জ্যোতিষাদি কৈল সমাধান॥—অঃ প্রঃ।

দর্শনশাস্ত্রের আলোচনাও তৎকালে যথেষ্ট হইত—

ন্যায় সাংখ্য পাতঞ্জল মীমাংসা দর্শন।
বৈশেষিক বেদান্তে নিপুণ যত জন॥—চৈঃ ভাঃ।

ছাত্র-জীবন

সে সময়ে ছাত্রগণ স্নান করিতে যাইয়াও পাঠ্য বিষয়ের তর্ক ও আলোচনা করিত। বিদ্যার্থী ছাত্রগণের এই বিদ্যাকৌতুকলীলা শ্রীবৃন্দাবনদাস অতি সুন্দরভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। অধীত বিদ্যার তর্ক হইতে পরস্পরের অধ্যাপকের বিদ্যা লইয়াও কলহ হইত।

কেহো বোলে "তোর গুরু, কোন্ বুদ্ধি তার।"
কেহো বোলে "বোল এই আমি শিষ্য যাঁর॥"—চৈঃ ভাঃ।

বিদ্যা প্রচার

Renaissance যুগের Florenceএর ন্যায় নবদ্বীপ বিদ্যার কেন্দ্রস্থল হইলেও, নবদ্বীপ একা এই সুবিধা ভোগ করে নাই। সমস্ত বঙ্গদেশে নবদ্বীপ বিদ্যা পরিবেষণ করিয়া দিয়াছিল। নদীয়ায় শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতগণ গ্রীসের Sophistগণের ন্যায় বঙ্গদেশের স্থানে স্থানে গমন করিয়া শিক্ষা দিতেন। মহাপ্রভু এইরূপে পদ্মানদীতীরে যাইয়া বিদ্যাদান করিয়া আসিয়াছিলেন,—

মহাবিদ্যাগোষ্ঠী প্রভু করিলেন বঙ্গে।
পদ্মাবতী দেখি প্রভু ভুলিলেন রঙ্গে॥
সহস্র সহস্র শিষ্য হইল তথাই।
হেন নাহি জানি, কে পড়য়ে কার ঠাঁই॥ চৈঃ ভাঃ।

সংস্কৃতবিদ্যা শুধু ব্রাহ্মণগণের মধ্যে নিবদ্ধ ছিল না। কায়স্থ রঘুনাথদাস গোস্বামী স্তবমালা, মুক্তাচরিত ও দানচরিত নামক অত্যুৎকৃষ্ট সংস্কৃত কাব্য লিখিয়া গিয়াছেন। কায়স্থ নরোত্তমদাস ঠাকুর ও রামানন্দ রায় সংস্কৃতবিদ্যায় পণ্ডিত ছিলেন। বৈদ্য শিবানন্দের পুত্র পরমানন্দ কবিকর্ণপূর শ্রীচৈতন্য মহাকাব্য, শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়, আনন্দবৃন্দাবনচম্পূ, অলঙ্কারকৌস্তভ, কৃষ্ণ ও গৌর-গণোদ্দেশদীপিকা ও চৈতন্যশতক সংস্কৃতে রচনা করিয়াছেন। মুরারিগুপ্ত তাঁহার কড়চা সংস্কৃতে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। শ্রীখণ্ডবাসী নরহরি সরকার ঠাকুর সংস্কৃতে গৌরগণার্চ্চন-দীপিকা প্রভৃতি গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন।

উচ্চশিক্ষা সকলে লাভ করিতে না পারিলেও, জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষার অভাব ছিল না। বড় বড় পণ্ডিতে সাধারণের নিকট শাস্ত্র ব্যাখ্যা করিতেন, উপাস্য দেবদেবীগণের লীলা ও স্তুতিবর্ণন-মূলক গান হইত, তাহাতে সকলে শিক্ষালাভ করিত।

এক স্থলে শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা হয়।
অন্য স্থলে চৈতন্যভাগবত চরিতামৃত কয়॥
প্রথমে করয়ে গান চৈতন্যমঙ্গল।
তার পরে হয় গান শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল॥

পরে হয় গোবিন্দের গৌরকৃষ্ণলীলাগান।
নরোত্তমের গানে সবার জুড়ায় মন প্রাণ॥
বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের কৃষ্ণলীলাগানে।
যে শুনে হরয়ে তার মন আর প্রাণে॥

ভাষা ও সাহিত্য

সাধারণের মধ্যে প্রেমধর্ম্মের ব্যাখ্যা প্রচার করিবার জন্য অনেক বৈষ্ণব পণ্ডিত গতানুগতিকতা ত্যাগ করিয়া সংস্কৃত ভাষায় গ্রন্থ না লিখিয়া বাঙ্গালায় গ্রন্থ লিখিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের ন্যায় দার্শনিক গ্রন্থ যে কৃষ্ণদাস কবিরাজ বাঙ্গালায় লিখিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন, ইহা তাঁহার মহত্ত্বেরই অন্যতম নিদর্শন। বৈষ্ণবসাহিত্যিকগণই বাঙ্গালা সাহিত্যকে বিশ্বসাহিত্যে স্থান পাইবার যোগ্যতা প্রদান করেন। জীবনী, দর্শন, গান, ভ্রমণবৃত্তান্ত, মনোবিজ্ঞান, স্মৃতি প্রভৃতি নানা বিভাগে গ্রন্থ লিখিয়া বৈষ্ণবগণ বাঙ্গালা ভাষাকে সমৃদ্ধিসম্পন্না করিয়া তুলিলেন।

বৃন্দাবনে বৈষ্ণবগণের একটি উপনিবেশ বসিয়াছিল। তাই বাঙ্গালা ভাষার মধ্যে "ব্রজবুলির" যথেষ্ট মিশ্রণ দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্ব ও পশ্চিম-বঙ্গে তখনও ভাষার যথেষ্ট প্রভেদ ছিল ঈশানের অদ্বৈত-প্রকাশের ভাষার সহিত চৈতন্যভাগবতের ভাষা মিলাইলেই এ কথা বুঝিতে পারা যাইবে।

সমাজে স্ত্রীজাতির স্থান

মহাপ্রভু তাঁহার উদার প্রেমধর্ম্মে "স্ত্রীশূদ্রদ্বিজবন্ধূনাং ত্রয়ী ন শ্রুতিগোচরা" নীতি অবলম্বন করেন নাই। পুরুষের সহিত ধর্ম্মরাজ্যে স্ত্রীজাতির সমান অধিকার, ইহাই বৈষ্ণবগণ প্রচার করেন। "কর্ণানন্দে" শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর বহু স্ত্রীশিষ্যের পরিচয় আছে। মহাপ্রভুর তিরোভাবের পর নিত্যানন্দ-পত্নী শ্রীজাহ্নবাদেবীর বৈষ্ণব-সমাজে যে প্রভাব দেখা যায়, তাহা হইতে তৎকালীন বঙ্গসমাজে মহিলার স্থান নির্দ্দেশ করা অসঙ্গত হইবে না। এই জাহ্নবাদেবী বঙ্গরমণীকুলের মধ্যে অতি শ্রেষ্ঠ স্থান পাইবার উপযুক্ত। বহু বৎসর ধরিয়া তিনিই বৈষ্ণবসমাজের নেত্রী ছিলেন। ভক্তিরত্নাকর, প্রেমবিলাস ও নরোত্তমবিলাস পাঠে জানা যায় যে, তাঁহার আজ্ঞাতেই খেতুরীর মহোৎসবে সমস্ত কার্য্য নিষ্পন্ন হইত। এই বঙ্গরমণী বৃন্দাবন হইতে বঙ্গের প্রান্তসীমা পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিয়া বৈষ্ণব-ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। তিনি শুধু যে উপদেশিকা হইয়া সেবা ও শ্রদ্ধাঞ্জলিই গ্রহণ করিতেন, তাহা নহে, বঙ্গরমণীর স্বতঃস্ফূর্ত্ত মাতৃভাবপ্রণোদিত সেবাও তাঁহার মধ্যে দেখা যায়,—

সে দিবসে শ্রীজাহ্নবা ঈশ্বরী আপনে।
মনের আনন্দে শীঘ্র চলিলা রন্ধনে॥

রন্ধন-পরিবেষণ করিয়া বহু বার তিনি ভক্তবৃন্দকে পরিতোষ সহকারে আহার করাইয়াছেন;

শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর কন্যা হেমলতা ঠাকুরাণীও মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। বৈষ্ণব-সমাজ তাঁহাকে কিরূপ শ্রদ্ধা ও সম্মানের চক্ষে দেখিত, তাহা আমরা যদুনন্দনদাসের প্রত্যেক অধ্যায়ের পরিসমাপ্তিতে লিখিত নিম্নোদ্ধৃত পয়ার হইতে বুঝিতে পারি।

শ্রীআচার্য্য প্রভুর কন্যা শ্রীল হেমলতা।
প্রেমকল্পবল্লী কিবা নিরমিল ধাতা॥
সেই দুই চরণপদ্ম হৃদয়ে বিলাস।
কর্ণানন্দরস কহে যদুনন্দন দাস॥

হিন্দুরমণীগণ সাধারণতঃ গৃহকোণে তাঁহাদের মাধুর্য্য বিকীর্ণ করিতেন না, মুসলমান মহিলাগণের ন্যায় তাঁহারা পর্দ্দার মধ্যেই আবদ্ধ থাকিতেন না। তাঁহারা সুবিধামত স্বামী বা আত্মীয়ের সহিত তীর্থযাত্রাও করিতেন।

সে বৎসর প্রভু দেখিতে সব ঠাকুরাণী।
চলিলা অদ্বৈত সঙ্গে অচ্যুত-জননী॥
শ্রীবাস পণ্ডিত সঙ্গে চলিলা মালিনী।
শিবানন্দ দাস সঙ্গে তাহার গৃহিণী॥
আচার্য্যরত্ন সঙ্গে চলে তাহার গৃহিণী॥
তাহার প্রেমের কথা কহিতে না জানি॥—চৈঃ চঃ।

মহিলাগণের মধ্যেও যে শিক্ষার প্রচলন ছিল, তাহা আমরা শিখি মাইতির ভগিনী শ্রীমাধবী দেবীর রচিত পদাবলী হইতে জানিতে পারি। সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত পদকল্পতরুর ৭৮৮, ১৮০৪, ২৩৯২ ও ২১৯৩ সংখ্যক পদ তাঁহার লিখিত।

পর্য্যটন

রেলগাড়ী না থাকিলেও লোকে দূরদেশে ভ্রমণ করিত। শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর, অদ্বৈতপ্রকাশে অদ্বৈতপ্রভুর, চরিতামৃতে মহাপ্রভুর এবং ভক্তিরত্নাকরে শ্রীনিবাস ও শ্যামানন্দের বহুদূরব্যাপী পর্য্যটনের কথা লিপিবদ্ধ আছে। সিংহলেও ভ্রমণকারিগণ গমন করিতেন।

আমি করিলাঙ যে পৃথিবী পর্য্যটন।
অযোধ্যা মথুরা মায়া বদরিকাশ্রম॥
গুজরাট কাশী গয়া বিজয়ানগরী।
সিংহল গেলাঙ আমি যত আছে পুরী॥—চৈঃ ভাঃ।

পথে দস্যু-ভয় হেতু পর্য্যটনকারিগণ দলবদ্ধ হইয়া গমনাগমন করিতেন। এইরূপ একটি দল দেখিয়া ভীত হইয়া রাজদূত প্রতাপরুদ্রকে বলিতেছে,—

পরঃ সহস্রাঃ সহসৈব পারে
চিত্রোৎপলং যে মনুজাঃ সমূঢ়াঃ।

কিং তৌর্যিকাস্তে পরচক্রজাঃ কিং
শ্রুতৈব কোলাহলমাগতোঽস্মি।—চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক, ৮অঃ।

সঙ্কীর্ত্তন ও আমোদ-প্রমোদ

(সঙ্কীর্ত্তন দ্বারাই মহাপ্রভু ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছিলেন। সঙ্কীর্ত্তন এ দেশে নূতন নহে—শ্রীমদ্ভাগবতে "কলৌ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ" বাক্য আছে। বৌদ্ধগণের দোঁহাও সঙ্কীর্ত্তনরূপে গীত হইত। কিন্তু মহাপ্রভু সেই সঙ্কীর্ত্তনমধ্যে নব ভাবের উন্মাদনা দিয়া তাহার নব-প্রাণ সৃষ্টি করিলেন। নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় গড়েরহাটী কীর্ত্তনের রাগ-রাগিণী সৃষ্টি করিয়া খেতুরীর মহোৎসবে ঐ সুরে কীর্ত্তন করেন।

কেহো কহে ঐছে গীতবাদ্যাদি না হয়।
না জানিয়ে নরোত্তম কৈছে প্রকাশয়॥
কেহ কহে মহাপ্রভু স্বরূপের মুখে।
শুনিতেন উচ্চ গীত মহাহর্ষ মনে॥
গীত প্রথারক্ষা, ক্ষোভ নিবৃত্তি নিমিত্তে।
প্রচারিতে সম্যক্ বিচার কৈল চিত্তে॥
সে সময় তাহা প্রেমসম্পুটে রাখিল।
নরোত্তমদ্বারে প্রভু এবে উঘারিল॥—ভক্তি-রত্নাকর।

বঙ্গের জনসাধারণ যে কীর্ত্তনরসে মাতোয়ারা হইয়াছিলেন, তাহা আর বিশেষ করিয়া বলিতে হইবে না। পরবর্ত্তী কালে উৎপত্তিস্থানানুসারে মনোহরসাহী, রেণেটী ও মন্দারণ নামে আরও তিনটী কীর্ত্তনশাখা প্রসিদ্ধি লাভ করে। উক্ত প্রকার নামকরণ হইতে বঙ্গদেশে কীর্ত্তনের প্রভাব অনুমান করা যাইতে পারে। শ্রীরাধাকৃষ্ণলীলার সহিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলার সামঞ্জস্য রক্ষা করিবার জন্য কীর্ত্তনারম্ভে গৌরচন্দ্রিকা গীত হইয়া থাকে। শ্রীখণ্ডবাসী শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরই বোধ হয় গৌরচন্দ্রিকার সৃষ্টিকর্ত্তা। পদকর্ত্তা বাসুদেব ঘোষ, সরকার ঠাকুরের নিকট ঋণ স্বীকার করিয়া লিখিয়াছেন,—

শ্রীসরকার ঠাকুরের পদামৃত পানে।
পদ্য প্রকাশিব বলি ইচ্ছা হৈল মনে॥

বৃন্দাবনদাসও অধিবাসের একটি পদে গাহিয়াছেন,—

সংকীর্ত্তনের অধিকারী হইলেন নরহরি
বিলসই শ্রীরঘুনন্দন।—গীতরত্নাবলী।

অনেকের ধারণা, মহাপ্রভু মৃদঙ্গের প্রবর্ত্তক। কিন্তু তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে মৃদঙ্গের উল্লেখ আছে।

লোকে চিত্তবিনোদনের জন্য নাটক অভিনয় করিত। শ্রীচৈতন্যভাগবতে মহাপ্রভুকর্ত্তৃক "রুক্মিণী" নাটক অভিনয়ের কথা আছে। বৈষ্ণব-সাহিত্যে চৈতন্যচন্দ্রোদয়, দানকেলীকৌমুদী, বিদগ্ধমাধব, ললিতমাধব প্রভৃতি নাটক আছে।

লোকে পরম আগ্রহের সহিত মঙ্গলচণ্ডী, বিষহরি, যোগিপাল, মহীপালের গীত গান করিত। উজ্জ্বলনীলমণিতে ধৈর্য্যশালিনী নায়িকার লক্ষণে বানর পোষার কথা দেখা যায়, "হারং হারয়তে হরিপ্রণিহিতং"। পাশাখেলা এ দেশে প্রাচীন কাল হইতেই প্রচলিত ছিল এবং বৈষ্ণব-সাহিত্যে ইহার বর্ণনা আছে।

রাই যব ধরি জিতই লাগল
দশ বা পঞ্চ বলি ডাকই রে।—গোবিন্দদাস।

ফাগুখেলায় খুব আনন্দ হইত,—

কেহ ডম্ফ বাজাইয়া ফিরে কেহ নাচে।
কেহ হস্তে লৈয়া ফাগু ধায় কার পিছে॥—নরোত্তমবিলাস।

চিত্র-শিল্প, স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্য

চিত্রবিদ্যা দেশে সুপ্রচারিত ছিল এবং উচ্চশ্রেণীর নরনারী অঙ্কবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন—

তুয়া অনুরূপ এক পটে লিখিয়া
দেয়ল তাকর আগে।
সো রূপ হেরি মূরছি পড়ু ভূতলে
মানয়ে করম অভাগে॥—যদুনন্দন।

বৃন্দাবনে শ্রীগোবিন্দজীর মন্দির ও তৎকালীন বাঙ্গালার বহু মন্দির দেশের স্থাপত্য-বিদ্যার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। মন্দির ও মূর্ত্তি-শিল্পী সমাজে যথেষ্ট সম্মান পাইতেন। শ্রীহরিভক্তি-বিলাসে আছে,—

ততঃ সপরিবারাংশ্চ শ্রীমূর্ত্ত্যাদিবিধায়িনঃ।
শিল্পিনোঽভ্যর্চ্চ্য বিবিধৈঃ দ্রব্যৈর্বাক্যৈশ্চ তোষয়েৎ॥

পারিবারিক জীবন

সমাজে দশকর্ম্মের প্রভাব অক্ষুণ্ণ ছিল। ছয় মাসের সময় অন্নপ্রশান ও নামকরণ হইত,—

এক দুই তিন করি পাঁচ ছয় মাসে।
নামকরণ হইল অন্নপ্রাশন দিবসে॥
পুত্রমহোৎসব করে মিশ্র পুরন্দর।
অলঙ্কার ভূষিত সোনার কলেবর॥—চৈঃ মঃ।

পাঁচ বৎসরের সময় হাতেখড়ি ও চূড়াকরণ হইত।

পাঁচ বৎসর প্রভুর হইল বয়স।
দিনে দিনে বাঢ়ে প্রভুর প্রেমানন্দ বেশ॥
মিশ্র পুরন্দর দেখি আপন তনয়।
হস্তে খড়ি চূড়াকর্ণের এই ত সময়॥
আগে দিলা হাতে খড়ি পড়িবার তরে।
যাহে চৌষট্টি বিদ্যা জিহ্বা অগ্রে স্ফুরে॥
তবে করি চূড়াকর্ণ সংযোগ আপায়।
নানা বিদ্যাস্থীয় আনি করিতে বিস্তার॥—চৈঃ মঃ।

চূড়াকরণের সময় বেদপাঠ ও যজ্ঞ হইত,—

ব্রাহ্মণেতে বেদ পড়ে গায়নে গায় গীত।
করিল সে যজ্ঞবিধি যে ছিল উচিত॥—চৈঃ মঃ॥

উপবীতকালেও যথেষ্ট ধূমধাম হইত,—

যজ্ঞকর্ম্ম জানে যে জানএ বেদরীত॥
গুবাক চন্দন মালা ব্রাহ্মণেরে দিল।
শত শত কুলবধূ সিন্দূর পড়িল॥—চৈঃ মঃ।

সমাজে বাল্যবিবাহ প্রচলিত ছিল। নরোত্তমের—

বয়ঃক্রম হইল আসি দ্বাদশ বৎসর।
রূপ দেখি পিতামাতার আনন্দ অন্তর॥
বিবাহ লাগি দৈবজ্ঞ বসাইল বিরলে।
বিলম্ব না সহে বিবাহ করাহ সত্বরে॥—প্রেঃ বিঃ।

পঞ্চদশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে মহাপ্রভুর সহিত লক্ষ্মীদেবীর বিবাহ হইয়াছিল এবং নিত্যানন্দ প্রভুর বার বৎসর কালে হাড়াই পণ্ডিত তাঁহার বিবাহ দিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। বহু-বিবাহ সমাজে নিন্দনীয় ছিল না। নিত্যানন্দ বসুধা ও জাহ্নবী নাম্নী দুই ভগিনীকে এক সঙ্গে বিবাহ করেন। শ্রীনিবাস আচার্য্য—

বৈষ্ণবের অনুরোধে বিবাহ করিল।
কত দিন পরে পুন আর বিভা কৈল॥—কর্ণানন্দ।

বিবাহে সামাজিক ভোজনের কথা বৈষ্ণব-সাহিত্যে উল্লেখ নাই।

"অধিবাসে গুয়া আসি খাইবা বিকালে।"

বলিয়া নিমন্ত্রণ হইত এবং নিমন্ত্রিতগণ আগমন করিলে,—

তবে গন্ধ চন্দন তাম্বূল দিব্যমালা।
ব্রাহ্মণগণেরে সবে দিবারে লাগিলা॥

শিরে মালা সর্ব্ব অঙ্গে লেপিয়া চন্দনে।
এক বাটা তাম্বূল দেন একো জনে॥ —চৈঃ ভাঃ।

আধুনিক কালের ন্যায় তখনও বিবাহের মিছিল বাহির হইত,—

সহস্র সহস্র দীপ লাগিল জ্বলিতে।
নানাবিধ বাজি সব লাগিল করিতে॥
আগে যত পদাতিক বুদ্ধিমন্ত খাঁর।
চলেন হইয়া দুই সারি পাটোয়ার॥

বর কন্যার বাটী আসিলে পর নিম্নলিখিত উপায়ে তাঁহাকে বরণ করা হইত,—

হাথেতে উজ্জ্বল দীপ অন্তর উল্লাস॥
আইহগণ আগে পাছে কন্যার জননী।
বর উরখিতে ধনী চলিলা আপুনি॥
সাত প্রদক্ষিণ করি সাত দীপ হাতে।
চরণে ঢালিল দধি হরষিত চিতে॥—চৈঃ মঃ।

শুভদৃষ্টির সময়,—

তবে মধ্যে অন্তঃপট ধরি লোকাচারে।
সপ্ত প্রদক্ষিণ করাইলেন কন্যারে॥—চৈঃ ভাঃ।

ভাটগণ আসিয়া বর ও কন্যাকুলের গুণকীর্ত্তন করিত। যথা,—

ভাটগণে পড়িতে লাগিল রায়বার।—চৈঃ ভাঃ।

বরপণপ্রথা ছিল বলিয়া কোন উল্লেখ নাই। মহাপ্রভুর বিবাহের সময় আজিকালিকার ন্যায় বরের দর-কষাকষি হয় নাই। বরপক্ষ হইতেই কন্যাপক্ষের নিকট প্রস্তাব গিয়াছিল। তবে কন্যাকর্ত্তা যথেষ্ট যৌতুক বরকে প্রদান করিতেন। যথা,—

তবে দিব্য ধন ভূমি শয্যা দাসী দাস।
অনেক যৌতুক দিয়া করিলা উল্লাস॥—চৈঃ ভাঃ।

বাসরে যথেষ্ট আমোদ-প্রমোদ হইত, তাহার বর্ণনা চৈতন্যমঙ্গলে আছে। অনুলোম বা প্রতিলোম বিবাহের কোন উদাহরণ বৈষ্ণব-সাহিত্যে পাওয়া যায় না।

বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী শ্রীশচীমাতাকে যথোচিত সেবা-শুশ্রূষা করিতেন। তৎকালে বধূ ও শাশুড়ীর মধ্যে যে কিরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল, তাহা শ্রীচৈতন্যের গৃহত্যাগের পর এই সেবাপরায়ণা মহিলার কাহিনী হইতে বুঝিতে পারি। অন্যান্য পারিবারিক সম্বন্ধের চিত্র বৈষ্ণব-সাহিত্যে সবিশেষ অঙ্কিত হয় নাই। অতিথিসেবা গৃহস্থের প্রধান কর্ম্ম বলিয়া বিবেচিত হইত। জগন্নাথ মিশ্রের গৃহে জনৈক তৈর্থিক ব্রাহ্মণ অতিথি হইয়াছিলেন। বালক নিমাই তাঁহার আহার্য্য তিন বার নষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন। মিশ্রের আক্ষেপ হইতে আমরা অতিথির প্রতি গৃহস্থের যত্নের পরিমাণ অনুমান করিতে পারি।

দুঃখে বসিলেন মিশ্র হস্ত দিয়া শিরে।
মাথা নাহি তোলে মিশ্র বচন না স্ফুরে॥—চৈঃ ভাঃ।

গ্রাম্য-নিবেশ

প্রত্যেক গ্রামই স্বসম্পূর্ণ ছিল। বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম মাত্রেই যে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য ব্যতীত তন্তুবায়, গোপ, গন্ধবণিক্, মালাকার, তাম্বূলী, শঙ্খবণিক্ ও সর্ব্বজ্ঞ বাস করিত, তাহার প্রমাণ শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে বর্ণিত মহাপ্রভুর নগরভ্রমণ-কাহিনী হইতে জানিতে পারা যায়। প্রত্যেক জাতির জন্য এক একটি পাড়া নির্দ্দিষ্ট ছিল। প্রত্যেক গ্রামেই সর্ব্বজ্ঞ জ্যোতিষী থাকা আমাদের নিকট বিচিত্র বোধ হইতেও পারে, কিন্তু তদানীন্তন হিন্দুসমাজ জ্যোতিষীর মত না লইয়া কোন শুভ-কার্য্যে হাত দিতেন না। চণ্ডীদাসেও আছে, শ্রীকৃষ্ণ—

গ্রহবিপ্রের বেশে যান ভানুর ভবন॥
পাঁজি লয়ে কক্ষে করি ফিরি দ্বারে দ্বারে।
উপনীত রাই পাশে ভানুরাজপুরে॥

বিলাতী এসেন্স ব্যবহৃত না হইলেও আমাদের দেশে সুগন্ধি দ্রব্যের বা সৌখীনতার অভাব ছিল না। মহাপ্রভুকে গন্ধবণিক্ বলিতেছে,—

আজি গন্ধ পরি ঘরে যাহত ঠাকুর।
কালি যদি গায়ে গন্ধ থাকয়ে প্রচুর॥
ধুইলেও যদি গায়ে গন্ধ নাহি ছাড়ে।
তবে কড়ি দিহ মোরে যেই চিত্তে পড়ে॥—চৈঃ ভাঃ।

শ্রীচৈতন্যভাগবতে হিন্দুপল্লীর স্নানের ঘাটের যে মনোহর বর্ণনা আছে, নিজে না পড়িলে তাহার সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করা যায় না। নবদ্বীপের ঘাটে লক্ষ লক্ষ লোক স্নান করিতেছে। ব্রাহ্মণগণ জলে আবক্ষ ডুবিয়া মন্ত্রপাঠ করিতেছেন—কেহ বা তীরে বসিয়া ধ্যান করিতেছেন। (হিন্দু কুমারীরা নানাবিধ পুষ্পসম্ভারে শিবপূজা করিতেছে—মহিলাগণের শাড়ীতে শাড়ীতে ঘাট আচ্ছাদিত হইয়া গিয়াছে। আধুনিক সহরবাসী বাঙ্গালীর নিকট এ মধুর হিন্দুচিত্র কোন স্বপ্ন-রাজ্যের বলিয়া প্রতীত হয়।)

বিবিধ

সের শাহ কর্ত্তৃক ডাক-প্রথা স্থাপিত হইলেও সাধারণে তাহা ব্যবহার করিতে পাইত না বা করিত না। বৈষ্ণব-সাহিত্যে লোক-মারফৎ পত্রাদি প্রেরণের কথাই পাওয়া যায়। পণ্ডিতগণ যে সংস্কৃতেও পত্রাদি লিখিতেন, তাহা কর্ণানন্দে উদ্ধৃত শ্রীজীব গোস্বামীর একখানি পত্র হইতে জানা যায়। তৎকালে দেশে মটর-গাড়ী না থাকিলেও ধনিগণের বিলাসবৈভবের কিছু ত্রুটি হইত না।

বড় বড় বিষয়ী সকল দোলা হৈতে।
নাম্বিয়া করেন নমস্কার বহু মতে॥—চৈঃ ভাঃ।

সুসজ্জিত হইবার জন্য পুরুষেও অলঙ্কার পরিত। অলঙ্কারের মধ্যে চৈতন্যভাগবত ও পদাবলী হইতে নিম্নলিখিত অলঙ্কারগুলির নাম পাওয়া যায়—সুবর্ণের অঙ্গদ, বলয়, অঙ্গুরীয়ক, হার, কুণ্ডল, নূপুর, মল্ল প্রভৃতি। জয়ানন্দ তাঁহার চৈতন্যমঙ্গলের নদীয়াখণ্ডে নবদ্বীপ-বর্ণনায় তৎকালে ব্যবহৃত তৈজসপত্র ও দ্রব্যের একটি তালিকা দিয়াছেন। সৌখীন দ্রব্যসমূহ ঘরে ঘরে ফিরি করিয়া স্ত্রীগণও বিক্রয় করিত। চণ্ডীদাসে আছে,—

নাগর আপনি হৈলা বণিকিনী
কৌতুক করিয়া মনে।
চুয়া যে চন্দন অমলা বণ্টন
যতন করিয়া আনে॥
কেশর যাবক কস্তূরী দ্রাবক
আনিল বেণার জড়।

পূর্ব্বকালেও দেশী কনসার্ট বাদ্য বাজিত। চৈতন্যমঙ্গলে আছে,—

বীণা বেণুক বিলাস বংশীর নিসান।
রবাব উপাঙ্গ পাখোয়াজ একতান॥

নিম্নলিখিত বাদ্যযন্ত্র প্রচলিত ছিল,—

শঙ্খ দুন্দুভি বাজে ভেউর (ভেরী) কাহাল (ঝাঁঝ)।
মৃদঙ্গ গড়াহ বাজে কাংস্য করতাল॥
ঢাকের হুড়হুড়ি শুনি যোজনের পথে।
শুনিঞা জুড়ায় হিয়া শাহীনি শবদে॥—চৈঃ মঃ।

বৈষ্ণব-সাহিত্যের বহু স্থলে তদানীন্তন খাদ্যসামগ্রীর এমন সকল বর্ণনা আছে যে, পড়িতে পড়িতে প্রসাদ পাইবার দুরন্ত লালসা মনে উপস্থিত হয়। শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজের এমন একটি বর্ণনা উদ্ধার করিয়া আমরা "মধুরেণ সমাপয়েৎ" নীতি পালন করিব।

পীত সুগন্ধি ঘৃতে অন্ন সিক্ত কৈল।
চারি দিকে পাতে ঘৃত বহিয়া চলিল॥
কেয়াপত্র কলার খোলা ডোঙ্গা সারি সারি।
চারি দিকে ধরিয়াছে নানা ব্যঞ্জন ভরি॥
দশ প্রকারের শাক, নিম্ব সুকুতার ঝোল।
মরিচের ঝাল, ছানাবড়া বড়া ঘোল॥
দুগ্ধতুম্বী, দুগ্ধকুষ্মাণ্ড, বেসারি লাফরা।
মোচাঘণ্ট মোচাভাজা বিবিধ লাফরা॥
বৃদ্ধ কুষ্মাণ্ড বড়ীর ব্যঞ্জন অপার।
ফুলবড়ী ফলমূলে বিবিধ প্রকার॥

নব নিম্বপত্র সহ ভৃষ্ট বার্ত্তাকী।
ফুলবড়ী পটলভাজা কুষ্মাণ্ড মানচাকী॥
ভৃষ্ট মাষ, মুদ্গসূপ অমৃতে নিন্দয়।
মধুরাম্ল বড়াম্লাদি অম্ল পাঁচ ছয়॥
মুদ্গবড়া মাষবড়া কলাবড়া মিষ্ট।
ক্ষীরপুলি নারিকেলপুলী আর কত পিষ্ট॥
কারিজবড়া দুগ্ধ চিড়া দুগ্ধ লকলকী।
আর যত পিঠা কৈল কহিতে না শকি॥)

শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার

৺প্যারীচাঁদ মিত্র

ইংরাজী ১৮৫৪ সালের ভাদ্র মাসে ৺প্যারীচাঁদ মিত্র মহাশয় ৺রাধানাথ শিকদারের সহায়তায় একখানি মাসিক পত্র বাহির করেন। উহার প্রত্যেক সংখ্যার গোড়ায় লেখা থাকিত, "ইহা চলিত ভাষায় লেখা, স্ত্রীলোকদের জন্যই লেখা, পণ্ডিতেরা ইচ্ছা করেন - পড়িতে পারেন, তবে ইহা তাঁহাদের জন্য লেখা নহে।" এইরূপে চলিত ভাষায় লিখিব বলিয়া পণ করিয়া বাঙ্গালা লেখা এই প্রথম। স্ত্রীলোকদিগের জন্য লিখিব বলিয়া পণ করিয়া লেখাও, বোধ হয়, এই প্রথম। ইহার পুর্ব্বে বাঙ্গালা ছিল, বাঙ্গালা গদ্য ছিল—কিন্তু সেগুলি সাধুভাষা বা পণ্ডিতি ভাষায় লেখা। চলিত ভাষা থেকে যত দুরে থাকা যায়, ততই ভাষার গৌরব হইবে, পণ্ডিত মহাশয়দের এই ধারণাই ছিল। সে ভাষা স্ত্রীলোকের কথা দুরে থাকুক, অনেক পুরুষের পক্ষে বোঝা কঠিন ছিল। আমি বাল্যকালে এক বৃদ্ধকে তারাশঙ্করের কাদম্বরীর তর্জ্জমা পড়িয়া বলিতে শুনিয়াছিলাম, —আহা! তারাশঙ্কর কি চমৎকার ভাষাই লিখিয়াছে! অভিধান ভিন্ন এক বর্ণও বোঝা যায় না। এই ত লেখার গাম্ভীর্য্য।

যখন ভাষার প্রতি লোকের এইরূপ ভাব, তখন চলিত ভাষায় লিখিতে আরম্ভ করা খুব সাহসের কাজ, খুব দুরদৃষ্টিরও কাজ। প্যারীচাঁদ মিত্র মহাশয় বিচক্ষণ লোক ছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন, সাধুভাষা লোকে পড়িতে পারে না, বুঝিতে পারে না, সুতরাং সে ভাষায় লেখা আর না লেখা, দুই সমান। তাই তিনি চলিত বাঙ্গালা ধরেন: এ ধরায় বিশেষ উপকার হইয়াছে। এই কয়েক বৎসরের মধ্যে বাঙ্গালা একটা ভাষা হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

স্ত্রীলোকদের জন্য লেখা, ইহারও বিশেষত্ব আছে। আগে বাঙ্গালা গদ্যে বই লেখা হইত—তার বিষয় হয় সংস্কৃত হইতে নেওয়া, নয় বিচার, না হয় নাটক ও নভেল—রুচি এমন কদাকার যে, স্ত্রীলোকের হাতে কোনও মতেই দেওয়া যায় না। তাই শুধু মেয়েদের পড়িবার জন্য, তাহাদের আমোদের জন্য, যাহাতে তাহাদের শরীর ও মনের স্ফূর্ত্তি হয়, তাহার জন্য ভাল ভাল উপদেশ দিয়া এই পত্রিকা বাহির করা হয়। বঙ্কিমবাবু ঠিক বলিয়াছেন, ইহার পুর্ব্বে বাঙ্গালা, সংস্কৃত ও ইংরাজীর গণ্ডীর মধ্যে থাকিত, তাহার নিজের গণ্ডী ছিল না। বাবু প্যারীচাঁদ মিত্রই প্রথমে দেখাইয়াছেন যে, বাঙ্গালা দেশেও ঘরের কথা লইয়া বই লেখা যায়, আর সে বই পড়িবার মতনও হয়। আর এই ৭০ বৎসর পরে এখনকার লোকের ধারণা, বাঙ্গালায় ঘরের কথা লইয়াই বই লেখা উচিত এবং তাহা পড়িলেই বেশী উপকার হয়।

প্যারীচাঁদ মিত্রের মাসিক পত্রিকাতেই "আলালের ঘরের দুলাল" প্রথম বাহির হয়। ঐ গল্প পঁচিশ সংখ্যাতে বই হইয়া বাহির হয়। ঐ বইয়ে কিন্তু বাবু প্যারীচাঁদ মিত্রের নাম ছিল না, মলাটে লেখা ছিল, "শ্রীটেকচাঁদ ঠাকুর প্রণীত।" টেকচাঁদ ঠাকুর কে, ইহা কেহই বুঝিতে পারিত না। বাবু প্যারীচাঁদ যখন মেটকাফ হলের সেক্রেটারী ও পবলিক লাইব্রেরির লাইব্রেরিয়ান,

সেই সময় আসাম দেশ হইতে একজন বড়লোক কলিকাতায় বেড়াইতে আসেন—তাঁহার নাম ছিল ঢেঁকচন্দ্র ফুকন্। তিনি কলিকাতার বড় বড় বাঙ্গালীদিগের সঙ্গে খুব মিশিয়াছিলেন। তাঁহার নাম হইতেই বোধ হয়, টেকচাঁদ ঠাকুরের উৎপত্তি। সে কালের অনেক লোকেই তাঁহার নাম জানিত, এখনকার লোকে ভুলিয়া গিয়াছে।

বাবু প্যারীচাঁদ মিত্র যদি দুই একখানি "আলালের ঘরের দুলালে"র মতন গল্পের বই লিখিয়াই নিশ্চিন্ত থাকিতেন, তাহা হইলেও তাঁহাকে গল্পের প্রথম লেখক বলিয়া মান্য করিতে হইত। কিন্তু গল্প লেখার চেয়ে তিনি ঢের বেশী কাজ করিয়া গিয়াছেন। তিনি দেখাইয়া গিয়াছেন, বাঙ্গালায় সব জিনিষই লেখা যায়, সব ভাবই প্রকাশ করা যায়। বাঙ্গালায় দর্শনবিজ্ঞানেরও বই লেখা যায়। তিনি চাষ ও বাগান করা সম্বন্ধে বাঙ্গালায় অনেক রচনা করিয়া গিয়াছেন। তিনি এগ্রি-হর্টিকালচার সোসাইটীর মেম্বর ছিলেন। এই উপলক্ষে চাষ ও বাগানের বিষয়ে তিনি অনেক কথা লিখিয়া গিয়াছেন। সেগুলি চলিত ভাষায় লেখা, সহজ করিয়া লেখা, তাহা পড়িলে এখনও লোকের উপকার হইতে পারে। তাঁহার "আধ্যাত্মিকায়" অতি সহজ করিয়া যোগ ও বেদান্তদর্শনের অনেক গভীর কথা বুঝাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে। তাঁহার "অভেদী"তেও এই রকম দর্শনশাস্ত্রের কথা আছে। মাসিকপত্রিকায় তিনি যে সকল ইতিহাসের গল্প লিখিয়াছেন, সেগুলিও বড় মিষ্ট। গজনীর সুলতান মামুদ ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়া কোন্ বারে কি করিয়াছিলেন, তাঁহার মাসিক পত্রিকায় অতি সুন্দর করিয়া তাহা লেখা আছে। ভণ্ড পাষণ্ডদের কি করিয়া বিদ্রূপ করিতে হয়, তাহা তিনি বেশ জানিতেন। ভবশঙ্করবাবু, বাচস্পতি মহাশয়, গোঁসাইজি প্রভৃতির চরিত্রে ভণ্ডামি কেমন করিয়া ধরাইয়া দিতে হয়, তাহা তিনি বেশ দেখাইয়াছেন। তিনি চৌচাপটে দেখাইয়াছেন যে, বাঙ্গালা ভাষায় সব রকম ভাবই প্রকাশ করা যায়, আর সব রকম সাহিত্যই লেখা যায়।

প্যারীচাঁদ মিত্র মহাশয় এক অদ্ভুত প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি খুব খাটিতে পারিতেন। খাটিয়া তিনি কখনও ক্লান্তি বোধ করিতেন না। ছেলে বেলা হইতেই তাঁহার খাটুনির আরম্ভ। হিন্দুকলেজে পড়িতে পড়িতেই তিনি বাড়ীতে এক স্কুল বসাইয়াছিলেন। তিনিই বেশী করিয়া পড়াইতেন। তাহার পর যত বয়স বাড়িতে লাগিল, তাঁহার খাটুনিও বাড়িতে লাগিল। তাঁহার বাপ-পিতামহ কারবারী লোক ছিলেন। কারবারেই তাঁহাদের শ্রীবৃদ্ধি। তিনিও কারবারই করিতেন। লর্ড মেটকাফ কলিকাতা ত্যাগ করিলে তাঁহার স্মৃতি-রক্ষার জন্য যে আন্দোলন উপস্থিত হয়, প্যারী-বাবু তাহাতে খুব একহাত ছিলেন। তাই সেই স্মৃতির জন্য যখন মেটকাফ হল হইল, তখন লোকে তাঁহাকেই সেক্রেটারী ও সেখানে যে পবলিক লাইব্রেরি হইল, তাহার লাইব্রেরিয়ান করিল। তিনি এত মিশুক ছিলেন ও তাঁহার পড়াশুনা এত বেশী ছিল যে, কি ইংরাজ, কি বাঙ্গালী, যাঁহার যখন কিছু জানিবার দরকার হইত, মেটকাফ হলে লাইব্রেরিতে গিয়া উপস্থিত হইতেন এবং তিনি তাঁহার সাধ্যমত তাঁহাদের উপকার করিতে চেষ্টা করিতেন। মেটক্যাফ হল তখন বড় রকম একটা পণ্ডিতের আড্ডা হইয়াছিল। এখানে পণ্ডিত শব্দে শুধু সংস্কৃতওয়ালাই নয়, বরং ইংরাজীওয়ালাই বেশী। বাঙ্গালী-সমাজের কোনও বিপদ্ সম্পদ্ উপস্থিত হইলে, একটা বড়

রকম আন্দোলন উপস্থিত হইলে, প্যারীচাঁদ মিত্র মহাশয় তাহাতে একহাত আছেনই আছেন। কিন্তু কোথাও প্যারীচাঁদ মিত্র মহাশয় প্রধান (অগ্রণী, নেতা) হইবার চেষ্টা করিতেন না। ইংরাজীতে তাঁহার কলম খুব চলিত। সভাসমিতির কাজকর্ম্ম ইংরাজীতেই হইত; সুতরাং প্যারীচাঁদ ভিন্ন চলিত না। তিনিও ইচ্ছা করিয়া ধরা দিতেন এবং খুব খাটিয়া কাজ উদ্ধার করিয়া দিতেন। হেয়ার সাহেবের প্রতি তাঁহার ভক্তি অগাধ ছিল। সুতরাং হেয়ার সাহেবের নামে যে কোনও কার্য্য আরম্ভ হইত, তিনি প্রাণপণে সেই কার্য্যটীকে উদ্ধার করিবার চেষ্টা করিতেন। এইরূপে তিনি হেয়ার মেমোরিয়াল, হেয়ার প্রাইজ ফণ্ড, হেয়ার এ্যানিভারসারি প্রভৃতি হেয়ার সাহেবের নামের সহিত জড়িত যত কার্য্য ছিল, সেই সব কার্য্যেই জড়িত থাকিতেন।

তিনি ইংরাজীতে হেয়ার সাহেবের একখানি জীবনচরিত লিখিয়াছিলেন। সেই বইখানি প্রত্যেক বাঙ্গালীর, বিশেষতঃ কলিকাতাবাসীর পড়া অবশ্য কর্ত্তব্য। হেয়ার সাহেব যে কয় বছর বিলাতে ছিলেন, এ বইয়ে তাহার কোনও কথা নাই। তিনি ষোল বছর কলিকাতায় ঘড়ির কারবার করিয়াছিলেন, এ বইয়ে সে ষোল বছরের কোনও কথা নাই। ১৮১৬ সালে হেয়ার সাহেব কারবার উঠাইয়া দিয়া কলিকাতার হিন্দুরা যাহাতে ইংরাজী শেখে, ইংরাজী শিখিয়া মানুষ হয়, সে জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করেন। ১৮৪২ সালে তাঁহার মৃত্যু হয়। এই ২৬ বৎসর তিনি অকাতরে টাকা খরচ করিয়াছেন এবং প্রাণপণে পরিশ্রম করিয়াছেন। তিনি সকালেই পাল্কী করিয়া বাহির হইতেন। পাল্কীতে বই থাকিত, ওষুধ থাকিত; তিনি স্কুল দেখিতেন, পাঠশালা দেখিতেন। পাল্কী করিয়া সারা কলিকাতা ঘুরিয়া বেড়াইতেন। বড় বড় ভদ্রলোকের বাড়ী যাইতেন, তাহাদের সঙ্গে মিলিতেন মিশিতেন, তাহাদের রোগে শোকে, উৎসবে ব্যসনে তাহাদের সহিত দেখা করিয়া যাইতেন। ছোট ছোট ছেলেদের খেলানা দিতেন। তাহাদের তালপাতে, কলাপাতে ও কাগজে লেখা দেখিতেন; বই দিতেন, কাগজ দিতেন। প্যারীচাঁদ যে এমন একজন অদ্ভুত প্রকৃতির লোকের ভক্ত হইবেন, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? এই যে ২৬ বৎসর, ইহাতেই কলিকাতায় ইংরাজী শিক্ষার আরম্ভ। এই সময় হিন্দুকলেজ, সংস্কৃত-কলেজ, মেডিকেল কলেজ প্রভৃতি অনেকগুলি কলেজ খোলা হয়, ইংরাজীতে সভাসমিতি হইতে থাকে, ইংরাজীতে ও বাঙ্গালায় অনবরত কাগজ বাহির হইতে থাকে। এই সময় ইংরাজী শিখিবার জন্য একটা ভয়ানক ঝোঁক ও একটা বিশেষ নেশা আসিয়া উপস্থিত হয়। হেয়ার সাহেবই ঐ নেশার গুরুমশায়। সুতরাং কলিকাতায় ইংরাজী শিক্ষার ইতিহাস প্যারীচাঁদ মিত্র মহাশয়ের এই বইখানায় বিশেষ করিয়া লেখা আছে। তাই আমি বলিয়াছি, কলিকাতার বাঙ্গালী মাত্রেরই এই বইখানা পড়া উচিত।

তিনি ইংরাজীতে আরো একখানি জীবনচরিত লিখিয়াছিলেন। সেখানি স্বনামধন্য রামকমল সেন মহাশয়ের। ইঁহার নিবাস গরিফা; কিন্তু কলিকাতায় ইনি খুব প্রতিপত্তি করিয়াছিলেন এবং ব্যাঙ্কের দেওয়ান হইয়াছিলেন। তিনি একজন আস্তিক হিন্দু; সুতরাং রামমোহন রায়ের

ব্রাহ্মসমাজের—সতীদাহ নিবারণের ঘোর বিরোধী ছিলেন। কিন্তু ইংরাজ-মহলে ইঁহার খুব প্রতিপত্তি ছিল। ইংরাজেরা ইঁহাকে ভালবাসিতেন, শ্রদ্ধা করিতেন এবং একটু ভয়ও করিতেন। ইনি এসিয়াটিক সোসাইটীর প্রথম কেরাণী, পরে ধনাধ্যক্ষ ও পরে মেম্বর হইয়াছিলেন। সেখানকার সভায় কাগজ পড়িতেন ও পুরাণ তর্জ্জমা করিতেন। কলিকাতার হিন্দু বাসেন্দাগণ তাঁহাকে খুব বড় লোক বলিয়া মনে করিতেন। রাজা রাধাকান্ত দেব বলিতেন যে, রামকমলের মধ্যে এমন একটা কিছু আছে যে, সে না এলে সভা-সমিতি জমে না। সংস্কৃতকলেজ যখন খোলা হয়, সেন মহাশয় তাহাতে একজন প্রধান উদ্‌যোগী। সে সভায় রামমোহন রায়কে আসিতে দেওয়া হয় নাই। হেয়ার সাহেব রায় মহাশয়কে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন, তুমি গেলে হিন্দুরা আসিবেন না। গবর্ণমেণ্টের একটা কাজ মাঠে মারা যাইবে। সেন মহাশয় সংস্কৃতকলেজের কমিটীর সেক্রেটারী হইয়াছিলেন।

প্যারীচাঁদ ইংরাজীতে আরো একখানি জীবনচরিত লিখিয়াছিলেন। সেখানি "কোলস্‌ওয়ার্দ্দি গ্র্যাণ্ট" সাহেবের জীবনচরিত। এই মহাত্মা আপনার সকল কাজকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া, যাহাতে পশুদিগের উপর অত্যাচার নিবারণ হয়, সে বিষয়ে যত্নবান্ হইয়াছিলেন এবং "প্রিভেন্‌সন্ অব ক্রুয়েল্টি টু আনিম্যালস্" নামক আইন পাশ করাইয়া দিয়াছিলেন এবং অনেক দিন ধরিয়া সেই আইনমত যাতে কার্য্য হয়, তাহা দেখিবার ভার লইয়াছিলেন।

প্যারীচাঁদ মিত্র মহাশয় ইংরাজীতে "স্পিরিচুয়ালিজমের" উপর অনেক বই লিখিয়াছিলেন। তিনি স্পিরিচুয়ালিজম বিশ্বাস করিতেন, প্ল্যানচেট বিশ্বাস করিতেন, মিডিয়াম্ বিশ্বাস করিতেন এবং এই শাস্ত্রের তিনি খুব উন্নতি করিয়াছিলেন। এই উপলক্ষে ইংলণ্ড আমেরিকা প্রভৃতি স্থানের বড় বড় লোকের সহিত তাঁহার চিঠি লেখালিখি চলিত। এই উপলক্ষেই তিনি যোগ বেদান্ত প্রভৃতি শাস্ত্রে বিশেষ জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার আধ্যাত্মিকায় প্রকাশ। নতুবা তিনি হিন্দু ধর্ম্মের কিছুই বিশ্বাস করিতেন না। তাঁহার মাসিক পত্রিকায় প্রথম রচনা "শ্রাদ্ধে কোনও ফল নাই।" সেটী চলিত ভাষায় লেখা এবং বেশ জোরের লেখা। তিনি বলেন, শ্রাদ্ধ করিলে যদি লোকে স্বর্গে যায়, তাহা হইলে বড় লোকেই স্বর্গে যাইবে, গরীব মানুষের আর কোন উপায় নাই। ধনী লোকেরা প্রায় জীবনে মদখোর ও বেশ্যাবাজ হয়, তাহারা যদি শ্রাদ্ধের চোটে স্বর্গে যায়, তাহা হইলে স্বর্গ যে বিশেষ কামনার বস্তু হইবে, বোধ হয় না। প্যারীবাবু লিখিবার সময় এরূপ জোর কলমে লিখিলেন। কিন্তু তিনি প্রতি বৎসর যথাসময়ে যথারীতি পিতাপিতামহের শ্রাদ্ধ করিতেন। শেষ বয়সে ইংরাজ গুরুর উপদেশে তাঁহার মত পরিবর্ত্তন হয়। তিনি লিখিয়াছেন,—

The three births, above alluded to, are the natural birth, the regenerated birth and the spiritual birth. The conviction as to the immortality of the soul was so strong that it gave rise to *shraddhas* or offering funeral cakes to the souls of the deceased, which is considered not only

a sacred duty on the part of every Hindu, but a condition of inheritance. In the offer of funeral cakes, there is a spirit of charity for the souls of the unfortunate :—"May those who have no father or mother or kinsman, no food or supply of nourishment, be contented with this food offered on the ground and attain like it a happy abode."

Page 7 of the Spiritual Stray Leaves by Peary Chand Mittra.

যাহা হউক, প্যারীবাবু কিরূপ লোক ছিলেন, সে বিষয়ে আলোচনা করিবার আমাদের প্রয়োজন নাই। তিনি চলিত ভাষায় বই লেখার একরকম আদিগুরু। সুতরাং তাঁহার ভাষা সম্বন্ধে আমাদের আলোচনা করিতে হইবে; আমাদের নিজের উপকারের জন্য—তাঁহার নহে। তিনি এখন স্তুতি-নিন্দার অতীত। স্পিরিচুয়ালিজমের মতে তিনি এখন সপ্তম বা অষ্টম স্বর্গে। কিন্তু তিনি যে ভাষা রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা ত সে কালের ভাষা। সে কালের ভাষার সহিত এ কালের ভাষার তুলনা করিলে আমরা অনেক জিনিষ শিখিতে পারিব।

প্যারীবাবুর ভাষার খুব জোর, খুব দৌড়। যে ভাষায় লিখিলে "কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল হায়," ইহা সেই ভাষা—যে হেতু ইহা চলিত ভাষা। এই ভাষায় যে লেখে ও যে পড়ে, তাহাদের মধ্যে ভাষা বলিয়া একটা পর্দ্দাই থাকে না। এই জন্যই এ ভাষায় লিখিলে হাসিবার সময় লোকে হাসে ও কাঁদিবার সময় লোকে কাঁদে। সেই জন্যই মাতাল ভবশঙ্কর কৃষ্ণ সাজিয়া যখন "নবনারীকুঞ্জ" হইতে ধপাত করিয়া পড়িয়া গেলেন, তখন লোকে হাসিয়া অস্থির হইল। আর যখন ঠক্‌চাচা আর বাহুল্য, দুজনে জাল করার জন্য জেলে গেলেন, তখন লোকের আনন্দের আর সীমা রহিল না। আবার যখন আধ্যাত্মিকার পৈতৃক সম্পত্তি সব গেল—বাবাও মারা গেলেন, দেনার দায়ে বাড়ীখানিও বিক্রী হইয়া গেল, অথচ আধ্যাত্মিকার ভ্রূক্ষেপ নাই, শান্তভাবে নির্ব্বিকার চিত্তে যোগ-সাধনায় চলিয়া গেল, তখন লোকে তাহার দুঃখে দুঃখী হইয়া কাঁদিতে লাগিল।

বাঙ্গালা পদ্যে এ ভাবটা চিরকালই আছে, বাঙ্গালা পদ্য কোনও কালেই পণ্ডিতের জন্য লেখা নয়। বৌদ্ধেরা ধর্ম্ম প্রচারের জন্য লিখিত, হিন্দু কবিরাও ধর্ম্ম প্রচারের জন্য লিখিত, সুতরাং যাদের কাছে প্রচার করিবেন, তাদের ভাষায় লিখ্‌তে হত। নিজের বিদ্যে তাতে ফলাবার জো ছিল না। বাঙ্গালা গদ্যের অবস্থা কিন্তু অন্যরূপ। উহার উৎপত্তি ইউরোপীয় মিশনারীদের হাতে—উঁচু নীচু, এবড়োখেবড়ো এক রকম ফিরিঙ্গী বাঙ্গালা বললেও হয়। তারপর সে বাঙ্গালা ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিতদের হাতে পড়ে। সেটা হল সংস্কৃতের গণ্ডী। তার ভাবও সংস্কৃত, ভাষাও সংস্কৃত। ইহার পরের বিকাশ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের হাতে। সেখানে এই সাধু ভাষা, মাজা ঘষা, শুন্‌তে মিষ্টি হয়। কিন্তু সে ভাষা "কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশে" না। তাই প্যারীচাঁদের ভাষার এত আদর।

কিন্তু সাহস করিয়া চলিত ভাষায় লিখিতে গিয়া প্যারীবাবু বেশ বিপদে পড়িয়াছিলেন। অনেক সময় তাঁহার ভাব আসিত ইংরাজীতে, সেগুলিকে বাঙ্গালা করিতে তাঁহার বিশেষ বেগ

পাইতে হইত। আবার সেগুলি সহজ হইলেও চলিত বাঙ্গালা হইত না। সে ইংরাজী-বাঙ্গালা হইত। এই ইংরাজী-বাঙ্গালাটাই শেষ ইংরাজী-শিক্ষিত মহলে বড়ই চলিয়া গিয়াছে। সেটা কিন্তু সংস্কৃত চলার চেয়ে খারাপ হইয়াছে।

ব্রাহ্মসমাজের ভাষায় এই দোষ অত্যন্ত বেশী। ইংরাজীনবিশ বাঙ্গালা লিখিতে গেলেই এই দোষ করিবেন এবং তাহাতে এই ভাষা বাঙ্গালীদের পক্ষে দুর্ব্বোধও হইবে। যাঁহারা রাজনীতি, সমাজনীতি, বিজ্ঞান প্রভৃতি লেখেন, এই কারণে তাঁহাদের ভাষা লোকের কাছে অত্যন্ত কঠিন বলিয়া বোধ হয়, এবং তাঁহাদের বইও চলে না। এই জন্য আমি একবার রাগ করিয়া বলিয়াছিলাম, "বাবু হে! বাঙ্গালায় ভাবিতে শেখ। যদি তা না পার, তাহা হইলে বাঙ্গালায় কলম ধরিও না।"

প্যারীবাবু স্ত্রীলোকদের জন্য বই লিখিয়াছেন; সুতরাং কোন্‌টা সুরুচি, কোন্‌টা কুরুচি, তাহা তিনি বেশ বুঝেন। তাঁহার রচনার বিষয়ে কুরুচি নাই, থাকিতেও পারে না। কিন্তু কোন্ শব্দটা সুরুচি, কোন্ শব্দটা কুরুচি, ইহা তখনও ঠিক জানা যায় নাই। কারণ, সে সকল কথা বইএ লেখা হয় নাই। সজ্জনে সে সকল কথা আলোচনা করিবার অবসর পান নাই। দুই একটা দৃষ্টান্ত দিব।— প্যারী বাবু লিখিয়াছেন, মদখোর ও বেশ্যাবাজ। মদখোর কথাটা তখনও চলিত ছিল না, এখনও নাই। গাঁজাখোর, গুলিখোর, সুদখোর, ঘুস্‌খোর চলিত, কিন্তু মদখোর চলিত নহে। বেশ্যাবাজ চলিত নহে। যে শব্দটা চলিত, সেটা বড় শ্রুতিকটু—বেশ্যাসক্ত বলে বটে, কিন্তু পণ্ডিত মহলে। লম্পট শব্দটা এই অর্থে অনেক সময় ব্যবহার হয়।

অধিক দৃষ্টান্ত দিয়া আমরা আর সময় নষ্ট করিব না। অলঙ্কারে যাহাকে দোষ বলে, পদাংশ-দোষ, পদদোষ, শব্দদোষ, অর্থদোষ, বাক্যদোষ—প্যারীচাঁদবাবুর বইয়ে সবই আছে। তিনি নূতন ভাষায় লিখ্‌চেন—হইবারই কথা। কিন্তু তাঁহার বর্ণনার শক্তি অতি অদ্ভুত। পড়িবার সময় মনে হয়, জিনিষটা চোখে দেখিতেছি। ছবিখানি যেন চোখের উপর ভাস্‌ছে। বইগুলি যেন একখানি এলবাম্—তাতে কত কত পুরাণ ছবি রয়েছে। "আলালের ঘরের দুলালে" ব্ল্যাকিয়ার সাহেবের চেহারা, ব্ল্যাকিয়ার সাহেবের আদালত, সুপ্রীম কোর্টের গ্র্যাণ্ডজুরী, পেটীজুরী প্রভৃতির ছবিগুলি যেন পর পর সাজান আছে। রচনা সর্ব্বত্রই প্রাঞ্জল ও হৃদয়গ্রাহী। শব্দ অনেক জায়গায়ই সেকেলে, পুরাণ ও একটু কটমট হইলেও ভাব ঠিক আছে। প্যারীবাবুর রচনার একটী বিশেষ গুণ এই যে, ইংরাজীতে যাহাকে হিউমার (Humour) বলে, তাহাতে উহা পরিপূর্ণ। সোজা কথাও প্যারীবাবু একটু বাঁকাইয়া বলেন। এই বাঁকাইয়া বলার নাম বক্রোক্তি। অনেক অনেক আলঙ্কারিকেরা বক্রোক্তিকেই কাব্যের জীবন বলিয়াছেন। ইংরাজেরাও এখন হিউমার বড় ভালবাসেন। প্যারীবাবু ইংরাজের শিষ্য। সুতরাং তিনিও বক্রোক্তি বা হিউমারের ভক্ত। কিন্তু বই লিখিতে গেলে, বিশেষ উপদেশ দিতে গেলে সব জায়গায় বক্রোক্তি চলে না। তখন সোজাভাষায় সোজা কথা বলিতে হয়। সেই সব জায়গায় প্যারীবাবু যেন মনপ্রাণ ঢালিয়া দেন এবং মধ্যে মধ্যে বক্তৃতার ছটা বাহির করেন। তিনি যে সকল মনুষ্যের চরিত্র বর্ণন করিয়াছেন, সেগুলি বেশ টিকল হইয়াছে। তাঁহার ঠক্‌চাচা, বাহুল্য, বাবুরামবাবু, বেণীবাবু, বেচারামবাবু, বরদাবাবু, মতিলালবাবু, বাঞ্ছারামবাবু

মণিরামপুরের মাধববাবু, বটলার সাহেব, জান্ সাহেব, ভবশঙ্করবাবু, বাচস্পতি মহাশয়, গোস্বামী মহাশয়, বক্রেশ্বরবাবু, অন্বেষণবাবু, পতিভাবিনী, জেঁকোবাবু, বাবুসাহেব, লালবুঝকড়, হরদেব তর্কালঙ্কার, আধ্যাত্মিকা, ভজহরিবাবু ও চম্পকলতা—সবগুলিই অতি মনোহর হয়েছে।

প্যারীবাবু শুধু গল্প লিখিয়াই ক্ষান্ত হয়েন নাই, চাষ ও বাগান করার কথা অনেক আছে। স্ত্রীলোকদিগকে উপদেশ দেওয়াই তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল। তাঁহার মাসিক পত্রখানিও স্ত্রীলোকদিগের জন্যই বাহির হইয়াছিল। তাঁহার রামারঞ্জিকা ও বামাতোষিণীও সেই উদ্দেশ্যেই লেখা। প্রথম প্রথম তিনি যেন সাহেবীয়ানার দিকেই বেশী ঢলিয়াছিলেন। কারণ, তাঁহার মাসিক পত্রিকার প্রথম রচনার নাম "শ্রাদ্ধে কোনও ফল নাই"। ক্রমে যত বয়স হইতে লাগিল, ততই তিনি হিঁদুয়ানীর দিকে আসিতে লাগিলেন। তাঁহার "অভেদী," তাঁহার "আধ্যাত্মিকা" উচ্চ অঙ্গের হিঁদুয়ানী শিক্ষা দিয়াছে। কিন্তু তিনি হিন্দুয়ানী সংস্কার করিয়া লইতে চাহিতেন।

তিনি ভণ্ডামীর বড় বিরোধী ছিলেন। "মদ খাওয়া বড় দায়, জাত থাকার কি উপায়" বইখানি ভণ্ড তপস্বীদের ভণ্ডামী ভাঙ্গিয়া দিয়াছে। প্যারীবাবুর কোনও ধর্ম্মেই দ্বেষ ছিল না। তিনি আদি ব্রাহ্মসমাজ, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ, নূতন ব্রাহ্মসমাজ, মুসলমানসমাজ, ক্রীষ্টানসমাজ—সকল সমাজের কথাই লিখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু শেষটা তাঁহার হিন্দুধর্ম্মের প্রতিই আস্থা হইয়াছিল। যোগ ও স্পিরিচুয়ালিজমের উপর তাঁহার খুব ঝোঁক হইয়াছিল। সাহেবরাই তাঁহার বাল্যকালের গুরু, সাহেবদের উপর তাঁহার ভক্তিও অগাধ। তাঁহার আধ্যাত্মিকাতেও এক বিবিসাহেব আসিয়া উপদেশ দিতেছেন। তাঁহার বইগুলি বাঙ্গালায় লেখা হইলেও তিনি ইংরাজীতেই প্রায় ভূমিকা লিখিতেন। এ সব হইলেও তিনি কিন্তু খাঁটি বাঙ্গালী ছিলেন। বাঙ্গালার জন্য তাঁহার প্রাণ কাঁদিত। বাঙ্গালার মেয়ে ও পুরুষ যাতে ভাল হয়, তিনি তার চেষ্টা করিতেন। ইতর জন্তুর প্রতিও তাঁহার দয়া কম ছিল না। পশুদিগের প্রতি নিষ্ঠুরতা নিবারণের জন্য কোলস্ওয়ার্দ্দি গ্র্যাণ্ট সাহেব যখন কোমর বাঁধিয়া লাগিলেন, প্যারীবাবুই তখন তাঁহার দক্ষিণ হস্তস্বরূপ হইলেন। তিনি যখন বেঙ্গল কাউন্সিলের মেম্বর, সেই সময়ে তাঁহারই উদ্যোগে পশুদিগের প্রতি অত্যাচার নিবারণের আইন প্রথম পাশ হয়।

প্যারীচাঁদবাবুর ন্যায় লোকের একখানি ভাল জীবনচরিত হওয়া উচিত। মালমসলা যথেষ্ট সংগ্রহ আছে। একজন সুলেখকের এই কার্য্যের ভার লওয়া উচিত।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী

পুরুলিয়ার পাখী

পুরুলিয়াতে লোকে পাখীর খোঁজে আসে না, ভাঙ্গা স্বাস্থ্য জোড়া দিবার জন্যই আসে; অবশ্য যাঁহারা কার্য্যব্যপদেশে এখানে থাকিতে বাধ্য হন, তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র। মানভূম জেলার অধিবাসীদিগের কথাও স্বতন্ত্র। আগন্তুক বাঙ্গালী যদি আমাদের মত শীতের প্রারম্ভে অবসরকালে চিত্তবিনোদনের জন্য নিজের স্বাস্থ্যের বা অস্বাস্থ্যের কথা ভুলিয়া গিয়া, কিছুক্ষণ আযোধ্যার পাহাড়ে, কাঁসাই নদী-তীরে, রাণীবাঁধে অথবা সাহেববাঁধের বুকের উপরে কুঞ্জবনে পাখীর বিচিত্র জীবনলীলা দেখিয়া আনন্দ পান, তাহা হইলে সেই আনন্দ তাঁহার ভাঙ্গা স্বাস্থ্য জোড়া দিবার পক্ষে কতকটা অনুকূল হইতে পারে। লালসার বশবর্ত্তী হইয়া ব্যাধ বা শিকারীর চক্ষে এই সমস্ত বন্য বিহঙ্গের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে বলিতেছি না, পাখীকে আমাদের ভোজ্য সামগ্রীতে রূপান্তরিত করিবার চেষ্টা করিলে আর যে ফল পাওয়াই যাক, অনাবিল আনন্দরসটুকু পাওয়া যাইবে না।

মানভূম জেলার প্রায় মাঝখানে এই পুরুলিয়া নগর; ইহার বুকের উপর দিয়া বড় বড় রাজপথ বহুদুর পর্য্যন্ত প্রসারিত; কোনওটা রাঁচি পর্য্যন্ত পশ্চিমাভিমুখে সংসর্পিত, কোনওটা দক্ষিণে পার্ব্বত্য ভূমির ভিতর দিয়া চৈবাসার দিকে চলিয়া গিয়াছে; একটা প্রশস্ত রাজপথ উত্তরে বরাকরাভিমুখে প্রসারিত; কোনওটা বাঁকুড়ার দিকে, কোনওটা মানবাজার অভিমুখে চলিয়া গিয়াছে। প্রশস্ত রাজপথের দুই ধারে বড় বড় অশ্বত্থ, শাল, পলাশ, কুসুম, মহুয়া, জাম, আম, তেঁতুল প্রভৃতি গাছের শ্রেণী। দক্ষিণে দূরে বাঘমণ্ডী গিরিশ্রেণী পর্য্যন্ত প্রসারিত প্রান্তর অত্যন্ত বন্ধুর; মাঝে মাঝে শুষ্কগর্ভ নদীর মত নাতিগভীর দীর্ঘবিসর্পিত 'খাত'; সহরের মধ্যে ও চারিধারে ছোটবড় অনেকগুলি "বাঁধ",—সাহেব বাঁধ, নাজির বাঁধ, ছুল্‌মি বাঁধ, বুড়িবাঁধ, ভাটবাঁধ, আরও কত কি বাঁধনামধেয় ছোট বড় জলাশয়। সহরের দক্ষিণে ক্ষীণতোয়া কাঁসাই নদী; আরও দক্ষিণে বাঘমণ্ডী পাহাড় হইতে নিঃসৃত হইয়া মানভূম জেলার দক্ষিণ সীমান্তরেখায় প্রবহমানা সুবর্ণরেখা; দূরে উত্তরে দামোদর; আরও উত্তরে মানভূমের প্রান্তসীমায় বরাকর নদী প্রবহমানা। ভূতত্ত্ববিৎ এখানকার মাটির সম্বন্ধে আলোচনা করিলে হয় ত যুগযুগান্তরবিন্যস্ত যে সকল পাথরের কথা তুলিবেন, মানভূম জেলার মৃত্তিকা এবং মৃদ্‌ভেদী পাষাণ ও খনিজপদার্থসংশ্লিষ্ট বিবিধ ভূস্তরপ্রসঙ্গের অবতারণা করিবেন, তাহা পক্ষিতত্ত্বজ্ঞেরও আলোচনার বিষয়ীভূত হইতে পারে, এ কথা বোধ হয়, কেহ কেহ একেবারে স্বীকার করিয়া লইতে ইতস্ততঃ করিবেন; কিন্তু পাষাণের সঙ্গে পাখীর সম্পর্ক যে নিগূঢ় নৈসর্গিক সূত্রে গ্রথিত, একটু প্রণিধান করিলেই তাহা হৃদয়ঙ্গম হইবে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের ভূস্তরবৈশিষ্ট্য বিশেষ বিশেষ লতাগুল্ম বৃক্ষাদির উদ্ভবের পক্ষে অনুকূল; ঐ সকল লতা গুল্ম বৃক্ষ আবার বিশেষ বিশেষ বিহঙ্গের স্বভাবতঃ প্রিয় আশ্রয়স্থল। কাঁসাই-দামোদর-বরাকরধৌত মানভূমের বুকের উপরে, বাঘমণ্ডী-পঞ্চকোট ঝাল্‌দে-গিরিশ্রেণী মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে; নগরের ভিতরে ও বাহিরে অসংখ্য ছোট বড় বাঁধ; সর্ব্বত্র বড় বড় বৃক্ষশ্রেণী, কোথাও মাঠের উপর অসংখ্য ছোট ছোট ঘন ঝোঁপ; কোথাও ঘন মহুয়া-কেঁদ-

কুসুম-পিয়াল-শিমুল-শিরীষ-হরিতকী-অর্জ্জুন-করঞ্জ-আমলকি-পলাশ-শিশ্‌ি-নিমের নিবিড় কানন প্রান্তরভূমি সমাচ্ছন্ন করিয়াছে। মানভূমের আদিম অধিবাসী যেমন একান্ত মানভূমেরই সামগ্রী, তেমনই তাহার ভূস্তরের উপরে এই সকল বাঁধের ধারে, নদীতীরে, বৃক্ষশ্রেণীর উপরে, ঝোপে ঝাপে, কাননাভ্যন্তরে যে সকল পাখী দৃষ্টিগোচর হয়, তাহাদের মানভূমী আখ্যায় পরিচয় লাভ করিবার সময় মনে হয় যে, এই সকল কাওয়া-ঢেবচু-হোড়াল-পাঁড়কি-ক্যারক্যাটা-সাম্‌কাহাল-রূপো-কাঁড়োর-বনকুঁকড়ির পক্ষে এই প্রাকৃতিক আবেষ্টনই বিশেষ ভাবে অনুকূল; ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ হয় ত মানভূমেই থাকিবে, পার্শ্ববর্ত্তী সিংভূমে বা ছোটনাগপুরে থাকিতে চাহে না। অনুসন্ধিৎসু, বৃক্ষাদির উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে এই পক্ষিসংস্থানের ভিতরের কথা কতকটা বুঝিতে পারিবেন। ভূবিদ্যার সহিত উদ্ভিদ্‌তত্ত্বের ও বিহঙ্গ-বিদ্যার এতই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। তাই স্থানবিশেষে প্রাণিবিশেষের পর্য্যালোচনা করিতে বসিয়া এই সকল কথার অবতারণা বিজ্ঞান হিসাবে একেবারেই অপ্রাসঙ্গিক নহে; যিনি যে কোনও জেলার যে কোনও জীবের বিষয় বৈজ্ঞানিক আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবেন, তিনিই আমাদের জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধ করিয়া তুলিবেন; এই জন্য বিশেষজ্ঞের কাছে আমরা বহুল পরিমাণে ঋণী। পাখীর কথাই ধরা যাক্‌। মানভূমে যে সকল পাখী দেখা যায়, তাহাদের চলাফেরা, উড়াবসা কোনও নিয়মে শৃঙ্খলিত কি না; কোনও কোনও পাখী দিবাভাগে কোনও বিশেষ দিক্‌ হইতে উড়িয়া আসিয়া প্রত্যহ দিগন্তরে চলিয়া যায় কি না; এই নদী, বাঁধ, গাছ পাথর পরিবেষ্টনীর মধ্যে কোনও বিশিষ্ট পক্ষিজাতির অবস্থান তাহার জীবন-সংগ্রামের পক্ষে অনুকূল কি না এবং সিংভূম ছোটনাগপুরে ভূস্তরের পার্থক্য বশতঃ তাহাদের জীবনযাপনের উপযোগী বৃক্ষাদি বা জলাশয়ের অভাব আছে কি না, এই সকল সমস্যা সমাধানের চেষ্টা দেশ কাল পাত্র বুঝিয়া পক্ষিবিশেষজ্ঞ করিয়া থাকেন। এ কার্য্যে ব্রতী হইলে কোনও পাখীকেই বাদ দেওয়া চলিবে না। এমন অনেক পাখী আছে, যাহারা অন্যত্র অন্য আবেষ্টনের মধ্যে জীবন যাপন করে; কিন্তু তাই বলিয়া যদি মানভূমে তাহাদের কাহারও সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, তাহা বিজ্ঞান হিসাবে উপেক্ষণীয় নহে। পাশ্চাত্য পণ্ডিত অন্ততঃ তাঁহার Distribution কোঠায় দৃষ্ট বিহঙ্গকে আবদ্ধ করিয়া তৃপ্তি লাভ করিতে পারিবেন; উপরন্তু যদি তিনি লক্ষ্য করেন যে, যে পাখীকে অন্যত্র তিনি যাযাবর দেখিয়াছিলেন, এখানে সে স্থায়ী অধিবাসী, তাঁহার এই নূতন আবিষ্কৃত তথ্য তাঁহাকে যে আনন্দ দান করিবে, তাহার কথা না তুলিলেও ইহা অসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে যে, তিনি পক্ষিবিজ্ঞানকে পরিপুষ্ট করিয়া তুলিতেছেন।

মানভূম জেলার ভৌগোলিক অধিষ্ঠান মানচিত্রের ২২°৪৩′ ও ২৩°৪′ উত্তর অক্ষিমান্তর বা latitudeএর মধ্যে এবং ৮৫°৪৯′ ও ৮৬°৫৪′ পূর্ব্ব দ্রাঘিমান্তর বা longitudeএর মধ্যে। এই সামান্য ভৌগোলিক বৃত্তান্তটি পক্ষিতত্ত্ব হিসাবে নিতান্ত তুচ্ছ নহে। ঋতুবিশেষে এই অক্ষিমান্তর ও দ্রাঘিমান্তরের মধ্যে কোন্ কোন্ পাখী আনাগোনা করে, তাহাই প্রথমে অনুসন্ধানের এবং লক্ষ্য করিবার বিষয়। এই জেলার মধ্যে সুবর্ণরেখা, কাঁসাই, দামোদর, বরাকর প্রভৃতি বড় বড় নদীর গতিরেখা, ছোট ছোট হ্রদ এবং ছোট বড় পাহাড়, জলাভূমি, বন জঙ্গল, এই সমস্তই পক্ষি-

তত্ত্বানুসন্ধিৎসুর বিষয়ীভূত। তা ছাড়া ইহার চারি পার্শ্বে, এই লঘিমান্তর দ্রাঘিমান্তরের বাহিরে উত্তরে সাঁওতাল পরগণা ও হাজারিবাগ, দক্ষিণে সিংভূম, পূর্ব্বে বাঁকুড়া, বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর এবং পশ্চিমে রাঁচি ও হাজারিবাগ জেলাগুলিকে একেবারে বাদ দেওয়া চলিবে না। মানভূম জেলার পাখীর আনাগোনা আলোচনা করিতে বসিলে আশপাশের জেলাগুলি মানভূমের সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া পড়ে। এই মানভূম জেলার মাঝখানে পুরুলিয়া ২৩°২০′ উত্তর লঘিমান্তরের ও ৮৬°২২′ পূর্ব্ব দ্রাঘিমান্তরের মধ্যে অবস্থিত। কাজেই পুরুলিয়ার পাখীগুলির সহিত মানভূমের অন্তর্গত আশপাশের চারিদিকে গ্রাম নদী পাহাড় জঙ্গলের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। সুতরাং বিস্মিত হইলে চলিবে না, যদি মানভূম জেলার কাছাকাছি বাঙ্গালার অথবা ছোটনাগপুরের কোনও পাখীকে মানভূমের মধ্যে, তথা পুরুলিয়ায় দেখিতে পাওয়া যায়। পুরুলিয়ার পাখী বলিলে কেহ যেন মনে না করেন যে, পাখীটি কেবল পুরুলিয়াতেই দেখিতে পাওয়া যায়, মানভূমের অন্যত্র বা বাহিরে পাওয়া যায় না।

বায়স,
Corvus splendens

পাখীর তালিকায় প্রথমেই বায়সের নাম করিতে হয়। কাক ঘরে বাহিরে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অসতর্ক গৃহস্থের সযত্নরক্ষিত আহার্য্য দ্রব্যের প্রতি তাহার লোলুপ দৃষ্টি এবং নিঃশঙ্ক চৌর্য্যবৃত্তি সকলকে কিছু সন্ত্রস্ত করিয়া তোলে। ডুমরাকুড়ির মত অতি ক্ষুদ্র গণ্ডগ্রামেও ইহার ব্যতিক্রম দেখা গেল না। কিন্তু সেখানে কাকের অনুপাতে দাঁড়কাক বেশী বলিয়া বোধ হইল। তবে কাকের

C. macrorhynchus,
দাঁড়কাক

মত তাহাকে নির্ভীক বলিয়া মনে হইল না। লোকালয়ের কাছে আবর্জনার প্রতি তাহার লোভ বেশী।

সালিক,
Acridotheres tristis

আশ্বিনের মাঝামাঝি দেখা গেল যে, সালিকের গৃহস্থালী এবারকার মত শেষ হইয়া গিয়াছে, যদিও অনেক স্থলে শাবকগণ এখনও তাহাদের জনক জননীর সঙ্গ পরিত্যাগ করে নাই; মাঠের উপরে খাদ্যের জন্য তাহাদের জননীর অনুসরণ করিতেছে। ধাড়িগুলার পুরাতন পালক খসিয়া গিয়া এখনও নূতন পালক গজায় নাই; বুড়া সালিকের ঘাড়ে রোঁ চাক্ষুষ দেখা গেল, তবে এই রোঁ ঠিক রোম বা লোম নহে, মাথার ও ঘাড়ের অনাবৃত ত্বকে যে কালো কালো খোঁচার মত দেখা যায়, উহা নবীন পতত্রোদ্গমের পূর্ব্বাভাস। বটফল ও অন্যান্য খাদ্য সামগ্রী এ সময়ে প্রচুর; ইহারাও সংখ্যায় খুব বেশী। স্নিগ্ধ প্রভাতে ও প্রখর মধ্যাহ্নে নানা জ্ঞাতি-পরিজন-পরিবৃত হইয়া কল-কোলাহলে রাজপথ ও সাহেববাঁধ মুখরিত করিয়া তোলে। কার্ত্তিকের মাঝামাঝি দেখিতেছি, বুড়া সালিকের ঘাড়ে ঘন পতত্রোদ্গম হইয়াছে, মাথার রং বেশ কাল দাঁড়াইয়াছে; পুচ্ছ এখনও সম্পূর্ণ পরিণতি লাভ করে নাই, পুচ্ছের পালক এখনও ছোট বড়, পুচ্ছপ্রান্তে কোথাও কোথাও শ্বেতবর্ণ প্রকট।

গো-সালিক,
Sturnopastor contra

গো-সালিকের বাসা আশ্বিন মাসে অনেক গাছে দেখিতে পাওয়া গেল; সে সকল বাসা কিন্তু তখন পরিত্যক্ত। শাবকগুলির পালক বাহির হইয়াছে; তাহারা খুঁটিয়া খাইতে শিখিয়াছে; ভোজ্য কীটের অন্বেষণে গোময়পুরীষাদি ঘাঁটিতেছে। ইহাদের দেহের বর্ণ দেখিলেই ইহাদিগকে সহজে গো-

সালিকের শাবক বলিয়া চিনিতে পারা যাইতেছে,—রংটা মোটের উপর মেটে মেটে, অর্থাৎ ধাড়িগুলার মত সাদা রংটা পরিষ্কার সাদা নহে, কালোটাও খুব উজ্জ্বল নহে; ঠোঁট লাল্‌চে না হইয়া ঈষৎ কৃষ্ণাভ; আয়তনে ছোট। প্রধানতঃ কীটভুক্ হইলেও ফলভরাবনত অশ্বত্থ-বট-শাখায় দল বাঁধিয়া অন্যান্য জ্ঞাতি পরিজনের সহিত ফল ভক্ষণ করিতে ইহাদিগকে দেখা যাইতেছে। সংখ্যায় ইহারা এত বেশী যে, অতি প্রত্যুষেও ইহাদিগকে দলে দলে গাছের উপরে, মাঠে, সাহেব-বাঁধে বিচরণ করিতে দেখা যায়। এখানে বাঁধের সংখ্যা যেমন বেশী, তেমনই সেই সকল বাঁধের কাছাকাছি এই পাখীর সংখ্যাও খুব বেশী; তাহা ছাড়া অনেক নীচু জমি এখন জলাশয়ে পরিণত, সেগুলায় জলচর পাখী যেমন মাঝে মাঝে দেখা যায়, তার চেয়েও বেশী দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদের আশে পাশে বিচরণশীল গো-সালিক। অনেকে একত্র দলবদ্ধ হইয়া থাকাই ইহাদের স্বভাব; এত অধিক গো-সালিকের ঝাঁক পশ্চিম-বাঙ্গালায় এ সময়ে দেখিতে পাওয়া যায় না। সন্ধ্যায় প্রাক্‌কালে ইহারা ঝাঁকে ঝাঁকে উড়িয়া গিয়া যেখানে রাত্রি যাপন করে, সেই নির্দ্দিষ্ট বৃক্ষের শাখায় অবতরণ করে। মধ্যাহ্নে বিস্তৃত প্রান্তরের মাঝখান হইতে সহসা এক ঝাঁক গো-সালিক শূন্যে উড়িয়া কিয়দ্দূরে নামিয়া পড়ে, এরূপ দৃশ্য পথিকমাত্রেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ঝাল্‌দের ঘন জঙ্গলের মধ্যে কিন্তু ইহাকে দেখিতে পাইলাম না।

পাউই সালিকেরই জ্ঞাতি, Sturnidæ পরিবারভুক্ত। ইহাদের মাথা ও ঘাড়ের রং সাদাটে, বুক ও পেট লাল্‌চে; পিঠের রং ধূসর। ইহারাও দলবদ্ধ হইয়া বিচরণ করে। ইহাদিগের উড্ডীন গতির বেগ অপেক্ষাকৃত অধিক। কীটভুক্ হইলেও ইহারা বন্য ফল খাইতে বড় ভালবাসে; তাই ইহারা বড় বড় বট অশ্বত্থ বৃক্ষের পত্রান্তরালে অন্যান্য সালিকের সহিত অধিকক্ষণ যাপন করে। লোকালয়ে আসিতে ইহারা সঙ্কোচ বোধ করে; সেই জন্য ইহাদের অপরাপর জ্ঞাতিবর্গের ন্যায় ইহাদিগকে সর্ব্বত্র মাঠে ঘাটে সব সময়ে দেখিতে পাওয়া যায় না।

পাউই,
Sturnia malabarica

পুরুলিয়ায় কৃষ্ণশির পাউইকে অতি অল্পই দেখা যায়। লোকালয়ের মধ্যে, বাড়ীর প্রাঙ্গণে, বাগানের ঘাসের উপরে এই পাখীকে মাত্র দুই এক বার দেখিতে পাইলাম।

Temenuchus
pagodarum

গোলাপি সালিক ও গাংসালিক আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে কোথাও আমাদের চোখে পড়িল না, অথচ ঋতুবিশেষে গোলাপি পাখীটাকে সাহেববাঁধের দ্বীপে বহুল সংখ্যায় দেখা যায়; আর গাংসালিক বোধ করি এখানকার পাখী নহে।

Pastor roseus;
A. ginginianus

বঙ্গদেশে সাধারণতঃ যে কয়টা বুলবুল দেখিতে পাওয়া যায়, এখানে তাহাদের কোনওটাকেই দেখা গেল না। যে কালো বুলবুল পুরুলিয়ার পথের পার্শ্বে বাগানে ঝোঁপের ধারে বিচরণ করিতেছে, তাহাকে পর্য্যবেক্ষণ করিলে সহজেই একটা বর্ণবৈষম্য ও দেহায়তনের তারতম্য ধরা পড়ে।

কালো বুলবুল,
Molpastes
hæmorrhous

কালো রংটা মাথার উপর দিয়া পৃষ্ঠদেশ পর্য্যন্ত ব্যাপৃত না হইয়া স্কন্ধদেশেই থামিয়া গিয়াছে ; মোটের উপর পাখীটি তাহার বঙ্গীয় জাতির (M. bengalensis) চেয়ে কিছু কম কালো, আয়তনেও সে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র।

কাংড়া বুলবুলের (Otocompsa emeria) কথা মানভূমের প্রাকৃতিক বর্ণনার মধ্যে কেহ কেহ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, কিন্তু নগরে বা নগরোপান্তে অথবা ঝাল্‌দের পার্ব্বত্য প্রদেশে একটি কাংড়াও আমার নয়নগোচর হইল না। বুলবুল যাযাবর নহে ; স্থায়িভাবে স্থানবিশেষে ভারতবর্ষে অবস্থান করে। মানভূমের অধিবাসী হইলে তাহাকে নিশ্চিতই দেখিতে পাইবার কথা।

বাঙ্গালার পার্ব্বত্য অঞ্চলে যে জরদ্ বুলবুল (Otocompsa flaviventris) আমাদের চোখে পড়ে, মানভূমের পাহাড়তলী জায়গায় তাহার কোনও নিদর্শন পাওয়া গেল না ; যদিচ একজন মাত্র বিদেশীয় পক্ষিতত্ত্বজ্ঞের রচিত তালিকায় সে ঢোলভূমের পক্ষিগণভুক্ত হইয়াছে।

হল্‌দে পাখী

বাঙ্গালাদেশে প্রধানতঃ দুই প্রকার হল্‌দে পাখী আমাদের নিকটে পরিচিত,—(১) কৃষ্ণগোকুল (Oriolus melanocephalus), ইহার মাথা, ঘাড় ও গলা কৃষ্ণ-বর্ণ ; (২) কাজলগৌরী (Oriolus indicus), ইহার মাথার পিছনে অর্দ্ধবৃত্তাকার কৃষ্ণরেখা। প্রথমটি বাঙ্গালার স্থায়ী অধিবাসী ; দ্বিতীয়টি কিন্তু যাযাবর। শীত ঋতুতে তাহাকে কলিকাতার কাছাকাছি পল্লীমধ্যেও দেখিতে পাওয়া যায়। মানভূমে এই দুটিকে ত দেখিতে পাওয়া গেল ; তাহা ছাড়া আর একটি হল্‌দে পাখী দৃষ্ট হইল, উহার চোখের কোণে কালো রেখা, কিন্তু মাথাটা সম্পূর্ণ হল্‌দে। এই শেষোক্ত পক্ষীর বৈজ্ঞানিক অভিধা Oriolus kundoo ; সংখ্যায় ইহারা অপেক্ষাকৃত অধিক ; সমস্ত দিন বৃক্ষের পত্রান্তরালে ইহাদের কল কূজন শ্রুত হয় ; কণ্ঠস্বর যখন উচ্চ হইতে উচ্চতর হইতে থাকে, তখন লক্ষ্য করা যায় যে, পুংপক্ষীটা হয় ত স্ত্রীপক্ষীর পশ্চাদ্ধাবন করিতেছে, অথবা নিকটবর্ত্তী কোনও শাখায় বসিয়া তাহার মনোরঞ্জন করিতেছে।

পুরুলিয়ায় কৃষ্ণগোকুলের সংখ্যা কম বলিয়া মনে হইল, যদিচ ছোটনাগপুর অঞ্চলে তাহার প্রাচুর্য্যের কথা কোনও কোনও বিদেশীয় পক্ষিবিৎ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। কাজল-গৌরী পুরুলিয়ায় নেহাৎ কম নহে ; অথচ একজন ইংরাজ মানভূমের কোথাও ইহার দেখা পান নাই, রাজমহল পাহাড়ে দুই একটা দেখিয়াছেন মাত্র। এমন কি, তদানীন্তন ছোটনাগপুরের কোথাও ইহার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় নাই, এইরূপ লিখিয়া গিয়াছেন। বলা বাহুল্য, মানভূম তখন ছোটনাগপুরের অন্তর্গত ছিল।

মাছরাঙা,
Halcyon smyrnensis

মানভূম অঞ্চলে মাছরাঙার চালচলনে কিছুমাত্র ব্যতিক্রম নাই, ঠিক বঙ্গদেশের মত জলাশয়ের ধারে ভক্ষ্য জীবের অপেক্ষায় গাছের উপর বসিয়া থাকিতে অথবা মৎস্য ধরিবার চেষ্টায় জলে ঝাঁপ দিতে দেখা যায় ; কখনও বা ভূমির উপরে সঞ্চরমান কৃমিকীট দেখিয়া হয় ত সে গাছ হইতে সহসা অবতরণ করে, অথবা কণ্ঠস্বরে দিগন্ত ধ্বনিত করিয়া বন্ধুর প্রান্তরের উপর দিয়া কোথায় অদৃশ্য হইয়া যায়।

'সাহেববাঁধ' এবং অন্যান্য জলাশয়ের ধারে মাছরাঙার একটা ক্ষুদ্রকায় জাতিকে মৎস্য শিকার করিতে দেখা যায়। বড় মাছরাঙার মত কৃমিকীট ভক্ষণ করা ইহার অভ্যাস নহে, কেবলমাত্র মৎস্যই ইহার ভক্ষ্য; এই জন্যই বোধ করি, ইহাকে বাঁধের ধারে ভূমির উপর অথবা অনতিউচ্চ গাছের ডাল হইতে অব্যর্থ সন্ধানে জলমধ্যে ছোট ছোট মাছ ধরিবার চেষ্টায় ব্যাপৃত থাকিতে দেখা যায়।

মাছরাঙা, ছোট
Alcedo ispida

বড় মাছরাঙার মৎস্যশিকার চেষ্টা হাস্যকর; গাছের উচ্চ ডাল হইতে সবেগে বার বার জলমধ্যে পতিত হইয়াও সে প্রায় একটিও মাছ চঞ্চুপুটে ধরিতে সমর্থ হয় না; তাহার এই ছোট জাতিটি কিন্তু প্রতিবারই কিছু না কিছু ধরিয়া আনে। কৃমিভুক্ না হইলে বড়টির জীবন ধারণ করা কঠিন হইত; আর এমন অব্যর্থ সন্ধান না থাকিলে ছোটটিও জীবন-সমরে পরাজিত হইত। বর্ণে ও কণ্ঠস্বরে উভয়েই আমাদিগকে আকৃষ্ট করে, তবে ছোটটির কণ্ঠস্বর বড়টির মত তীব্র নহে। এই ছোট মাছরাঙার একটি অত্যন্ত নিকট জাতিকে মানভূমের জঙ্গলে জলাশয়ের ধারে কখনও কখনও মৎস্য শিকার কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতে দেখা যায়। এই দুটির মধ্যে আকৃতি ও স্বভাবের বৈলক্ষণ্য বড় বেশী নাই।

Alcedo beavani

ক্রমশঃ

শ্রীসত্যচরণ লাহা

কবি সৈয়দ আলাওলের পদ্মাবতী *

সৈয়দ আলাওল প্রাচীন বাঙ্গালা মুসলমান-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি বলিলে যথেষ্ট হইবে না। বাস্তবিক তিনি বঙ্গীয়-সাহিত্যে হিন্দু-কবিদের সহিত তুলনায়ও একজন উচ্চপদস্থ কবি ছিলেন বলিতে হইবে। তাঁহার স্থান ভারতচন্দ্র অপেক্ষা কিছুতেই হীন নহে। শ্রদ্ধেয় দীনেশবাবু তাঁহাকে বঙ্গীয় পাঠক-সমাজে সুপরিচিত করিয়াছেন। তাঁহার পদ্মাবতী সাদরে চট্টগ্রামে আজও পঠিত হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ইহার একমাত্র বাজার-সংস্করণ এত ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ যে, তাহা হইতে বহু স্থানে পুস্তকের অর্থবোধ করা যায় না। পণ্ডিত আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ সাহেব অনেক প্রাচীন হিন্দু কবির কাব্যের উদ্ধার করিয়াছেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের এবং ক্ষোভের বিষয় যে, তিনি তাঁহার স্বদেশীয় ও স্বধর্ম্মী এই কবির প্রতি আজও বিমুখ রহিয়াছেন।

বাজার-সংস্করণে পদ্মাবতীর কি দুরবস্থা হইয়াছে, তাহার কয়েকটী নমুনা দিতেছি। প্রথম পৃষ্ঠায়ই দেখিতেছি,—

প্রথমে প্রনাম করি এক করত্তার ॥
জেই প্রভু জিবদানে স্থাপিল সংসার *
করিল পর্ব্বত আদি যোতির প্রকাশ ॥
তার পরে প্রকটিল সেই কবিলাস *

দীনেশবাবু বঙ্গসাহিত্য-পরিচয়ে (১৩০৭ পৃষ্ঠা হইতে ১৩২৩ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত) আলাওলের যে অংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাতে আছে,—

প্রথমে প্রণাম করি এক করতার।
যেই প্রভু জীবদানে স্থাপিল সংসার ॥
করিল পর্ব্বত আদি জ্যোতির প্রকাশ।
তার পরে প্রকটিল সেই কবি-লাস ॥

উদ্ধৃত অংশে দীনেশবাবু বাজারের পুথির কেবল বানান সংশোধন করিয়াছেন; কিন্তু প্রকৃত পাঠ উদ্ধার করিতে পারেন নাই। "পর্ব্বত আদি জ্যোতির" কোন অর্থ হয় না। পাদটীকায় কবি-লাস শব্দের অর্থে তিনি বলিতেছেন,—"কবির লাস অর্থাৎ আদিকবির (ব্রহ্মার) ইচ্ছা।" এই অর্থ সুসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। বাজার-সংস্করণ হিন্দী পদ্মাবতীতে আছে,—

কীন্হেসি প্রথম জ্যোতি পরকাশূ।
কীন্হেসি তিনহি প্রীতি কৈলাশূ ॥ †

---

* ১৩৩১ সালের বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের নবম মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

† Asiatic Society of Bengal এর সংস্করণ পদ্মাবতির পাঠ,—

কীন্হেসি প্রথম জোতি পরগাসু।
কীন্হেসি তেহি পরবত কবিলাসু ॥

অর্থাৎ তিনি প্রথম জ্যোতি প্রকাশ করিলেন। (পরে) তাঁহার প্রীতিতে কৈলাশ করিলেন। এখানে কৈলাশ শব্দের অর্থ স্বর্গলোক। এখানে দরবেশ মলিক মুহম্মদ জায়সী ইস্‌লাম শাস্ত্র অনুযায়ী সৃষ্টি বর্ণনা করিতেছেন। এই মতে আল্লাহ্‌ তা'আলা প্রথম আদি জ্যোতিঃ (নূরে মুহম্মদী) সৃষ্টি করেন। পরে তাঁহার প্রীতির জন্য বিশ্বভুবন সৃষ্টি করেন। অন্য স্থানে হযরতের গুণ বর্ণনায় কবি বলিয়াছেন,—

কীন্হেসি পুরুখ এক নিরমরা
নাউঁ মুহম্মদ পুনিউঁ করা॥
প্রথম জোতি বিধি তেহি কই সাজী।
অউ তেহি প্রীতি সিসিটি উপরাজী॥

A. S. B. সংস্করণ, ১৪ পৃঃ।

এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া মনে হয়, বিশুদ্ধ পাঠ নিম্নলিখিতরূপ ছিল,—

করিল প্রথমে আদি-জ্যোতির প্রকাশ।
তার পরে প্রকটিল যেই কবিলাশ॥

ইহার অর্থে বলা হইয়াছে—জিস নে পহিলে জ্যোতিঃস্বরূপ (মহাদেব)কো প্রকাশ কিয়া ঔর উসকে লিয়ে কৈলাস পর্ব্বতকো কিয়া। (মসল্যানোঁ মেঁ কহাবত হৈ কি হিংদুওঁকা মহাদেব হমারে লোগোঁকা আদম হৈ)॥ এখানে কবিলাস=কৈলাশকে মহাদেবের কৈলাশ মনে করায় ভ্রম হইয়াছে। গ্রন্থকার বহু স্থানে কবিলাস স্বর্গ অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন; যথা,—

সাত সহস হসতী সিংঘলী॥
জনু কবিলাস ইরাবতী বলী॥ A. S. B. সংস্করণ, ৩৯ পৃঃ।

অর্থাৎ সিংহল দেশে সাত সহস্র হস্তী, যেন স্বর্গে (=কবিলাস) বলী ঐরাবত।

ঊঁচী পবঁরী ঊচ অবাসা।
জনু কবিলাস ইঁদর কর বাসা॥ ঐ সংস্করণ, ৫৫ পৃঃ।

অর্থাৎ উঁচু দেউড়ী, উঁচু আবাস, যেন ইন্দ্রের বাসস্থান স্বর্গ (=কবিলাস)।

কংচন বিরিখ এক তেহি পাসা।
জস কলপতরু ইঁদর কবিলাসা॥ ঐ সংস্করণ, ৬৬ পৃঃ।

অর্থাৎ তার পাশে এক কাঞ্চন বৃক্ষ, যেমন ইন্দ্রের স্বর্গে (=কবিলাস) কল্পতরু।

বরনউঁ রাজ মঁদির রনিবাসূ।
অছরিন ভরা জানু কবিলাসূ॥ ঐ সংস্করণ, ৭৫ পৃঃ।

অর্থাৎ রাজমন্দির রাণী-নিবাস বর্ণন করি। সেগুলি যেন অপ্সরা-ভরা স্বর্গ (=কবিলাস)। ইত্যাদি বহু স্থানে। A. S. B. সংস্করণের অবলম্বিত দুইখানি পুথিতে 'পরবস্ত' স্থানে 'প্রীতি' আছে। তাহাই শুদ্ধ পাঠ। প্রথম জ্যোতি হযরত মুহম্মদ, মহাদেব নহেন। মহাদেব যে আদম, এ কথা মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত নাই। আমি যে অর্থ দিয়াছি, তাহা গ্রন্থকারের অন্য শ্লোক দ্বারা সমর্থিত।—লেখক।

পুথির দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় আছে,—

কাকে কল্য নির্ব্বলি কাহাকে বলি আর ॥
হাড় হস্তে নিম্মিয়া করায় পুনি হাড় *

দীনেশ বাবুর সংশোধিত পাঠ,—

কাকে কল্য নির্ব্বলী কাহাকে বলী আর।
হাড় হস্তে নির্ম্মিয়া করয় পুনি হাড় ॥

তিনি পাদটীকায় লিখিতেছেন,—অস্থি হইতে নির্ম্মাণ করিয়া পুনরায় অস্থিতে পরিণত করেন। এখানে অর্থের সঙ্গতি হইতেছে না। হিন্দী পুস্তকে আছে,—

কীন্হেসি কোই নিভরোসী, কীন্হেসি কোই বরিআর।
ছারহি তেঁই সব কীন্হেসি, পুনি কীন্হেসি সব ছার॥

—A. S. B. সংস্করণ, ৫ পৃঃ।

অর্থাৎ কাহাকে দুর্ব্বল (নিভরোসী) করিলেন, কাহাকে বলবান্ করিলেন। ধূলি (ছার) হইতে সব তিনি করেন, পুনরায় সকলকে তিনি ধূলি করেন। বিশুদ্ধ পাঠ এইরূপ হইবে,—

কাকে কৈল নির্ব্বলী, কাহাকে বলী আর।
ছার হস্তে নির্ম্মিয়া করয় পুনি ছার॥

পুথির চতুর্থ পৃষ্ঠায় আছে,—

অনেক অপার অতি প্রভুর করণ ॥
কহিতে অপূর্ব্ব কথা না যায় বর্ণন *
সপ্ত মহি সপ্ত স্বর্গ বৃক্ষপাত মত ॥
সপ্ত সুন্ন তরী যদি সৃজয় বেকত *
এ সপ্ত সাগর আদি জতো নদা নদী ॥
দিঘী পুষ্কর্ণি কুপ স্বাহি হয় যদি *
জতো বিধী নবগৃহ আর বৃক্ষ সাখা ॥
যত লোমা বলি আর জতো পক্ষি পাখা *
পৃথিবীর জতো রেনু স্বর্গে জতো তারা ॥
জিব বস্ত স্বাস আর বরীখের ধারা *
জোগে জোগে বসী জদী অন্তত লেখয়।
সহস্র ভাগের এক ভাগ নাহী হয় *

দীনেশবাবু ইহার কিছু অংশ (সম্ভবতঃ অবোধ্য বিবেচনায়) বর্জ্জন করিয়া নিম্নলিখিতরূপে উদ্ধৃত করিয়াছেন,—

অনেক অপার অতি প্রভুর করণ।
কহিতে অকথ্য কথা না যায় বর্ণন॥
সপ্ত মহী সপ্ত স্বর্গ বৃক্ষপত্র যত।
সপ্ত শূন্য ভরি যদি সৃজয় জগাত॥
যতবিধ নবগৃহ আর বৃক্ষ-শাখা।
যত লোমাবলী আর যত পক্ষী-পাখা॥
পৃথিবীর যত রেণু স্বর্গে যত তারা।
জীব জন্তু শ্বাস আর বরিষার ধারা॥
যুগে যুগে বসি যদি স্মৃতিএ লেখয়।
সহস্র ভাগের এক ভাগ নাহি হয়॥

মূল হিন্দীতে আছে,—

অতি অপার করতাকর করনা।
বরনি ন পারই কাহু বরনা॥
সাত সরগ জউঁ কাগদ করঈ।
ধরতী সাত সমুদ মসি ভরঈ॥
জাবঁত জগত সাখ বন ঢাঁখা।
জাবঁত কেস রোবঁ পঁখি পাঁখা॥
জাবঁত খেহ রেহ জহঁ তাহঁ।*
মেঘ বূঁদ অউ গগন তরাঈঁ॥
সব লিখনী কই লিখু সংসারূ।
লিখি ন জাই গতি সমুদ অপারূ॥　A. S. B. সংস্করণ, ১৩ পৃঃ।

অর্থাৎ কর্ত্তার কার্য্য অতি অপার। কে তাহা বর্ণন করিতে পারে? যদি সাত স্বর্গ কাগজ হয় (এবং) ধরিত্রীর সাত সমুদ্র মসী ভরা হয়, (আর) যত জগতের শাখা, বন জঙ্গল, যত কেশ, লোম, পক্ষি-পাখা, যত মাটি বালি, বৃষ্টি-বিন্দু আর গগনের তারা, সব লেখনী করিয়া সংসার লিখিতে থাকে, (তবুও) অপার সমুদ্রের ন্যায় (তাঁহার) গতি লিখা যায় না।

পুথির বিশুদ্ধ পাঠ সম্ভবতঃ এইরূপ ছিল,—

অনেক অপার অতি প্রভুর করণ।
কহিতে অপূর্ব্ব কথা না যায় বর্ণন॥
সপ্ত মহী সপ্ত স্বর্গ বৃক্ষপত্র যত।
সপ্তশূন্য ভরি যদি সৃজয় কাগত॥

---

* বাজার সংস্করণে 'জহঁ তাহঁ' স্থানে 'ভুনয়াঈ'। A. S. B. সংস্করণের কয়েকটী মূল পুথিতে 'ভুমিয়াঈ' পাঠ আছে। তাহাই মূলের শুদ্ধ পাঠ বলিয়া মনে হয়।—লেখক।

এ সপ্ত সাগর আঁদি যত নদ নদী।
দীঘি পুষ্করিণী কূপ মসী হয় যদি ॥
যতবিধ বন গৃহ আর বৃক্ষ-শাখা।
যত লোমাবলী আর যত পক্ষী-পাখা ॥
পৃথিবীর যত রেণু স্বর্গে যত তারা।
জীব জন্তু শ্বাস আর বরিষার ধারা ॥
যুগে যুগে বসি যদি অস্তুতি লেখয়।
সহস্র ভাগের এক ভাগ নাহি হয় ॥

স্তুতি স্থানে হিন্দী অস্তুতি। এই বর্ণনা কুর্‌আন শরীফের নিম্নলিখিত আয়ত দুইটীর প্রতিধ্বনি,—"এবং পৃথিবীতে যে সকল বৃক্ষ আছে, যদি তাহা লেখনী হয় ও সাগর তাহার মসী হয়, তাহার পরে (অন্য) সপ্ত সাগর হয়, তথাপি আল্লার কথা সমাপ্ত হইবে না, নিশ্চয় আল্লাহ বিজেতা ও বিজ্ঞানময়।" (সূরাহ লুক্‌মান)। "তুমি বল যে আমার প্রতিপালকের বচনাবলী (লিপির) জন্য যদি সাগর মসী হয়, এবং যদিচ আমরা তৎসদৃশ সাহায্য আনয়ন করি, আমার প্রতিপালকের বচনাবলী সমাপ্ত হওয়ার পূর্ব্বে অবশ্য সমুদ্র সমাপ্ত হইবে।" (সূরাহ কহফ)।

পুথির অষ্টম পৃষ্ঠায় আছে,—

ললাট উজ্জল শশি পিউ সবরিসে হাঁসি,
কটাক্ষে মুহিত জবাকুল।

বিশুদ্ধ পাঠ হইবে,—

ললাট উজ্জ্বল শশী, পীযূষ বরিষে হাসি,
কটাক্ষে মোহিত যুবাকুল।

হায় রে! কোথায় যুবাকুল, আর কোথায় জবাকুল! পরবর্ত্তী সংস্কারক হয় ত জবাফুল করিয়া ফেলিবেন।

পুথির ১৯ পৃষ্ঠায় আছে,—

হিন্দুস্থানি ভাবে দীপ নাম এহি বলি ॥
জম্বো দিপ পক্ষ আর সক্লেশ শুস্থলি *
কুস দিপ এঞ্চু দিপ সপ্তম কহিল ॥
পুস্পের দরিয়া দিপ সপ্তমে পুরিল *

এখানে কবি সপ্ত দ্বীপের বর্ণনা করিতেছেন। কিন্তু তাহাদের নামগুলি কি চমৎকার মৌলিক! বিশুদ্ধ পাঠ এইরূপ হইবে,—

হিন্দুস্থানী ভাষে দ্বীপ-নাম এহি বলি।
জম্বুদ্বীপ প্লক্ষ আর শাক ও শাল্মলি ॥

কুশদ্বীপ ক্রৌঞ্চদ্বীপ ষষ্টম কহিল।
পুষ্কর বলিয়া দ্বীপ সপ্তমে পুরিল॥

অজ্ঞ লিপিকরের হাতে আজ সৈয়দ আলাওলের কি দুর্দ্দশা হইয়াছে! মূল হিন্দীর সহিত মিলাইয়া এবং অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া অনেক স্থলে বিশুদ্ধ পাঠ উদ্ধার করা যায়, সন্দেহ নাই। কিন্তু অনেক স্থল এরূপ আছে, যেখানে প্রাচীন পুথি ব্যতীত প্রকৃত পাঠ নির্ণয় করা একেবারে অসম্ভব। দু-একটী দৃষ্টান্ত দিতেছি। বাজারের পুথির ১০ম পৃষ্ঠায় আছে,—

নানা দেসে নানা লোগ, সুনিয়া রোসাঙ্গ ভোগ;
আইসেন্ত নৃপ ছায়াতল। আরবি মিসীর স্বামি,
তুরুকী হাবেসী রুমি, খোরাসানি উজ্বেগ সকল*
লাহুরী মুলতানী সিন্দি, কাসমিরী দক্ষিনী হিন্দী,
কামরোপি আর বঙ্গদেশি॥ **অহুপিহ**
খুতঞ্চারি; **কান্নাই** ময়লা বারি, **আচ্ছন্দরী**
কর্ণাঠ **কবাসি*** বহু সেখ সৈএদজাদা,
মোগল পাঠান জুদ্ধা, রাজপুত্র হিন্দু নানাজাতি॥
অভাসি করমা স্বাম, ত্রিপুরা কুকির নাম,
কতেক কহিব তাতি ২* আরমানি অলওাজ,
ডিনমার ইংরাজ, **কাণ্টিমান** আর ফ্রান্সিস॥
কামরিভ কাসমানি, চোলদার নসরানী, নানা
জাতি আর **প্রস্তংক্ষেচ***

এই উদ্ধৃত অংশের চিহ্নিত শব্দগুলির প্রকৃত পাঠ স্থির করা দুরূহ। পুথির ৯ পৃষ্ঠায় রোসাঙ্গ-রাজের নৌকার বর্ণনায় কবি বলিতেছেন,—

নানাবর্ণ নৌকা সাজে, নাহি শম ক্ষেতি মাজে,
গল্লিয়া অগন ডিঙ্গা রঙ্গে॥ সমুপা নানান
তাতি, মচুয়া গোরাপ পাতি, জালিয়া নায়রি
নানা রঙ্গে* কোসদা আহুতি ভাল, ফেরাঙ্গির
বজ্রসাল, সাতাইস দাবলা সিংসার। **শুন্দর**
খেলন রঙ্গি; পিক সব সরি ভঙ্গি, মগদের
নানা বর্ণ আর*

এখানেও সব কথার অর্থবোধ হয় না। কিন্তু প্রাচীন বিশুদ্ধ পুথি ব্যতীত ভ্রান্ত পাঠ সংশোধনের উপায় কি? বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পুথিশালায় আলাওলের কোন হস্তলিখিত পুথি নাই। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে একখানি আধুনিক হস্তলিখিত পুথি আছে। কিন্তু তাহা বিশুদ্ধ নহে। পণ্ডিত আবদুল করিম সাহেবের নিকট কয়েকখানি প্রাচীন পুথি আছে এবং তিনি

একটী আদর্শ সংস্করণ প্রস্তুত করিতে বহু দিন হইতে ইচ্ছুক আছেন জানি। কিন্তু তাঁহার কার্য্য-বাহুল্য। কয়েকখানি প্রাচীন বিশুদ্ধ পুথি পাইলে আমি এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারি। আশা করি, চট্টগ্রামের বিদ্যোৎসাহী মহোদয়গণ, বিশেষতঃ বন্ধুবর আবদুল করিম সাহেব এ বিষয়ে সাহায্য করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না। কবে বাঙ্গালী মুসলমানের গৌরব এই কবিরত্নের কাব্যের উদ্ধার হইবে, তাহার জন্য উদগ্রীব হইয়া রহিলাম।

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্

"বাঙ্গালা ভাষায় অনুজ্ঞা" প্রবন্ধ সম্বন্ধে মন্তব্য *

বন্ধুবর শ্রীযুক্ত মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ মহাশয় বাঙ্গলা¹ ভাষায় অনুজ্ঞার রূপের যে উৎপত্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে দুই চারিটী বিষয়ে আমি তাঁহার সহিত একমত হইতে পারিতেছি না।

সাধারণ অনুজ্ঞা (বা বর্ত্তমান কালের অনুজ্ঞা) মধ্যম পুরুষের রূপের যে উৎপত্তি নির্ণয় তিনি করিয়াছেন (যেমন 'চর্, চর' < 'চর, চরহ' < 'চর, চরথ+চরত'), সে বিষয়ে কিছু বক্তব্য নাই। প্রথম পুরুষের সম্বন্ধে খালি এইটুকু বলা আবশ্যক মনে করি যে, প্রথম পুরুষের বহুবচনে (=আধুনিক সম্ভ্রমসূচক প্রথম ও মধ্যম পুরুষে) যে 'উন্' প্রত্যয় বাঙ্গলায় আমরা পাই ('চরুন' ='চর্+উন'), তাহা মূলে আদি-আর্য্যভাষার (সংস্কৃতের) '-অন্ত' প্রত্যয় হইতে উদ্ভূত হইলেও ইহার বিকাশ স্বাভাবিক ভাবে হয় নাই; সংস্কৃত 'ন্ত' বাঙ্গলায় হয় ''ত'-তে, নয় কেবল 'ত'য়ে পরিণত হইয়া থাকে (যেমন 'দন্ত > দাঁত', 'ত্বরন্ত-> তুরিৎ', 'চলন্ত-> চলিত', 'গৃহ+অন্ত < ঘরত'[=ঘরে], 'অন্তরে > তরে' [৪র্থীতে], ইত্যাদি), 'ন'-য়ে নহে। 'চলন্তি > চলেন, চলন্ত > চলুন'—এখানে 'ন্ত'র 'ন'য়ে পরিণতি হইল কিরূপে? এই 'ন' হইতেছে বিশেষ্য পদের বহুবচন-দ্যোতক প্রত্যয়ের প্রভাবে; সংস্কৃতের ষষ্ঠীর বহুবচনে যে '-আনাম্' প্রত্যয় পাওয়া যায়, প্রাকৃতে তাহা '-আনং, -আন, -আণং, -আণ, -ন,-ণ' রূপে মেলে; এবং এই '-ন, -ণ' আধুনিক আর্য্যভাষায় বহু স্থলে প্রথমা ও অন্যান্য বিভক্তিরও বহুবচনের প্রত্যয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে (যেমন ব্রজভাষায় 'বোরন, ঘোড়ন', পূর্ব্বী হিন্দীতে 'ঘোড়ন', মৈথিলীতে 'ঘোড়নি' ইত্যাদি)। বাঙ্গলায়ও এই বহুবচনের '-ন' বিদ্যমান ছিল, এবং '-গুলা-ন্', প্রাদেশিক 'গুলাইঁ, লোকাইঁ,

---

* ১৩৩১ সাল ১লা চৈত্র বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের একত্রিংশ বর্ষের নবম মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

১। শ্রীযুক্ত শহীদুল্লাহ্ 'বাঙ্গলা' এইরূপ বানান সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, ইহা না বুৎপত্তিসঙ্গত, না উচ্চারণসঙ্গত; তিনি 'বাংলা' এইরূপ বানানের পক্ষপাতী। 'বঙ্গাল' > 'বাঙ্গাল, বাঙাল'; 'বঙ্গাল+আ' > 'বাঙ্গালা' > আধুনিক 'বাঙ্গ্লা, বাঙ্লা'; 'ঙ্গ' হইতে 'গ' এর লোপে 'ঙ্' উচ্চারণ, এবং আদ্য অক্ষরে স্বরাঘাত বলিষ্ঠ হওয়ায় মধ্যস্থিত অক্ষরের 'আ'-কারের লোপ। 'ঙ্গ'এর দুই প্রকার উচ্চারণ বঙ্গভাষায় বিদ্যমান; [১] 'ঙ্গ', [২] 'ঙ'; 'বাঙ্গালা' > 'বা'ঙ্গ্লা', এই বানান ব্যুৎপত্তি ও আধুনিক উচ্চারণ, উভয়েরই অনুগামী। সংস্কৃতে অনুস্বারের উচ্চারণ ছিল, যে স্বরের পরে অনুস্বারের প্রয়োগ হইত, সেই স্বরের অনুনাসিক প্রলম্বীকরণরূপে; 'অং'='অঅঁ', 'ইং'='ইইঁ', 'উং'='উউঁ' ইত্যাদি। এইরূপ উচ্চারণ প্রাকৃতেও ছিল; এবং আধুনিক ভারতীয় আর্য্য-ভাষায় তদ্ভব শব্দাবলীতে অনুস্বার অনুনাসিকরূপেই পর্য্যবসিত হইয়াছে; যেমন 'করণকম্, করণকং' > 'করণয়ং' > মারহাট্টী 'করণেঁ'; 'চলিতব্যকং' > 'চলিঅব্বউং' < গুজরাটী 'চলবুঁ'। আধুনিক যুগের সংস্কৃত উচ্চারণে ও তৎসম শব্দের উচ্চারণে ভারতের নানা প্রদেশে অনুস্বারের প্রাচীন উচ্চারণ আর রক্ষিত নাই, নানা বিশিষ্ট নাসিক্য ধ্বনিতে ইহার বিকার ঘটিয়া গিয়াছে। যেমন দক্ষিণ-ভারতে 'ং'='ম্', 'হংসঃ'='হম্সঃ'; বঙ্গদেশে 'ং'='ঙ্', 'হংসঃ'='হঙ্শঃ', 'সংস্কৃতম্'='শঙ্শ্ক্রিতম্'; উত্তর-ভারতে 'ং'='ন্', 'হংসঃ, বংশঃ'='হন্স্, বন্স্', ইত্যাদি। সুতরাং 'বাঙ্গলা, বাঙ্লা' কে 'বাংলা' (অর্থাৎ কিনা 'বাঅঁলা') লিখিলে, অনুস্বারের সংস্কৃত উচ্চারণ ধরিলে এই বানানকেই অশুদ্ধ বলিতে হয়।

লোকাইন্' প্রভৃতিরূপে এই 'ন'কারের অস্তিত্ব আছে[১]। '-ন্ত, -ন্তু'র 'ন'য়ে পরিবর্ত্তনে এই বিশেষ্য পদের '-ন'-কারের প্রভাব আছে বলিয়া মনে হয়। মারহাট্টী 'চরোৎ, চরুৎ-তে' দেখা যাইতেছে যে, '-ন্তু'র 'ওৎ, উৎ' -তে স্বাভাবিক নিয়ম অনুসারেই পরিবর্ত্তন হইয়াছে।

ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞার উৎপত্তি শ্রীযুক্ত শহীদুল্লাহ এইরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন :—

	উত্তম পুরুষ		মধ্যম পুরুষ		প্রথম পুরুষ	
	একবচনে	বহুবচনে	একবচনে	বহুবচনে	একবচনে	বহুবচনে
সংস্কৃত	চরিষ্যামি	চরিষ্যামঃ	চরিষ্যসি	চরিষ্যথ	চরিষ্যতি	চরিষ্যন্তি
বাঙ্গলা	চরিউ, চরিউ	চরিমো	*চরিসি	চরিহ	চরিহে, চরিএ	×

ইহার মধ্যে মধ্যম পুরুষ ও প্রথম পুরুষের রূপের উৎপত্তি লইয়া আমার ঐকমত্য আছে। যদিও 'চরিএ'র মত 'হ'-কার-বিহীন '-ইএ' যুক্ত পদকে আমার মূলে কর্ম্ম-বাচ্যের পদ বলিয়াই মনে হয়—এক 'হ'কারযুক্ত রূপকেই ভবিষ্যতের রূপ বলিয়া আমি নিঃসঙ্কোচে গ্রহণ করিতে পারি। (এ সম্বন্ধে বিচার ১৩৩০ সালের বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় মৎপ্রণীত 'বাঙ্গলাভাষায় কর্ম্ম- ও ভাব-বাচ্যের ক্রিয়া' শীর্ষক প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য—পৃঃ ৫৭ প্রভৃতি)।

কিন্তু উত্তম পুরুষের 'চরিমো, চরিউ, চরিউ' এই পদগুলি যে সংস্কৃত 'চরিষ্যামি', চরিষ্যামঃ' হইতে হইয়াছে, তাহা আমি স্বীকার করিতে পারি না। 'চরিমো, চরিউ' এইরূপ 'মো' ও 'ইউ' প্রত্যয় দুইটীর, একটির সহিত আর একটীর একবচন-বহুবচন সম্পর্ক বা অর্থগত সাদৃশ্য কিছু দেখিতে পাওয়া যায় না। বাঙ্গলা ভাষায় চর্য্যাপদের যুগ হইতেই ক্রিয়ার একবচন ও বহুবচনের পার্থক্য বিলুপ্ত হইয়া যায়, সুতরাং কেবল এ ক্ষেত্রে এই পার্থক্য বিদ্যমান থাকা একটু অস্বাভাবিক। অপর, 'মো' বা 'ইমো' প্রত্যয়ান্ত রূপ শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে দুষ্প্রাপ্য—শ্রীযুক্ত শহীদুল্লাহের উদ্ধৃত এক 'বঞ্চিমো' (শ্রীকৃ-কীঃ, পৃঃ ৩৮৭) ছাড়া অন্যত্র অপ্রাপ্য বলিলেই হয়। অন্যান্য ক্রিয়ার উত্তম পুরুষে 'ইবোঁ' প্রত্যয়ই পাওয়া যাইতেছে—'করিবোঁ, জাগিবোঁ, খাইবোঁ', ইত্যাদি। (এই 'ইবোঁ'র উৎপত্তি এইরূপ : '-ইতব্য' <'ইঅব্‌ব' <'ইব্‌ব' <'ইব', +'হোঁ' <'হউ', হাঁউ' <'হৰ্ঁ' <'হউং' <হকং <'অহকং' <'অহং' : 'চলিতব্য (ক)+অহ(ক)ম্' <'চলিব(া)+হোঁ' > 'চলিবাহোঁ, চলিবহোঁ, চলিবোঁ'।) 'বঞ্চিমো' পদ 'বঞ্চিবোঁ'র বিকারেই উদ্ভূত। শ্রীযুক্ত শহীদুল্লাহ্ 'ইষ্যামঃ—ইষ্যামি'

১। শ্রীযুক্ত শহীদুল্লাহ্ আধুনিক বাঙ্গলার 'তিনি' পদকে সংস্কৃত ক্লীবলিঙ্গ বহুবচন 'তানি' হইতে আগত বলিয়া ধরিয়াছেন। কিন্তু 'তানি' কিছুতেই 'তিনি'র মূল হইতে পারে না; 'তিনি' প্রা° বা° তে 'তিহঁ, তেহঁ' রূপে মেলে; 'তেহঁ, তিহঁ' = 'তেন্‌হ, তিন্‌হ' = '*তেন, তেন°,' = 'তাণং' (> প্রাদেশিক বাঙ্গলা 'তান' = তাঁহার) = '*তানাম্,' 'তেষাম্' স্থলে; 'তেহঁ, তিন্‌হ, তেন, তান' প্রভৃতি মূলে এই 'ন'কারযুক্ত ষষ্ঠীর বহুবচনের রূপ; 'তেহঁ, তেন' পদে 'ই' প্রত্যয়, (যাহার মূল হইতেছে তৃতীয়ার "'এভিঃ > -এহি > -হি' প্রত্যয়) যোগ করিয়া '*তেঁহি, তেনি > তিনি'র উৎপত্তি। সংস্কৃত শব্দের অন্ত্য স্বর বাঙ্গলায় প্রায় সর্ব্বত্রই লুপ্ত; যেখানে লোপ হয় নাই, সেখানে বিশেষ কারণ আছে, এবং সে কারণগুলির একটিও 'তানি'র মতো পদকে বাঙ্গালায় ই-কারান্ত করিয়া রাখিবার পক্ষে সমর্থক নহে।

হইতে যথাক্রমে 'ইমো— ইউ' প্রত্যয়দ্বয়ের উৎপত্তি নির্দ্দেশ করিয়া একটু সন্দেহের সঙ্গে বলিয়াছেন, "ব্যুৎপত্তি হইতে দেখা যাইতেছে যে, 'চরিউ' ও 'চরিমা' এই উভয়ের মধ্যে বচন পরিবর্ত্তন হইয়াছে।" ইহা অতীব অদ্ভুত ব্যাপার। যাহা সংস্কৃতে ছিল বহুবচন, তাহা বাঙ্গলায় হইল একবচন; এবং সংস্কৃতের একবচনের প্রত্যয় বাঙ্গলায় দাঁড়াইল বহুবচন। 'ইমো' প্রত্যয় 'ইবোঁ'র বিকারেই উদ্ভূত, এবং এই 'ইমো' শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে অতি বিরল; ইহার সহিত 'ইউ'এর কোনও সম্বন্ধ নাই। 'ইউ'র উৎপত্তি সম্বন্ধে আমার মত আমি "বাঙ্গলাভাষায় কর্ম্ম ও ভাববাচ্যের ক্রিয়া" প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ করিয়াছি (বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩৩০, পৃঃ ২৯)। 'ইউ' যদি 'ইষ্যামি' (বা 'ইষ্যামঃ') হইতে উৎপন্ন হইত, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে আমরা সানুনাসিক রূপ ('ইউঁ') পাইতাম। অবশ্য, কৃত্তিবাস হইতে উদ্ধৃত উদাহরণে 'ইউঁ' পাইতেছি; কিন্তু কৃত্তিবাস ঢের পরের লেখক, এবং যে পুথি দুইখানি হইতে পরিষদের অযোধ্যা ও উত্তরাকাণ্ড মুদ্রিত হইয়াছে, তাহাদের বয়স ১৬০২ খ্রীষ্টাব্দ ও ১৫৮০ খ্রীষ্টাব্দ; তখন 'ইউ' এই কর্ম্মবাচ্যের ক্রিয়ার প্রয়োগ লুপ্তপ্রায়, সে সময়ে অনাবশ্যক চন্দ্রবিন্দু একটা লিপিকর-প্রমাদ হেতু আসিয়া যাওয়া অসম্ভব নহে। 'ইষ্যামঃ' হইতে 'ইমো'র উৎপত্তি বিষয়ে দুইটী অন্তরায় আছে—[১] সংস্কৃতের অন্ত্য স্বর আধুনিক বাঙ্গলার তদ্ভব পদে বর্ত্তমান থাকে না, [২] সংস্কৃতের দুই স্বরধ্বনির মধ্যে একক অবস্থিত 'ম' বাঙ্গলায় ও অন্যান্য আধুনিক আর্য্যভাষায় 'ৱঁ' ও পরে কেবলমাত্র 'ঁ' তে পরিণত হয়, যেমন 'ভূমি—ভুঁই, স্বামী—সাঁই, সংক্রম—সাঁকোঁ >সাঁকো, গ্রাম—গাঁ, নাম—নাঁ, না' ('কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি, সে না কোন জনা'=কঃ নাম বংশীং বাদয়তে. স নাম কঃ পুনঃ জনঃ)। (যেখানে তৎসম শব্দের বিশেষ প্রভাব আছে, সেখানে ক্বচিৎ 'ম'কারের পুনরধিষ্ঠান ঘটিয়াছে, যেমন 'নাম—না', মারহাট্টি 'নাঁৱ', কিন্তু বাঙ্গলায় সাধারণ ভাবে ব্যবহৃত হয় 'ম'যুক্ত রূপ, 'নাম')।

সংস্কৃতের ভবিষ্যৎ বা লৃট্-এর পদের মধ্যে একমাত্র মধ্যম পুরুষের পদ আজকাল বিদ্যমান, '-ইহ>-ইও' প্রত্যয়ান্ত হইয়া। পশ্চিমভারতীয় পাঞ্জাবী, গুজরাটী, মধ্যদেশের ব্রজভাষা কনৌজিয়া বুন্দেলী, এবং কতকটা পূর্ব্বী-হিন্দী ও ভোজপুরিয়া ছাড়া অন্যান্য আর্য্যভাষায় ইহার ব্যবহার লুপ্তপ্রায়। যেখানে লুপ্ত, সেখানে নূতন প্রত্যয়ের প্রয়োগ আসিয়া গিয়াছে; যেমন 'ইতব্য >-ইব, অব'; শতৃর 'অন্ত >অন্দ, অৎ'।

প্রাদেশিক বাঙ্গলায় ও প্রাচীন বাঙ্গলায় যে '-ইম্, ইমু, মু, মোঁ' প্রত্যয় পাওয়া যায়, উত্তম পুরুষের ভবিষ্যতে, তাহা প্রাচীন বাঙ্গলায় 'ইবাহোঁ>'ইবোঁ' হইতেই জাত; চন্দ্রবিন্দু-যুক্ত 'বঁ'র 'ম'য়ে পরিণতি খুবই স্বাভাবিক; 'বোঁ>ৱোঁ>ঙো, ঙ, মো, ম' ইত্যাদি। (প্রাচীন বাঙ্গলায় 'ঙ'='ৱঁ'।) চন্দ্রবিন্দু না থাকিলেও দুই স্বরের মধ্যস্থ কেবল 'ব'এর 'ম'এ পরিণতি অন্যত্র সুলভ; তুলনীয়, উড়িয়া 'দেখিবি<দেখিমি' (উত্তম পুরুষে), মগহী 'লেমা, করমা, চলমা<লেবা, করবা, চলবা' (মধ্যম পুরুষে)।

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

আলোচনা

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় এম্ এ মহাশয় বলিলেন,—

মাননীয় সভাপতি মহাশয় শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পঠিত প্রবন্ধের সম্বন্ধে আমাকে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ সাহেবের "বাঙ্গালা ভাষায় অনুজ্ঞা" শীর্ষক প্রবন্ধটী আমি ভাল করিয়া পড়িতে পারি নাই। শ্রীযুক্ত সুনীতিবাবু ঐ প্রবন্ধটীর সম্বন্ধে যে সমালোচনা করিয়াছেন, তাহা শুনিয়া আমার মনে দুই একটী বিষয়ে যে সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে, আমি সে সম্বন্ধেই এখন দুই চারিটী কথা বলিব। আজকাল বাঙ্গালা-সাহিত্যে ভাষাতত্ত্বের আলোচনা বড় একটা দেখা যায় না। বড়ই আনন্দের বিষয় যে, ভাষা-তত্ত্ববিৎ শ্রীযুক্ত সুনীতিবাবু, পণ্ডিত শহীদুল্লাহ্ সাহেব, আর তাঁদের মতই আরও দুই এক জন ভাষা-তত্ত্বের আলোচনা করিতেছেন। সুনীতিবাবু এ বিষয়ে আমার অপেক্ষা শতগুণে বেশী অধ্যয়ন ও গবেষণা করিয়াছেন; তিনি এজন্য আমাদের বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র। তাঁহার এই প্রবন্ধটী সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইলে—আমাদের এ সম্বন্ধে আলোচনা করার সুবিধা হইবে। যাহা হউক, সুনীতি বাবুর মন্তব্য সম্বন্ধে আমার মনে যে সন্দেহ উদিত হইয়াছে, তাহা এই,—

[১] সংস্কৃতের 'তব্য' প্রত্যয়ের অর্থের সহিত ভবিষ্যৎ-কালের ক্রিয়া-বিভক্তির একটু সাদৃশ্য আছে—সন্দেহ নাই; এবং বিভক্তিগুলির বাহুল্য ও জটিলতার বর্জ্জন দ্বারা উহাদের সরলতা-পাদনের দিকেই সকল অপভ্রংশের গতি—ইহাও সত্য বটে; কিন্তু সংস্কৃত 'তব্য' প্রত্যয় হইতে বাঙ্গালার ভবিষ্যৎ কালের ক্রিয়া বিভক্তির 'ব' (করিব, যাইব, খাইব ইত্যাদির) উদ্ভূত হইয়াছে, ইহা স্বীকার করিলে দেখা যাইবে যে, এ স্থলে সহজ ও স্বাভাবিক 'সে যাইব' (প্রাচীন বাঙ্গালা); 'তুমি যাইবা', 'মুঞি যাইমু' (প্রাচীন বাঙ্গালা) ইত্যাদির direct বা সরল উক্তির পরিবর্ত্তে 'তাহা কর্ত্তৃক যাওয়া হউক' ('তেন গন্তব্যং'), 'আমা কর্ত্তৃক যাওয়া হউক ('ময়া গন্তব্যং'), ইত্যাদি indirect ও round-about অর্থাৎ ঘুরাইয়া বলা বাক্য-রীতি প্রযুক্ত হইয়াছে। প্রাচীন বা আধুনিক বাঙ্গালা ভাষার ভবিষ্যতের 'সে যাইব,' 'মুঞি যাইমু' ইত্যাদি প্রয়োগের মধ্যে কর্ত্তৃ-পদে, প্রথমা বিভক্তি ছাড়া 'তব্য' প্রত্যয়ের জন্য অপরিহার্য্য তৃতীয়া বিভক্তির ব্যবহার দেখিতে পাই না; এরূপ অবস্থায় সংস্কৃত 'তব্য' প্রত্যয় হইতেই ভবিষ্যতের ক্রিয়া-বিভক্তির 'ব'কার উদ্ভূত হইয়াছে কি না, সে বিষয়ে মনে খুবই সন্দেহ জন্মে।

[২] সংস্কৃত 'তব্য' প্রত্যয় হইতেই বাঙ্গালা ভবিষ্যতের ক্রিয়া-বিভক্তি 'ব'-কারের উৎপত্তি হইয়াছে, স্বীকার করিলেও, 'তব্য' প্রত্যয়ের রূপ প্রথম পুরুষ মধ্যম-পুরুষ ও উত্তম-পুরুষ—তিন পুরুষেই এক প্রকার বলিয়া, বাঙ্গালার ভবিষ্যতের উত্তম-পুরুষেও 'মুঞি করিমু' স্থলে 'মুঞি করিব' প্রয়োগ দৃষ্ট হওয়াই সম্ভবপর ছিল, কিন্তু সেরূপ না হইয়া 'মুঞি করিমু', 'মুঞি যাইমু' ইত্যাদি প্রয়োগ দৃষ্ট হওয়ায় সংস্কৃতের বর্ত্তমানের 'করোমি' 'যামি' ইত্যাদি অপভ্রংশে প্রাচীন বাঙ্গালার 'করোঁ' 'যাওঁ' 'যাউঁ', 'যাঙ' ইত্যাদির ন্যায় সংস্কৃত- ভবিষ্যতের 'স্যামি' বিভক্তি হইতেই 'করিমু' 'যামু' ইত্যাদির 'মু' উদ্ভূত হইয়াছে—এরূপ অনুমানই সমীচীন মনে হয়।

[৩] শ্রীযুক্ত সুনীতিবাবু যে ভাবে 'করব+হুঁ =করবহুঁ, করবুঁ, করমু' ব্যুৎপাদিত করিয়াছেন, তাহাও সন্তোষজনক মনে হয় না। উত্তম-পুরুষ নিজেই নিজের সম্বন্ধে বলেন বলিয়া 'করোঁ' 'করলুঁ' 'করমু' ইত্যাদির প্রয়োগের স্থলে কর্ত্তৃ-পদ 'মুঞি' উহ্য রাখিলেও অর্থ-প্রতীতির কোনও ব্যাঘাত হয় না; কিন্তু প্রথম পুরুষ ও মধ্যম পুরুষের স্থলে কর্ত্তৃ-পদ উহ্য রাখিলে—কে কর্ত্তা, সে বিষয়ে অনিবার্য্য সন্দেহ থাকিয়া যায়; এ জন্য 'করব' ইত্যাদি ক্রিয়া-পদের সহিত কর্ত্তৃ-পদ 'হুঁ' (সংস্কৃত 'অহং' শব্দের অপভ্রংশ) যোগ করার কোনও প্রয়োজন না থাকা সত্ত্বেও উহা যোগ করায় এবং প্রথম ও মধ্যম পুরুষের ক্রিয়া-পদের স্থলে অনিবার্য্য প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও প্রথম ও মধ্যম পুরুষের কর্ত্তৃ-পদ-সূচক কোনও চিহ্নের প্রয়োগ না করিয়া শুধু 'করব'—যাহার অর্থ প্রাচীন বাঙ্গালায় 'সে করিবে' বা 'তুমি করিবা' দুই-ই হইতে পারে—এরূপ সন্দিগ্ধার্থ ক্রিয়া-পদের প্রয়োগ করা একান্তই অসম্ভব মনে হয়।

[৪] বাঙ্গালা অতীতের বিভক্তি 'ল' যে সংস্কৃতের 'ক্ত' (অতীতের অর্থে কৃদন্ত 'ক্ত' প্রত্যয়) হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, সে সম্বন্ধে বোধ হয়, ভাষাতত্ত্ববিদ্‌গণের মধ্যে কোনও মত-ভেদ নাই। বাঙ্গালা অতীতের উত্তম পুরুষের ক্রিয়া-বিভক্তিতেও আমরা 'লোঁ' 'লুঁ' (পরবর্ত্তী সময়ে 'মু') দেখিতে পাই। 'ক্ত' প্রত্যয়ের অপভ্রংশে 'ল' ব্যতীত 'লোঁ' বা 'লুঁ' আসিতে পারে না; সুতরাং এ স্থলে ল-কারে অনুনাসিক চন্দ্রবিন্দু-সংযোগ সংস্কৃত উত্তম পুরুষের 'অম্' বিভক্তির প্রভাব-সম্ভূত না বলিয়া গত্যন্তর দেখা যায় না। প্রাচীন বাঙ্গালার উত্তম-পুরুষের 'করোঁ' 'মরোঁ' ইত্যাদি স্থলেও 'ওঁ'-কে সংস্কৃত 'মি' বিভক্তি হইতে উদ্ধৃত না বলিয়া উপায় নাই। এরূপ অবস্থায় আমাদের বিবেচনায়, বাঙ্গালা বর্ত্তমান ও অতীতের উত্তম-পুরুষের বিভক্তির analogy বা সাদৃশ্য হেতু, বাঙ্গালা ভবিষ্যতের 'মু' বিভক্তিও সেইরূপ সংস্কৃত 'স্যামি' ভবিষ্যতের 'স্যামি' বিভক্তি হইতে উৎপন্ন কিংবা উহারই প্রভাবসম্ভূত, এরূপ সিদ্ধান্তই সমীচীন মনে হয়।

[৫] শ্রীযুক্ত সুনীতি বাবু সংস্কৃত (ং) অনুস্বারের যে পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা করিয়াছেন, এ স্থলে উহার কোনও উপযোগিতা বুঝিতে পারিলাম না। বাংলার 'বাঙ্গালা' শব্দটাকে কেহই সংস্কৃত অনুস্বারের বিশুদ্ধ উচ্চারণ অনুসারে 'বা-আঁ-লা' বলিয়া উচ্চারিত করিবেন না; 'বাঙ্গালা' বা 'বাঙ্গলা' লিখিলেও নিশ্চিতই উহা 'বাঙ্গালা' বা 'বাঙ্‌লা'ই উচ্চারিত হইবে; এ অবস্থায় 'বাংলা' না লিখিয়া 'বাঙ্গালা' বা 'বাঙ্গলা' লিখার বিশেষ কোনও সার্থকতা দেখা যায় না।

শ্রীযুক্ত সতীশ বাবুর মন্তব্য সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত সুনীতি বাবু এই উত্তর দিলেন,—

রাত্রি অধিক হইয়াছে। শ্রীযুক্ত সতীশ বাবু যে সকল বিষয়ের অবতারণা করিয়া আমার বক্তব্যের সমালোচনা করিলেন, তাহাদের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার এখন সম্ভবপর হইবে না। তবে মোটামুটি এই কয়টী কথা বলিতে চাহি।

[১] সংস্কৃতের অতীতের ক্রিয়াপদগুলি ক্রমে ক্রমে লোপ হইয়া যায়। প্রাকৃতে কচিৎ একটা আধটা লঙ্‌, লুঙ্‌, লিট্‌-এর পদ দেখা যায়, কিন্তু প্রায় সর্ব্বত্র 'ত' প্রত্যয়ান্ত পদের সাহায্যেই অতীত ক্রিয়ার দ্যোতনা হইয়া থাকে। অকর্ম্মক ক্রিয়া হইলে এই 'ত' প্রত্যয়ান্ত পদ কর্ত্তার

বিশেষণ হয়। সকর্ম্মক হইলে কর্ম্মের বিশেষণ হয় ও কর্ত্তাকে তৃতীয়ায় আনা হয়; যেমন প্রাচীন সংস্কৃতের রীতি অনুসারে—'অহং জগাম, অহং রাজানম্ অপশ্যম্', কিন্তু প্রাকৃতে 'অহং (অহঅং, হকং, হগং, হগে ইত্যাদি) গদো (গও, গদে)', ও 'মএ (=ময়া) রাজা (রাআ, লাযা, লাআ) দেক্‌খিও (বা দিট্‌ঠো, দিশ্‌টে)।' এই 'ত' প্রত্যয়ান্তরূপে স্বার্থে 'ইল্ল' প্রত্যয় যোগ করিয়া বাঙ্গলায় অতীত কালের 'ইল' প্রত্যয় দাঁড়াইল; 'অহঅং গঅ-ইল্ল' < প্রা-বাং 'হউঁ গেল', 'মএ রাজা দেক্‌খিঅইল্ল', প্রা-বাং 'মই রাজা দেখিল'। অর্থাৎ অতীতে অকর্ম্মক ক্রিয়ার কর্ত্তৃবাচ্যে প্রয়োগ, সকর্ম্মক ক্রিয়ায় সকর্ম্মক কর্ম্মবাচ্যে প্রয়োগ। হিন্দীতে এই রূপ এখনও বিদ্যমান আছে; যেমন ব্রজভাষায়—'হোঁ গয়ৌ' (হোঁ=অহং, গয়ৌ=গঅউ=গঅও=গতকঃ), কিন্তু 'মৈঁ রাজা দেখ্যৌ, (মৈঁ=ময়া, দেখ্যৌ=দেক্‌খিঅউ=দেক্‌খি-অও= * দৃক্ষিতকঃ, দৃষ্ট-অর্থে)। তুলনীয় প্রাচীন বাঙ্গলা (চর্য্যাপদ ৫) –'এত কাল হাঁউ অচ্ছিলেঁ স্বমোহেঁ। এবেঁ মই বুঝিল সদ্‌গুরুবোহেঁ॥' এখানে 'হাঁউ অচ্ছিলেঁ'=স্থিতোঽহং—হাঁউ বা হউঁ=অহং; 'মই বুঝিল'=ময়া জ্ঞাতং); একই পদে পাশাপাশি প্রথমায় হাঁউ=অহং যোগে অকর্ম্মক অচ্ছ বা আছ ধাতুর সঙ্গে কর্ত্তৃবাচ্যে প্রয়োগ ও সকর্ম্মক বুঝ ধাতুর সঙ্গে তৃতীয়ার মই=ময়া যোগে কর্ম্মবাচ্যে প্রয়োগ আমরা পাইতেছি। দেখা যাইতেছে, অতীতে তিঙন্ত পদগুলি অপ্রচলিত হইয়া পড়ায় এইরূপ ঘুরাইয়া বলিবার -সকর্ম্মক ক্রিয়াকে কর্ম্মবাচ্যে আনিয়া বলিবার রেওয়াজ আসিয়া গিয়াছে।

অতীতের ন্যায় ভবিষ্যতেও দেখিতে পাইতেছি যে, 'তব্য' > 'ইব' প্রত্যয়ান্তরূপ ভবিষ্যতের লৃট্ বা তিঙন্ত রূপগুলির স্থান অধিকার করিয়াছে। কিন্তু এখানে সকর্ম্মক অকর্ম্মক ক্রিয়ার ভেদ নাই;—উভয় স্থলেই কর্ম্মবাচ্যের প্রয়োগ হয়, যেমন 'যুষ্মাভিঃ ভবিতব্যং', 'ময়া দাতব্যা পৃচ্ছা'= প্রাচীন বাঙ্গলায় 'তুম্‌হে হোইব' (চর্য্যা ৫), 'মই দিবি পিরিচ্ছা' (চর্য্যা ২৯)। প্রাচীন বাঙ্গলায় এই অনুসারে আমরা দেখি—

উত্তম পুরুষ—মই (মুঞি, ইত্যাদি=ময়া), আমি (=অহ্মে, অহ্মহি=অস্মাভিঃ) জাইব, খাইব (=যাতব্যং, খাদিতব্যং)।

মধ্যম পুরুষ—তই (তুঞি ইত্যাদি=ত্বয়া), তুমি (=তুম্‌হে, তুম্‌হহি=যুষ্মাভিঃ) জাইব, খাইব।

প্রথম পুরুষ—সে জাইব, সে খাইব। এখানে প্রথম পুরুষে তৃতীয়ার 'তেঁ' (=তেন) স্থলে অতি প্রাচীন কাল হইতেই দেখা যাইতেছে যে, প্রথমায় 'সে' ব্যবহৃত হইতেছে। প্রথমা ও তৃতীয়ার পদের অদলবদল প্রা-বাংতে বিরল নহে। প্রা-বাং-র প্রথমার'হাঁউ' (=অহং)-কে তৃতীয়ার 'মইঁ, মই' (=ময়া) বিতাড়িত করিয়াছে। তদ্রূপ প্রা-বাং-র প্রথমা 'তো', 'তু' (<ত্বং)কে তৃতীয়ার 'তুইঁ' (<ত্বয়া) দুরীভূত করিয়াছে। কেবল ইহার ব্যতিক্রম আমরা এই প্রথম পুরুষেই দেখিতে পাইতেছি। প্রা-বাংতে 'তেঁ জাইব, তেঁ খাইব' রূপই হওয়া স্বাভাবিক, ও প্রাকৃত ব্যাকরণের রীতি ধরিয়া দেখিলে এই রূপই অপেক্ষিত; কিন্তু প্রাচীন বাঙ্গলায় কিরূপ প্রয়োগ ছিল,

আমরা তাহা জানি না। কিন্তু প্রথমা ও তৃতীয়ার গোলমাল অতীতের ক্রিয়ায় যে প্রাচীন বাঙ্গলায় হইয়াছিল, তাহা সহজেই আমরা উপলব্ধি করিতে পারি—যেমন 'হাঁউ সুতেলি'=আমি শুইলাম (চর্য্যা ১৮—এখানে প্রথমার প্রয়োগ), 'হাঁউ অচ্ছিলেঁ=আমি ছিলাম (চর্য্যা ৩৫—প্রথমার প্রয়োগ); কিন্তু 'মই ঘলিলি হাড়েরি মালী'=আমি হাড়ের মালা ফেলিয়া দিলাম (চর্য্যা ১০—তৃতীয়ার প্রয়োগ), 'মই বুঝিল' =আমি বুঝিলাম (চর্য্যা ৩৫—তৃতীয়ার প্রয়োগ); এরূপ স্থলে হাঁউ' 'মই' দুই বিভিন্ন সুবন্ত রূপের মধ্যে গোলমাল ঘটা স্বাভাবিক, স্বীকার করিতেই হইবে। তদ্রূপ প্রথম পুরুষেও 'সে, তেঁ (=সং, তেন)র অদল বদলও অপেক্ষিত, ও ক্রমে যে বহুলতররূপে প্রযুক্ত প্রথমার 'সে' যে তৃতীয়ার 'তেঁ'কে দূরীভূত করিতে পারে, তাহাও বুঝিতে পারা যায়।

[২, ৩, ৪] 'মুঞি করিব, আমি করিব' এইরূপ প্রয়োগ প্রা-বাং-তে খুবই দৃষ্ট হয়। যথা—চর্য্যা ৩৬—'শাখি করিব জালন্ধরিপাএ'=(আমি) জালন্ধরি-পাদকে সাক্ষী করিব। শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনেও এইরূপ প্রয়োগ যথেষ্ট আছে; পৃষ্ঠা ১১৪—'তোহ্মার করিব অহ্মে উচিত সমান' (=সম্মান), পৃষ্ঠা ১৮৫—'আহ্মে বহিব তোর ভার', 'আহ্মে সত্য করিব', ইত্যাদি।

কেবল-মাত্র '-ইল' '-ইব' প্রত্যয়ান্ত ক্রিয়াপদ তিন পুরুষেই ব্যবহৃত হইত। প্রাচীনতম বাঙ্গলায় এই ব্যবস্থা ছিল, ইহা বেশ বুঝা যায়। এখনও বাঙ্গলার কোনও কোনও প্রাদেশিক ভাষায় এই রীতি বিদ্যমান; তুলনা—ঢাকা অঞ্চলে 'সে ক'র্‌ব'=সে করিবে। কিন্তু বাঙ্গলা ভাষায় (চণ্ডীদাসের পূর্ব্ব হইতেই) খালি '-ইল' '-ইব' উত্তম, মধ্যম বা প্রথম পুরুষ বুঝাইবার পক্ষে যথেষ্ট বিবেচিত হইল না। '-ইল, -ইব'র সঙ্গে পুরুষদ্যোতক কিছু জুড়িয়া দেওয়া হইতে লাগিল। যে অংশ জুড়িয়া দেওয়া হইল, তাহা হয় কোনও সর্ব্বনাম-পদ, নয় বর্ত্তমানের ক্রিয়াপদের অনুকরণে আনীত কোনও বিভক্তি। এইরূপ ব্যবস্থা আমরা স্পষ্টই পুরাতন বাঙ্গলায় দেখিতে পাইতেছি। সুতরাং সে সম্বন্ধে কোনও জল্পনা বা অনুমান করিবার প্রয়োজন নাই। যেমন শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে—

উত্তম পুরুষ—অতীতকালে 'কৈল' (=প্রাকৃত কয়-ইল্ল=কৃত+ইল); 'কৈলা+হোঁ'= 'কৈলাহোঁ' (এই 'হোঁ', প্রাচীন বাঙ্গলার 'হাঁউ' হইতে; তুলনীয়—'হৈলাহোঁ'; প্রা, অসমীয়াতে ='আহোঁ' প্রত্যয় মেলে, মৈথিলীতেও 'অহুঁ'); তাহা হইতে 'কৈলাও', কৈলাউ, কৈলোঁ, কৈলো, কৈলুঁ, কৈলুম্' ইত্যাদি; ও এই প্রকার রূপের প্রসারে—'করিলাহোঁ, করিলাও', করিলোঁ, করিলুম্, ক'রলুম, করনু'; 'করিল+আমি'='করিলাম্'।

মধ্যম পুরুষ—'কৈল'; 'কৈলেহেঁ, কৈলাহা' অসমীয়াতে এই প্রকার রূপ পাওয়া যায়; মৈথিলীতে—'কৈলহ, কৈলেঁ, কৈলঁই<কৈলেহেঁ'; এখানে 'আহা' <'অহ' প্রত্যয়, বর্ত্তমানের ক্রিয়ার মধ্যম পুরুষের অনুসরণে; যথা 'চলহ, চলাহা'='চলথ'; এবং 'এহেঁ'='আহা, অহ' প্রত্যয়ে বহুবচনদ্যোতক চন্দ্রবিন্দু যোগে। [বহুবচন জানাইবার জন্য চন্দ্রবিন্দু বা '-ন-' বা '-নহ-' আধুনিক আর্য্যভাষাগুলিতে খুবই সাধারণ—ও এই চন্দ্রবিন্দু বা 'ন' বা 'নহ', বিশেষ্য ও সর্ব্বনাম পদের ষষ্ঠীর বহুবচনের '-আনাম্' বিভক্তির 'ন' হইতে জাত, এ কথা পূর্ব্বে আলোচিত হইয়াছে।

তাহা হইতে 'কৈলা, কৈলে, কৈলেঁ (=করিলা, করিলে, করিলেন) ইত্যাদি। অনাদরে 'কৈলি' (='কৈল+ই'; 'ই<হি', সাধারণ অনুজ্ঞার রূপ হইতে অনুমিত হয়),>'করিলি'।

প্রথম পুরুষ—'কৈল'; 'কৈলে' (—'এ' প্রত্যয় এখানে বর্ত্তমান ক্রিয়ার প্রথম পুরুষের এ-কার হইতে অনুমিত হয়); 'কৈলান্তি, কৈলান্ত, কৈলেন্ত, কৈলেন' (বর্ত্তমানের প্রথম পুরুষের বহুবচন হইতে গৃহীত); 'করিল, করিলে>ক'র্‌লে; করিলেন্ত, করিলেন' ইত্যাদি।

তদ্রূপ ভবিষ্যতেও উত্তম পুরুষে—'মুই, আমি, করিব'; 'করিবাহোঁ>করিবোঁ, করিবুঁ, করিমু, করিম্‌, ক'রমু'। 'করিব+আমি>করিবাম' (ময়মনসিংহের ভাষায়)।

মধ্যম পুরুষে—'তুই, তুমি, করিব'; 'তুমি করিবাহা, করিবাহেঁ, করিবেহেঁ>করিবা, করিবে, করিবেন'। অনাদরে 'তুই করিবি'।

প্রথম পুরুষ—'সে, তাহারা করিব'; 'করিবে'; 'করিবান্ত, করিবেন্ত, করিবেন'।

'করিবোঁ' পদে 'ব' স্পষ্ট বিদ্যমান। 'করিবোঁ' পদের 'ব' সানুনাসিক ওষ্ঠ্য স্বর 'ওঁ' কারের সহিত যুক্ত হওয়ায় সহজেই 'মো', 'মু' হইয়া যায়; 'করিমো>করিমু, ক'রমু'। কিন্তু 'করিব+আমি'—এখানে স্বরবর্ণটী কণ্ঠ্য অ-কার হওয়ার দরুন, 'ব'এর 'ম'য়েতে পরিবর্ত্তনের দিকে প্রবণতা রুদ্ধ হইয়াছে; তদ্রূপ মধ্যম ও প্রথম পুরুষের রূপে 'ওঁ' না থাকায় 'ব'-ই বাহাল আছে।

'কৈলোঁ, করিলোঁ, করিবোঁ'—ইহাদের অনুনাসিক বর্ত্তমানের ক্রিয়ার 'করোঁ, খাওঁ, চলোঁ' প্রভৃতি রূপে যে অনুনাসিক বিদ্যমান, তাহা হইতে হইতে পারে। এই অনুনাসিক সংস্কৃতের '-মি, -মঃ' প্রত্যয়ের বিকারে উৎপন্ন। 'করোমি>* করমি>* করিমি>* করিবিঁ>*করীঁ >করি; কুর্ম্মঃ>* করোমো>* করমো>* করওঁ, করও >করোঁ'। ইহা অসম্ভব নহে যে, মধ্যম পুরুষের ও প্রথম পুরুষের রূপের মত অতীতে ও ভবিষ্যতে '-ইল' '-ইব' প্রত্যয়ের সঙ্গে বর্ত্তমানেরই বিভক্তি 'ওঁ' জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু ইহার বিরুদ্ধে একটী বড় কথা বলা চলে; 'হোঁ' রূপটী পুরাতন বাঙ্গলায় ও অসমীয়াতে, তথা 'অহুঁ' রূপে মৈথিলীতে আমরা পাইতেছি। আর তদ্ভিন্ন চলিলাম, করিবাম,' > প্রভৃতি পদে স্পষ্টই '-ইল', '-ইব'+'আমি' পাইতেছি। 'চলিবাহোঁ'>'চলিবোঁ, চলিলাহোঁ>চলিলোঁ' পদে কেবল আধুনিক 'আমি' স্থলে প্রাচীন 'হোঁ, হাঁউ, হউঁ'। তবে এ ক্ষেত্রে এরূপ মনে করিলে ব্যাখ্যা চলে যে, 'চলিবোঁ, চলিবাহোঁ; চলিলোঁ, চলিলাহোঁ' এই প্রকার রূপে লুপ্ত উত্তম পুরুষের সর্ব্বনাম 'হোঁ' ও বর্ত্তমানের ক্রিয়ার উত্তম পুরুষের রূপের 'ওঁ', এই দুইয়ের-ই অস্তিত্ব আছে।

[৫] 'বাঙ্গালা, বাঙ্গলা, বাঙলা, বাংলা' বানান লইয়া আমি যাহা বলিয়াছি, তাহা আলোচ্য প্রসঙ্গের বহির্ভূত বলিয়াই পাদটীকায় তাহাকে সন্নিবেশিত করিয়াছি। শ্রীযুক্ত মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌ 'বাঙ্গলা'—এই বানানকে 'না ব্যুৎপত্তি-সঙ্গত, না উচ্চারণ-সঙ্গত' বলিয়াছিলেন। আমি 'বাঙ্গালা, বাঙ্গলা' ও 'বাঙলা' এই তিন প্রকার বানানই লিখিয়া থাকি, অনুস্বার দিয়া লেখার পক্ষপাতী নই। 'বাঙ্গলা'—এইরূপ বানানকে যে ব্যুৎপত্তি ও উচ্চারণ, দুই দিক্ ধরিয়া

বিচার করিলে বিশেষ ভাবে সমর্থিত করা যায়, তাহা আমার বিশ্বাস; এবং সেই জন্য আমার মন্তব্যে একটু কৈফিয়ৎ দেওয়া আবশ্যক বোধ করিয়াছি।

আজকার প্রবন্ধের সম্বন্ধে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত সতীশবাবু তাঁহার সন্দেহ কয়টী উল্লেখ করিয়া আমার ব্যাখ্যা করিবার অবসর দিলেন, তজ্জন্য তাঁহার প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা জানাইয়া আমার বক্তব্য সমাপন করিতেছি।

শ্রীযুক্ত কিরণবাবু 'আমি, হম্' প্রভৃতি সর্ব্বনাম পদের ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়াছেন। তাঁহার প্রশ্ন আলোচ্য বিষয়ের বহির্ভূত হইলেও যথাসাধ্য সংক্ষেপে সমাধানের চেষ্টা করিব। 'আমি, হম্' সংস্কৃত 'অহম্' শব্দ হইতে উদ্ভূত নহে। বাঙ্গলায় ও আধুনিক আর্য্যভাষায় সর্ব্বনাম উত্তম পুরুষের উৎপত্তি এই,—

প্রথমা একবচনে—বৈদিক বা সংস্কৃতে 'অহম্'। প্রাকৃতে এই 'অহম্' শব্দে একটা স্বার্থে 'ক' জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল; তাহাতে হইল 'অহকং'। 'অহকং' অশোক অনুশাসনে 'হকং'রূপে পাওয়া যায়, সাহিত্যের (সংস্কৃত নাটকের) মাগধী প্রাকৃতে 'হকং'এর পরিবর্ত্তন হয় 'হকে, হগে, হগ্গে'। চলিত ভাষায় সমগ্র উত্তরভারতে 'হকং' পদটী, 'হগং, হঅং, হরং, হউঁ' এইরূপে পরিবর্ত্তিত হয়। এই 'হউঁ' পদটী গুজরাটীতে 'হুঁ', পশ্চিমা-হিন্দী (ব্রজভাষা)তে 'হৌঁ', ও প্রাচীন বাঙ্গলাতে (চর্য্যাপদের ভাষায়) 'হাঁউ' রূপে মেলে (যেমন 'হাঁউ নিরাসী খমন ভতারে'=চর্য্যা ২০; 'তু লো ডোম্বী হাঁউ কপালী'=চর্য্যা ১০; 'এত কাল হাঁউ অচ্ছিলেঁ স্বমোহেঁ'=চর্য্যা ৩৫)। গুজরাটী ও ব্রজভাষাতে 'অহম্—অহকং'-পদ-জাত কর্ত্তৃকারকের একবচনের রূপ 'হুঁ, হৌঁ' এখনও বিদ্যমান। কিন্তু ইহা প্রাচীন বাঙ্গলার যুগের পর হইতেই বাঙ্গলা-ভাষায় লোপ পাইয়াছে।

তৃতীয়া একবচনে—সংস্কৃতে 'ময়া'। প্রাকৃতে ইহা 'মএ' রূপ গ্রহণ করে, তৎপরে অপভ্রংশে 'মইঁ'। বিশেষ্য পদে তৃতীয়ায় সংস্কৃতের '-এন' প্রত্যয় অন্ত্য যুগের প্রাকৃতে 'এং' বা 'এঁ'তে পরিণত হয়; যেমন 'হস্তেন > হত্থেণং, হত্থেণ > হত্থেং, হত্থেঁ > হাথেঁ, হাথে, হাতে'; এই বিশেষ্য পদের রূপ হইতে 'এন'-বিভক্তি-জাত চন্দ্রবিন্দু, 'মই' পদের উপর প্রভাব করে, তাই 'মইঁ' রূপটি আমরা পাই। এই 'মইঁ' হইতেছে আমাদের বাঙ্গলায় 'মুই, মুঞি, মুয়িঁ, মুহিঁ' ইত্যাদি। হিন্দীর 'মৈঁ'ও এই একই শব্দ।

চতুর্থী একবচনে—'মহ্যম্'। প্রাকৃতে 'মজ্ঝ, মজ্ঝু'। ইহা হইতে হিন্দীর 'মুঝ' (যেমন 'মুঝকো'=আমাকে, 'মুঝে'=আমায়)। হিন্দীর প্রভাবে বাঙ্গলার ব্রজবুলী সাহিত্যে 'মঝু' =আমার।

ষষ্ঠী একবচনে—'মম'। 'মম' ক্রমে 'মৱঁ' ও পরে 'মো' হইয়া দাঁড়ায়। ষষ্ঠী বিভক্তিতে 'মো' প্রাচীন বাঙ্গলায় মেলে। 'মো'-তে আবার নূতন করিয়া ষষ্ঠীর '-র' বিভক্তি যোগ করিয়া 'মোর'।

প্রথমা বহুবচন—সংস্কৃতে 'বয়ম্'। কিন্তু প্রথমা ছাড়া অন্য বিভক্তিতে বহুবচনে সংস্কৃতে যে 'অস্ম'-রূপ আসে, প্রাকৃতে তাহাই অবলম্বন করিয়া বহুবচনে 'অম্হে' পদের সৃষ্টি হয়। এই 'অম্হে'

হইতে প্রাচীন বাঙ্গলা 'আম্হি' (আহ্মি), ও পরে 'আমি'। হিন্দীর 'হম্' ও 'অম্হে' এই পদ হইতে, এবং সাধু হিন্দীতে 'হম্' সদাই বহুবচন।

তৃতীয়া বহুবচন—'অস্মাভিঃ' হইতে প্রাকৃতে 'অম্হেহিঁ' ও 'অম্হহিঁ'। ইহা হইতে প্রাচীন বাঙ্গলায় 'আম্হে' (আহ্মে), উড়িয়ায় 'আম্ভে'। প্রথমার 'আহ্মি' ও তৃতীয়ার 'আহ্মে' এই দুই রূপ কিন্তু প্রাচীন বাঙ্গলার যুগ হইতে আর তাহাদের পার্থক্য বজায় রাখে নাই—উভয়েই আধুনিক বাঙ্গলা 'আমি'তে মিলিয়া গিয়াছে।

বহুবচনের অন্য বিভক্তির রূপ বাঙ্গলায় আসে নাই। দেখা যাইতেছে, উৎপত্তি-হিসাবে বাঙ্গলার উত্তমপুরুষের সর্ব্বনামের কতকগুলি পদ হইতেছে একবচনের, আর একটী পদ বহুবচনের। যথা,—

একবচন	বহুবচন
প্রথমা—(অহম্ > অহকং >) হঁাউ [লুপ্ত]	(অস্মে > অম্হে > আহ্মি) > আমি
তৃতীয়া—(ময়া > মএ >) মই, মইঁ, মুই	(অস্মাভিঃ > অম্হেহি >) আহ্মে > আমি
চতুর্থী—(মহ্যম্ > মজ্ঝ >) মজ্ঝু [ব্রজবুলী]	
ষষ্ঠী —(মম >) মো, মো + র = মোর	

অসমীয়া ভাষায় এখনও 'মই' = একবচনে = আমি, ও 'আমি' = বহুবচনে, আমরা অর্থে। প্রাচীন বাঙ্গলায় 'আমি' পদটী একবচনে ব্যবহৃত হইতে থাকে ; 'মই, মুই' ও 'আমি'র মধ্যে বচন-ঘটিত পার্থক্য চলিয়া যায়। সুতরাং পরবর্ত্তী কালে নূতন বহুবচনের আবশ্যকতা আসিয়া পড়ায়, 'আমি-সব, আমা-সব, মো-সব, মুই-সব,' ও 'মোরা, আমরা'—এই প্রকার বহুবচনের নবীন রূপগুলি সৃষ্ট হয়। হিন্দীতেও সেইরূপ 'হম্' শব্দ একবচনে প্রযুক্ত হইতে থাকিলে নূতন বহুবচনের রূপ 'হম-লোগ'এর উদ্ভব।

'অর্থশাস্ত্রে' দুর্ব্বল রাজার আত্মরক্ষা*

প্রবলের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষাকল্পে দুর্ব্বল রাজার জন্য কৌটিল্য যে সকল উপায় নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, প্রধানতঃ তাহাই বর্ত্তমান প্রবন্ধে আলোচনা করিব।

'অর্থশাস্ত্র' প্রবল বা দুর্ব্বল সকল রাজার পক্ষেই সমান উপযোগী; ইহাতে যেমন পরাক্রান্ত জয়াভিলাষী রাজার পক্ষে শত্রুজয়ের উপায় বর্ণিত দেখা যায়, তেমনই আবার অসহায় ও অসমর্থ রাজা শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে তাঁহার তদানীন্তন কর্ত্তব্য-সম্বন্ধে সবিশেষ উপদেশও লক্ষিত হয়। বরং আক্রমণ অপেক্ষা আত্মরক্ষার ব্যবস্থাই এই গ্রন্থে অধিক বিস্তৃতভাবে উপদিষ্ট হইয়াছে।

অর্থশাস্ত্রে' (১২, ১) 'ধর্ম্মবিজয়ী', 'লোভবিজয়ী' ও 'অসুরবিজয়ী' এই তিন প্রকার 'অভিযোক্তা' বা আক্রমণকারীর উল্লেখ আছে। শত্রু নত হইবা মাত্রই 'ধর্ম্মবিজয়ী' রাজা তাঁহার অপকারের চেষ্টা হইতে বিরত হন, অধিকন্তু তাঁহার বিপদে সহায়তাও করিয়া থাকেন। 'ভূমি' ও 'অর্থে' 'লোভবিজয়ী'র লোভ; অভিলষিত বস্তু পাইলে তিনি আর আক্রমণ করেন না। কি ভূমি, অর্থ, স্ত্রী, পুত্র এবং সর্ব্বশেষে প্রাণ হরণ করা 'অসুরবিজয়ী'র উদ্দেশ্য, সুতরাং তাঁহাকে সন্তুষ্ট করা দুঃসাধ্য। ধনাদি উপহার দ্বারা এইরূপ 'অভিযোক্তা'কে কথঞ্চিৎ শান্ত করিয়া আক্রান্ত ব্যক্তি গোপনে প্রতিকারের চেষ্টা করিবে। এইরূপ স্থলে কৌটিল্য অসাধু উপায়ের আশ্রয় লওয়াও নিন্দনীয় বলিয়া মনে করেন না; নিষ্ঠুর প্রতিপক্ষের সর্ব্বধ্বংসী আক্রমণের কবল হইতে নিজের অস্তিত্ব রক্ষা করিবার জন্য তিনি শক্তিহীন রাজার পক্ষে অগত্যা ছল-চাতুরী ও ক্রূর উপায় অবলম্বনের ব্যবস্থাও দিয়াছেন। সকল উপায় ব্যর্থ হইলে, মৃত্যু নিশ্চিত জানিয়া 'অগ্নিপতঙ্গে'র ন্যায় সম্মুখ-সমরে প্রবৃত্ত হওয়ার উপদেশও 'অর্থশাস্ত্রে' (৭, ১৫) পাওয়া যায়। কিন্তু শত্রুর নিকট আশ্রয় ভিক্ষা করিয়া, উপযুক্ত সমাদর পাইলে বিশ্বাসঘাতকতা করা কৌটিল্যের অভিপ্রেত বলিয়া মনে হয় না। তিনি দণ্ডোপনতের কর্ত্তব্য-বর্ণন কালে (৭, ১৫) বলিয়াছেন,—দুর্ব্বল রাজা ধনাদি উপহার সহ দূত পাঠাইয়া প্রবল শত্রুর বশ্যতা স্বীকার করিবে এবং অভয় পাইলে তাঁহার আজ্ঞাবহরূপে সকল বিষয়ে য [illegible] উপকা[illegible] করিবে; আবার 'দণ্ডোপনায়িবৃত্ত' নামক প্রকরণে (৭, ১৬) প্রবল রাজার প্রতি উপদেশ আছে যে, ভীত আশ্রয়প্রার্থীকে অভয় দিয়া পিতার ন্যায় পালন করিতে হইবে। 'মণ্ডল'স্থ অপর রাজগণের বিরাগভাজন হওয়ার ভয়েও 'অর্থশাস্ত্রে' 'উপনত'কে উৎপীড়ন করা নিষিদ্ধ হইয়াছে; কারণ, ঐরূপ করিলে উদ্বিগ্ন রাজমণ্ডল উৎপীড়নকারীর বিনাশের জন্য বদ্ধপরিকর হইতে পারে।

শক্তিহীন রাজাকে রক্ষা করিবার জন্য 'অর্থশাস্ত্রে' বহু উপায়ের নির্দ্দেশ আছে। 'যাতব্যবৃত্তি' নামক প্রকরণে (৭, ৪) প্রবলের দ্বারা আক্রান্ত অশক্ত রাজার কর্ত্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ পাওয়া যায়। 'হীনশক্তিপূরণ' নামক অপর প্রকরণে (৭, ১৪) ক্ষীণশক্তি বৃদ্ধি করিবার ব্যবস্থা দেখিতে পাই। আর এক প্রকরণে (৭, ১৫) শক্তিশালীর অত্যাচার হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য

---

* মুন্সীগঞ্জে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের ১৩শ অধিবেশনে ইতিহাস-শাখায় পঠিত।

দুর্ব্বল রাজাকে দুর্গ আশ্রয় করিয়া যথাসাধ্য প্রতিকার করিতে বলা হইয়াছে। 'আবলীয়সম্' নামক সমগ্র অধিকরণটি কেবল 'অবলীয়ান্' অর্থাৎ দুর্ব্বলের কর্ত্তব্য-কথায় পূর্ণ। এই অধিকরণের অন্তর্গত 'দূতকর্ম্ম', 'মন্ত্রযুদ্ধ', 'সেনামুখ্যবধ' প্রভৃতি নয়টি প্রকরণে নানারূপে শত্রুবঞ্চনার কৌশল বর্ণিত আছে।

উপরিউক্ত প্রকরণগুলির সার মর্ম্ম এই যে, প্রথমতঃ ভেদনীতি অবলম্বনে দুর্ব্বল রাজা আক্রমণকারী ও তাঁহার সুহৃদ্‌বর্গের মধ্যে বিবাদ ঘটাইতে চেষ্টা করিবেন এবং শত্রু অপেক্ষা অধিক বলশালী রাজার সাহায্য লইয়া কিংবা তাদৃশ সাহায্যের অভাবে আক্রমণকারীর তুল্যবলসম্পন্ন এক বা বহু রাজার সহিত সম্মিলিত হইয়া, অথবা তাহারও অভাব হইলে তদপেক্ষা হীনবল সহায়ই বহুসংখ্যক সংগ্রহ করিয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইবেন। ইহার কোনটিই সুলভ না হইলে দুর্ভেদ্য দুর্গের আশ্রয়ে থাকিয়া নানা উপায়ে প্রবল শত্রুর বলক্ষয় করিতে চেষ্টা করিতে হইবে। তথায় অবস্থানকালে নিজের বন্ধুবর্গ এবং 'মধ্যম' ও 'উদাসীন'কে উক্ত 'অভিযোক্তা'র বিরুদ্ধে প্রবর্ত্তিত করা আবশ্যক।

ভেদনীতির সাহায্যে শত্রুর আত্মীয় ও প্রতিবেশী রাজাদিগকে তাঁহার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া, পরপক্ষের রাষ্ট্র, দুর্গ ও স্কন্ধাবারের মধ্যে নানা উপায়ে অসন্তোষ উৎপাদন করিয়া বিদ্রোহ সৃষ্টি করিবে। এইরূপে বিবিধ কৌশলে অনিষ্ট সাধন দ্বারা শত্রুকে বিব্রত করিয়া অবশেষে চর দ্বারা তাহাকে গোপনে হত্যা করাও কৌটিল্য অনুমোদন করিয়াছেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রী কৌটিল্য কেবল নিজ প্রভুর সাম্রাজ্য-নীতির অনুকূলেই অর্থশাস্ত্র প্রণয়ন করেন নাই; তিনি প্রবল ও দুর্ব্বল, উভয় প্রকার রাজার পক্ষেই সমান উপযোগী করিয়া এই রাজনীতিক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা